

স্বর্ণকীট

অনীশ দাস অপু





অনুবাদ

স্বর্ণকীট

সম্পাদনাঃ অনীশ দাস অপু

অনুবাদ গল্পপ্রিয় পাঠকদের জন্য এক অনবদ্য সংকলন *স্বর্ণকীট*। কী ধরনের গল্প পছন্দ আপনার? গোয়েন্দা, রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার, সায়েন্স ফিকশন, কমেডি, হরর? সব, সবরকম গল্পের আস্বাদ দিতেই এ উপহারের ঝুলি। এ সংকলনের কোনও গল্প আপনার চোখে পানি এনে দেবে, পরের গল্পটি পড়েই হয়তো হেসে উঠবেন হো হো করে, তারপরের গল্পটি আপনার হার্টবিট বাড়িয়ে দেবে দারুণ উত্তেজনায়, এরপরের... আসলে বিচিত্র স্বাদের গল্পগুলো পড়ার সময় কতরকমের অনুভূতি যে আপনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে! সবশেষে চমৎকার একটি সংকলন পাঠের ভাল লাগার আবেশে আপনি বিভোর হয়ে থাকবেন। আসুন, বিশ্বসেরা লেখকদের সেরা লেখাগুলোর ভুবনে প্রবেশ করুন এবং কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যান তাঁদের বর্ণিল জগতে!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

SWARNOKEET
Edited by: Anish Das Apu



পঁচানব্বই টাকা

সূচি

ভূমিকা

মতলবটা আসে হরর সংকলন সম্পাদনার কাজটি করতে গিয়ে। রহস্যপত্রিকা পড়ছি আমি সেই চুরাশি সাল থেকে। এ পত্রিকায় কত যে ভাল ভাল অনুবাদ গল্প ছাপা হয়েছে! ভাবলাম বিশ্বসেরা লেখকদের উৎকৃষ্ট রহস্যগল্পগুলো দিয়ে একটি সংকলন করলে কেমন হয়? রহস্যপত্রিকার সহকারী সম্পাদক কাজী শাহনূর হোসেনকে প্রস্তাবটি দিতেই তিনি উৎসাহবোধ করলেন। তবে শুধু রহস্যগল্প নয়, সঙ্গে গোয়েন্দা, সায়েন্স ফিকশন, কমেডি এসব জিনিসও থাকুক না? পরামর্শ দিলেন তিনি। তাঁর পরামর্শ মনে ধরল আমার। রহস্যগল্প সংকলন করব বলে বেশ কিছু গল্প আগেই বাছাই করে রেখেছিলাম। বাড়তি পরিশ্রম করতে হলো কা.শা.হো-র অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে।

প্রচুর, প্রচুর চমৎকার গল্প পেয়েছি আমি *স্বর্ণকীট* নামে এ অনুবাদ সংকলনটি করতে গিয়ে। জীবনধর্মী কিছু গল্প চোখে পানি এনে দেয়। এ প্রসঙ্গে ফ্রাঞ্জ কাফকা'র *ক্ষুধাশিল্পী* এবং আইজাক বাশেভিস সিঙ্গারের '*হাবা গিম্পেল*'-এর কথা উল্লেখ করতেই হয়। আমাকে দারুণভাবে ছুঁয়ে গেছে জ্যাক লণ্ডনের *এক ফালি মাংস*, গী দ্য মোপাঁসার *স্বপ্নের বসতি যেখানে* এবং জ্যাক শিফারের *ঈশ্বরের অপেক্ষায়*। হাসতে হাসতে খুন হয়ে গেছি ও' হেনরীর *সমব্যথী*, সাকি'র *বেড়াল বিভীষণ* এবং আইজাক আসিমভের *আবিষ্কারের বিড়ম্বনা* পড়ে। রোমাঞ্চ জাগিয়েছে ফ্রেডরিক ফোরসাইথের *আয়ারল্যাণ্ডে সাপ নেই* ও জেমস হেডলি চেজের *লোভ*। শিহরিত হয়েছি রে ব্রাডবাড়ির *মহানগর* ও অমৃতা প্রতিমের *কেরোসিনের গল্প* পাঠ করে।

স্বর্ণকীট এমন একটি অনুবাদ সংকলন, অনুবাদপ্রিয় পাঠকের প্রায় সবরকম চাহিদাই মিটাবে বইটি। অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, হরর, হাসি, গোয়েন্দা—রহস্য, কী নেই এতে? সংকলনটি করার সময় লক্ষ রেখেছি

স্বল্প পরিসরের যত বেশি লেখকের গল্প যেন ঢোকানো যায়। আর দেড় ডজন গল্পের, বলাবাহুল্য একেকটির একেকরকম স্বাদ। তবে রহস্য এবং রোমাঞ্চ গল্পের প্রতি আমার একটু পক্ষপাতিত্ব থাকায় সংকলনটিতে এ ধরনের গল্পের প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। ডিন আর কুনতজের *ওলির হাত* আমার এত ভাল লেগেছে যে গল্পটি দিতেই হলো। স্যর আর্থার কোনান ডয়েল তাঁর শার্লক হোমসকে *ছবি-রহস্য* নিয়ে এ সংকলনে সদর্পে প্রবেশ করেছেন'। আর রহস্য কাহিনির পুরোধা এডগার অ্যালান পো (স্বর্ণকীট) ছাড়া তো বইটি সম্পূর্ণই হবে না! এবং আমার অসম্ভব প্রিয় লেখক এইচ.জি. ওয়েলসকে (দানব পাখির ডিম) ছাড়া সংকনলটি করার কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না।

সংকলনটির গল্পগুলো চমৎকার অনুবাদ করেছেন অনুবাদকরা। আশা করি সবগুলো গল্পই কমবেশি ভাল লাগবে পাঠকদের। আর তাঁরা যদি চান তো অদূর ভবিষ্যতে এরকম আরেকটি অনুবাদ সংকলন তাঁদেরকে উপহার দিতে আমার যেমন কোনও অসুবিধে নেই, প্রকাশকেরও আপত্তি না থাকারই কথা!

অবশেষে নিজের কথা। আমাকে আমার ভক্তরা প্রায়ই ফোন করে জানতে চান আমার নিজের লেখা হরর বই কবে সেবা থেকে বেরুবে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন আগামী মাসেই সেবা থেকে আমার নতুন হরর সংকলন *সেই ভয়ংকর রাত* বেরুবে। এ বইতে আপনারা গা ছমছমে কিছু ভৌতিক গল্পের সঙ্গে পাবেন সম্পুর্ণ একটি পিশাচ উপন্যাস। বইটি আশা করি ভাল লাগবে আপনাদের। আর *অশুভ কুয়াশা* প্রকাশিত হবে *সেই ভয়ংকর রাত*-এর পরপরই। '*অশুভ কুয়াশা*'ও হরর কাহিনী হিসেবে পাঠক-মন জয় করে নেবে বলেই বিশ্বাস করি। আর আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন সেবায় এখন থেকে নিয়মিত হরর উপন্যাস লিখব আমি, সে সঙ্গে ডেনিস হুইটলি'র দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার ও রোমাঞ্চ কাহিনিগুলোর অনুবাদও উপহার দেব। সবাই ভাল থাকুন। সকলকে শুভেচ্ছা।

অনীশ দাস অপু
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

স্বর্ণকীট

অক্টোবর মাস।

সাউথ ক্যারোলিনার চার্লসটন আর তার আশপাশে এরই মধ্যে যা ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে সামনের দিনগুলোর কথা ভাবতেই হাত-পা সিঁটিয়ে আসে ভয়ে।

'উফ্, কী যম ঠাণ্ডারে বাবা,' কাঁপতে কাঁপতে বললাম আমি। 'এই ঠাণ্ডার মধ্যে এককাপ গরম কফির মত আর কিছু হয় না। ভিতর থেকে কফি তৈরি করে বারান্দায় এসে বসলাম। আয়েশ করে চুমুক লাগালাম কফিতে। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। দিব্যি স্ফূর্তির ভাব চলে এল মনে। তিন হপ্তা হাড়ভাঙা খাটুনির পর এবারে টানা বিশ্রাম আর চুটিয়ে আড্ডা দিতে না পারলে ঠিক জমছে না। কালকে ক্লাবে গিয়েছিলাম। আজকে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে। ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়। ভাবছি আর ভাবছি। আরে, লেগ্রাণ্ডের ওখানে গেলেই তো হয়। এতক্ষণ কেন যে মনে পড়েনি ভেবে অবাক হলাম।

লেগ্রাণ্ড, উইলিয়াম লেগ্রাণ্ড, আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রাচীন হিউজেনো বংশে জন্ম ওর। আর প্রাচীন বংশের যা হয়, নামটাই শুধু আছে। তবু ও চেষ্টা করেছিল সাধ্যমত, কিন্তু ওর ভাগ্যটাই বোধহয় বাঁকা রাস্তায় চলে। বার তিনেক এটা ওটা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিল ও। 'দুত্তোর,

আমাকে দিয়ে এসব হবে না,' বলে একদিন সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে গেল স্বেচ্ছা নির্বাসনে। সুলিভ্যান দ্বীপে। ওখানেই হঠাৎ করে পরিচয় ওর সঙ্গে। প্রচুর পড়াশোনা করেছে। বইপড়া, শিকার, মাছধরা আর সমুদ্রের ধারে ঝিনুক শঙ্খ কুড়ানোর প্রচণ্ড শখ। সারাক্ষণ যেন টগবগ করছে উত্তেজনায়। আর সুলিভ্যান দ্বীপে এর সবক'টিই হাতের কাছে। ওর স্বভাবের সাথে খাপ খায়, এমন সেরা জায়গাটিই বেছে নিয়েছে ও।

ঘড়িতে দেখলাম বেলা খুব বেশি হয়নি তবে আমার বাড়িটা পাহাড়ের কাছে বলে অন্ধকার নেমেছে একটু আগেই। তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারলে সন্ধ্যার পরপরই পৌঁছে যাব। ন'মাইল রাস্তাই তো। দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ মুহূর্তে ওভারকোটটা নেবার কথা স্মরণ হলো বলে মনে মনে পিঠ চাপড়ে দিলাম নিজেরই।

মূল ভূমি থেকে দ্বীপে যেতে হলে একটা ছোট্ট নদী মত পার হতে হয়। নৌকোয় মাঝ বরাবর আসতেই জোর হাওয়া বইতে শুরু করল। ঠাণ্ডায় হাড়-মজ্জা পর্যন্ত জমে যাবার দশা হলো আমার। সন্দেহ হলো, গায়ে কিছু আছে কিনা। শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠল ঠাণ্ডা। বললাম, 'দাঁড়াও বাবা ঠাণ্ডা, আমার সঙ্গে চালাকি? কী করে তোমাকে শায়েস্তা করতে হয়, জানা আছে আমার।' ধীরে সুস্থে কালকে ক্লাবে দেখা নীলনয়না সুন্দরীর মুখখানা কল্পনা করতে লাগলাম। ঠাণ্ডাটা একটু যেন কমে গেল মনে হলো। বেশ উৎসাহ পেলাম। ঠাণ্ডার ওঠা নামার সঙ্গে আমার মনঃসংযোগের জায়গাটিও ওঠানামা করতে লাগল। চমক ভাঙতেই দেখি দিব্যি গরম শরীরে পৌঁছে গেছি দ্বীপে।

দ্বীপটির চরিত্র লেগ্রাণ্ডের মতই অদ্ভুত। ছিটেফোঁটা মাটির দেখা মেলে মাঝেমধ্যে, বাকিটা বালিতে বোঝাই। পুরো দ্বীপটা

তিন মাইল মত লম্বা হলেও একটানা আধা মাইলের বেশি নয় কোথাও। সারা দ্বীপ জুড়ে অসংখ্য খাঁড়ি। নলখাগড়া আর ঝোপঝাড়ে ঠাসা। শিকারের জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে পিঁপড়ে খাওয়া মিষ্টির মত ঝরঝরে ক'টা পুরানো বড়ি আর পাম গাছের সারি। পশ্চিম প্রান্ত আর বালি ভরা সমুদ্র তীর ছাড়া বাকিটুকু মার্টল-এর ঘন ঝোপে ঢাকা। পুব প্রান্তটাই মূল ভূমি থেকে সবচেয়ে দূরে। আর এখানেই আস্তানা গেড়েছে লেগ্রাণ্ড। দ্বীপের উত্তরে একটা পাহাড় দেখেছি। ওর ওপাশে যাওয়া হয়নি এখনও।

মার্টলের বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। সেই পথ ধরে লেগ্রাণ্ডের কুটিরে যখন পৌছালাম অন্ধকার যেন তখনি ঝপ্ করে খসে পড়ল আকাশ থেকে। দরজায় তালা দেওয়া দেখে বুঝলাম বাইরে কোথাও গেছে ও। চাবি কোথায় লুকানো থাকে জানাই ছিল, দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালানোই ছিল। চেয়ারটা যতটা পারি কাছে নিয়ে বসলাম। হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে মনে হলো বুঝি স্বর্গে পৌঁছে গেছি। একটু ধাতস্থ হয়ে চারপাশে দৃষ্টি ফেরালাম। মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে আছে ঝিনুক আর শঙ্খের স্তূপ। ওপাশে দেয়াল ভর্তি বই। এক কোণে অগোছালো বিছানা, পাশে আধখোলা বাক্স প্যাঁটরা। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল আর গোটা দুয়েক চেয়ার।

চারপাশে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতেই কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম। একটু পরেই ঘরে ঢুকল লেগ্রাণ্ড, সঙ্গে জুপিটার।

'কাহার মুখ দেখিয়া আজি উঠিনু সকাল বেলা,' উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে এল লেগ্রাণ্ড, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল আমাকে। 'কতক্ষণ হলো এসেছ?'

‘এই তো, একটু আগে। তারপর, ভাল আছ তো? তোমার কী খবর, জুপ?’

‘ভাল, স্যর,’ একগাল হেঁসে শিকার করে আনা বনমোরগগুলোর ব্যবস্থা করতে বসে গেল জুপিটার।

জুপিটার হলো লেগ্রাণ্ডের কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ সব করছে লেগ্রাণ্ডের জন্যে। ‘ব্যাটা ছিল ক্রীতদাস,’ প্রথমবার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলেছিল লেগ্রাণ্ড। ‘একদিন দিলাম মুক্ত করে। তা আমি ছাড়লেও কমলি ছোড়তা নেহি। তাই কী আর করি, টেনে বেড়াচ্ছি।’

‘ক্রীতদাস ছিল, এখন তা হলে ও বিকৃতদাস, কী বলো?’ হেসেছিলাম আমি। শুনে লেগ্রাণ্ড এমন ঘর কাঁপানো হাসি দিয়েছিল যে ছাদ থেকে মোটাসোটা একটা টিকটিকি থপ্ করে মেঝের ওপর পড়ে লেজটা খুলে রেখে পালিয়েছিল। এখন ও এমন হাসি দিলেই চট্ করে ছাদের দিকে দেখে নিই একবার।

‘দেখো, কেমন চমৎকার সব ঝিনুক পেয়েছি আজকে,’ খুশিতে শিশুর মত উচ্ছল হয়ে দেখাতে লাগল লেগ্রাণ্ড। ‘আর জানো, এমন দারুণ একখানা পোকা পেয়েছি না যে, কী বলব। জীবনে দেখোনি এমন পোকা। কালকে দেখাব।’

মনে মনে বললাম, তোমার মাথার পোকাটা কবে দেখতে পাব? ওটা বেরোবে কবে? মুখে বললাম, ‘আবার কালকে কেন, এখনই দেখাও না।’

‘কাছে থাকলে তো দেখাব। রাস্তায় আসতে আসতে লেফটেন্যাণ্ট জিরাফের সঙ্গে দেখা। পোকাটা...

‘লেফটেন্যাণ্ট জিরাফটা আবার কে?’ থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

‘আরে, ওই যে লম্বু, লেফটেন্যাণ্ট জি। পোকাটা দেখে তো

অবাক, বাড়িতে লোকদের দেখাতে চাইলেন। তাই তো আজকের জন্যে তাঁর কাছে রেখে এলাম। তা তুমিও যে এমন হঠাৎ করে আসবে, কে জানত!'

'ঠিক আছে, আরেক দিন দেখা যাবে,' এই প্রসঙ্গ থেকে ফেরাতে চাইলাম ওকে, কিন্তু কীসের কী!

'আরেক দিন না, কালকেই দেখাব তোমাকে। ওটা গুবরে পোকার জাত, ডাগরডোগর চেহারা, ঠিক যেন একটা আখরোট। কী গায়ের রং, আহা! একেবারে কাঁচা সোনা। পিঠের ওপর এক ধারে ঠিক পাশাপাশি দুটো কালো কুচকুচে ফুট্‌কি, অন্য ধারে লম্বা কালো বর্ডার।'

'পাকা সোনার তৈরি, স্যর, আর ভারি কী! ঠিক যেন একটা সোনার চাকতি। জীবনে কোনওদিন এত বড় পোকা দেখিনি,' একটু ফাঁক পেতেই এতক্ষণ চেপে রাখা উচ্ছ্বাসটুকু প্রকাশ করল জুপিটার।

'পোকা বাদ দিয়ে রান্নার দিকে নজর দাও, চাঁদ, পুড়ে গেলে তোমাকে গরম তেলে ভাজব আজকে।' পুরোনো কথার খেই ধরে আবার শুরু করল লেগ্রাণ্ড। 'তা ও একেবারে মিথ্যে বলেনি কিছু, পোকাটা দেখলেই বুঝবে। সারা গায়ে চাকা চাকা আঁশ। ঝকঝক করছে সোনার মত। দাঁড়াও, তোমাকে ছবি এঁকেই দেখাই।' উঠে গিয়ে কাগজের খোঁজে এদিক ওদিক জিনিসপত্র উল্টানো শুরু করল লেগ্রাণ্ড। বুঝলাম পাগল ক্ষেপেছে। কোথায় ভেবেছিলাম জমিয়ে গল্প করব অনেকক্ষণ, সেই সাথে দু'এক গ্লাস সাবড়ে দেব, তা না, পোকাই খেলো সব। তাকিয়ে দেখি টেবিলের ড্রয়ার শেষ করে বিছানা ওলটপালট করা শুরু করে দিয়েছে লেগ্রাণ্ড। আঁকার মত কোনও কাগজ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পকেট হাতড়াতে শুরু করল। 'আহ্, পাওয়া গেল মনে হয় একটা।' কোটের নীচের

পকেট থেকে ময়লা একটা চিরকুট বেরোলো। 'এতেই চলবে,' বলে কলম টেনে নিয়ে আঁকতে শুরু করল।

'এই নাও,' আঁকা শেষ করে কাগজটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল লেগ্রাণ্ড। 'হুবহু প্রায় এরকমই দেখতে পোকাটা।'

ঝুঁকে পড়ে কাগজটা নিলাম ওর হাত থেকে, দেখতে যাব এমন সময় আস্তে করে দরজাটা খুলে গেল, দেখি দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল কালো একটা কুকুর। জার্ডিন, লেগ্রাণ্ডের আরেক সঙ্গী ওটা। আমার দিকে চোখ পড়তেই ছুটে এল, লাফ দিয়ে কাঁধের ওপর দু'পা তুলে গালটাল চেটে একেবারে একশা করে ফেলল। গলায় হাত বুলিয়ে আদর করে কোনওরকমে শান্ত করলাম ওকে। গালটা মুছে নিয়ে চোখ ফেরালাম কাগজটার দিকে। ভাল করে দেখলাম বেশ কিছুক্ষণ। তারপর লেগ্রাণ্ডের দিকে ফিরে বললাম, 'সত্যি দারুণ একখানা পোকা বটে, জীবনে দেখিনি কোনওদিন, দেখব বলে আশাও করি না। এটা পোকা না মড়ার মাথার খুলি?'

'বলো কী? দেখি দেখি,' বলে আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল কাগজটা। 'তা প্রায় ঠিকই বলেছ, ওপরের কালো ফুটকি দুটো চোখের গর্তের মত আর নীচের লম্বা দাগটুকু মুখের মত, সব মিলে মড়ার মাথার খুলির মতই লাগছে বটে।'

'সম্ভবত তোমার আঁকার গুণেই পোকাটার চেহারার এই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে,' খোঁচা দেয়ার এই সুযোগটা ছাড়লাম না।

'ঠিকই এঁকেছি,' একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল লেগ্রাণ্ড। 'ওরকমই চেহারা পোকাটার।'

'তা হলে বরং কোনও পোকাবিশারদকে খবর দাও। জীবনে কোনওদিন এমন পোকা দেখা তো দূরের কথা, নামও শোনেনি নিশ্চয়,' আমি ওকে আরেকটু রাগিয়ে দেবার জন্যে বললাম।

'ভাল কথা, তোমার পোকার পাখনা কই?'

'তোমার চোখে কী ঠুলি লাগানো? পাখনা যে পোকার সাথেই, চোখে পড়ছে না?'

'কই দেখি,' বলে কাগজটা নিলাম ওর কাছ থেকে, উল্টেপাল্টে দেখে বললাম, 'কী জানি, আমাকে দেখে পোকাটা বোধহয় লজ্জা পেয়ে পাখনা লুকিয়েছে, দেখ তোমাকে দেখে লজ্জা ভাঙে কিনা।' বুঝতে পারছি ওর মেজাজ এখন সপ্তমে। কাগজটা আমার হাত থেকে একটানে কেড়ে নিয়ে ফায়ারপ্লেসের মধ্যে ফেলে দিতে যেয়ে কী মনে করে আঁকা ছবিটার দিকে একবার তাকাল ও। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই ওর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে বাতিটা তুলে নিয়ে কোণের দিকে চলে গেল। একটা বাক্সের ওপর বসে বাতির সামনে কাগজটা ধরে উল্টেপাল্টে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে একটা বাক্স খুলে কাগজটা তার মধ্যে রেখে বাক্সটায় তালা লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটু পায়চারি করল, তারপর এসে বসল আগের চেয়ারটায়। চেহারা দেখে বুঝলাম রাগটা নেই বটে, কিন্তু ও আর এ জগতে নেই।

'জানো, সেদিন এক মজার ব্যাপার ঘটেছে,' ওকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে শুরু করলাম। 'আমাদের...' তাকিয়ে দেখি একদৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে ও। বললাম, 'শুনছ নাকি?'

'উঁ!'

'জানতে চাইছি, আমার কথা তুমি শুনছ?'

'হুঁ।'

হাল ছেড়ে দিলাম এরপর। এখন ওকে ফেরানো আমার কম্ম নয়। রাতের খাবার সময়েও কোনও কথা বলল না ও। এভাবে

কতক্ষণ বসে থাকা যায়, উঠে পড়লাম আমি, 'চলি তা হলে।' ভেবেছিলাম থাকতে বলবে, আর আমারও এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আবার ন'মাইল রাস্তা ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে করছিল না; কিন্তু তেমন কিছুই বলল না ও।

'আবার এসো,' কথাটা অবশ্য খুব আন্তরিক ভাবেই বলল। বাইরে বেরোতেই হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল ঠাণ্ডা।

প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে এরপর। লেগ্রাণ্ডের আর কোনও খোঁজ পাইনি। নানা ঝামেলায় আমারও সময় করে ওঠা হয়নি। একদিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেই দেখি জুপিটার বসে আছে বারান্দায়, মুখ শুকনো, চুল উস্কোখুস্কো। ধক্ করে উঠল বুকের ভিতর। লেগ্রাণ্ডের কিছু হলো না তো?

'কী খবর জুপ, লেগ্রাণ্ড কেমন আছে?'

'ভাল নেই, স্যর।'

'কী হয়েছে?' কখন যে জুপিটারের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি লাগিয়েছি খেয়ালই করিনি।

'কী হয়েছে জানলে তো আর চিন্তা করতাম না, স্যর। বুঝতেই পারছি না কী হলো।'

'একেবারে বিছানায় পড়ে গেছে, নাকি নড়াচড়া করতে পারে?'

'বিছানায় পড়ে থাকলে তো বেঁচেই যেতাম, স্যর। দিন রাত শুধু টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় সে যায় তাও জানি না।'

বুকের মধ্যে থেকে একটা ভার যেন নেমে গেল। যাক, ও সুস্থ আছে। সেই সাথে একটু দুশ্চিন্তাও হলো। মাথায় কী ঢুকল ওর যে এই ভাবে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে! জুপিটারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি চোখে চোখে রাখতে পারো না?'

'চেষ্টা তো স্যর সবসময়ই করি, পারি কই। গত রাতে তো সারাক্ষণ পাহারা দিয়েই রেখেছিলাম, সকালের দিকে চোখটা একটু লেগে এসেছে, সেই ফাঁকে উনি সটকে পড়েছেন। আমি আর কী করি। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম যা হয়, হবে, আজকে একটা এস্পার ওস্পার করে ছাড়ব। মোটা একটা লাঠি তৈরি করে বসে থাকলাম বাইরে। আজ ফিরলেই ঠ্যাং ভেঙে দেব, পড়ে থাকুন ঘরে, তাও তো চোখের সামনে থাকবেন। কিন্তু যখন ফিরলেন উনি, কী বলব স্যর, মুখের দিকে তাকানো যায় না। ময়লা, ঘামে মুখ ভর্তি, জামাকাপড় ছেঁড়া, একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছেন, না ধরলে পড়ে যাবেন মনে হলো। লাঠি ফেলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। এরপর কী আর লাঠিপেটা করা যায়, স্যর?'

'বলো কী জুপ, মনিবকে ঠ্যাঙাবে?'

'কী করব স্যর, আপনিই বলেন।'

জুপিটারের করুণ চোখ দেখে মায়াই হলো ওর ওপর। 'ঠিক আছে, আর ঠ্যাঙাতে হবে না। আচ্ছা, সেদিন তো ওকে ভালই দেখলাম। এর মধ্যে এমন কী হলো যে ও এরকম হয়ে গেল?'

'হয়েছে স্যর, আগেই।'

অবাক হলাম আমি। 'বলো কী? কীভাবে হলো?'

'আসলে, স্যর, যত নষ্টের গোড়া ওই সোনাপোকাটাই।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সোনাপোকা? সেটা আবার কী?'

জুপিটার চোখ কপালে তুলে বলল, 'সে-কী, স্যর! এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? সেদিন সেই সোনাপোকার ছবি আঁকা নিয়েই না কত কাণ্ড।'

চট করে মনে পড়ে গেল সব। আসলে পোকাটার কথা ভুলেই

গিয়েছিলাম একেবারে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা পোকাটা কী করল?'

'পোকাটাই যত নষ্টের গোড়া, স্যর। আস্ত শয়তান একটা। দেখেননি তো স্যর, দেখলে বুঝতেন। সারাক্ষণ তিড়িং তিড়িং করে লাফায় আর সামনে যা পায় তাতেই কামড় বসায়। প্রথমবার ধরার সময় ওটা স্যরের হাতে কামড় দিয়েছিল। আমার মনে হয়, স্যর, কুকুর কামড়ালে পেটে যেমন বাচ্চা হয়, পোকার কামড়ে স্যরের মাথার মধ্যেও তেমনি সোনাপোকার বাচ্চা হয়েছে অনেকগুলো। তাই খালি সোনার চিন্তা ছাড়া আর কিছু নেই মাথার মধ্যে। স্বপ্নে পর্যন্ত সোনা-সোনা করে চেঁচিয়ে ওঠে।'

'বলো কী?' জুপিটারের কথায় দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল আমার। শেষ পর্যন্ত সোনার চিন্তায় লেগ্রাণ্ড পাগল হয়ে গেল নাকি? মনে মনে একটা হিসাব করে ফেললাম। সুলিভ্যান দ্বীপে যাতায়াতের খরচ, সাথে মাসখানেক কোনও মানসিক চিকিৎসালয়ে থাকার খরচ। শ'তিনেক ডলারে হয়ে যাবে বোধহয়। খরচ যোগাতে আমাকে অবশ্য একটু বেশি লিখতে হবে। কুছ পরোয়া নেই, তবু যদি লেগ্রাণ্ড ভাল হয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, তুমি কী নিজেই বুদ্ধি করে আমার কাছে এসেছ, নাকি ও পাঠিয়েছে?'

'জ্বী না, স্যার, উনিই পাঠিয়েছেন। এই চিঠিটা দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্যে।'

'সে কথা এতক্ষণে বলছ বোকচন্দ্র,' ছিনিয়ে নিলাম চিঠিটা ওর কাছ থেকে। কোনও রকম সম্বোধন ছাড়াই লিখেছে ও।

'অনেকদিন হলো তোমার সাথে দেখা নেই। সেদিনের ব্যাপারে আমাকে ভুল বুঝলে কষ্ট পাব খুব। সেদিনের পর থেকে যে দুশ্চিন্তায় আছি, তোমাকে না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিনে। কিন্তু কীভাবে বলব সেটাই ভেবে পাচ্ছিনে।

শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ইদানীং। তারপর আবার জুপের সেবা-যত্নের অত্যাচারে মারা যাচ্ছি। সেদিন ওকে না জানিয়ে পাহাড়ে গেছি একটু শান্তিতে দিনটা কাটাব বলে। ফিরে দেখি লাঠি হাতে ব্যাটা বসে রয়েছে আমাকে ঠ্যাঙাবে বলে। বলো তো কী কাণ্ড। ক্লান্ত না থাকলে নিশ্চয়ই ও ঠ্যাঙাত সেদিন।

যাকগে, নতুন কিছু জোগাড় হয়নি আর। সম্ভব হলে আজই জুপের সাথে চলে আসবে। আজ রাতেই তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার আমার। মনে রেখো, অত্যন্ত দরকার বলেই তোমাকে ডেকেছি। আজ রাতেই আসা চাই।

তোমারই,
লেগ্র্যাও।'

চিঠিটা পড়ে মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। ও কখনোই এমন ভাবে চিঠি লেখে না। নিশ্চয়ই কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। কোন্ উদ্ভট খেয়ালে ক্ষেপে উঠল ও? জুপিটারকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতর থেকে পোশাক পাল্টে এলাম। বললাম, 'চলো।'

নদীর ধারে পৌঁছে দেখি নৌকা নিয়ে এসেছে জুপিটার। নৌকার মধ্যে রয়েছে কাস্তে, দুটো কোদাল আর একটা শাবল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব কেন, জুপ?'

'আমি কী জানি, সব স্যারের হুকুম। নিশ্চয়ই মাথার ভিতর থেকে ওই পোকার বাচ্চাগুলো পরামর্শ দিয়েছে।'

বুঝলাম দুজনের মাথাতেই ওই পোকা ছাড়া আর কিছু নেই এখন।

নৌকা থেকে নেমে দু'মাইল পায়ে চলা পথ। লেগ্রাণ্ডের কুটিরে যখন পৌঁছলাম তখন তিনটে বেজে গেছে। দূর থেকে আমাকে দেখেই ছুটে এল ও। কিন্তু কাছে এসে কেমন উত্তেজিত আর

একটু ইতস্তত ভাবে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। মনটা খারাপ হয়ে গেল যখন দেখলাম ওর ফ্যাকাসে মুখ আর কোটরে বসা চোখ। অস্বাভাবিক এক উজ্জ্বলতা যেন চোখে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছ।'

'ভাল।'

ভিতরে গিয়ে বসলাম আমরা। জুপিটারকে কফির জল চড়াতে বলল লেগ্রাণ্ড। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, সেই পোকাটা ফেরত এনেছ?'

লালচে হয়ে উঠল লেগ্রাণ্ডের মুখ। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ; পরদিনই এনেছি।' তারপর প্রায় আপন মনেই বলতে লাগল, 'জুপের কথাই ঠিক, খাঁটি সোনার তৈরি পোকা ওটা। কিছুতেই হাতছাড়া করছিনে ওকে। ওর দৌলতেই এবার আমি আমার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করব। সোনার খবর এনেছে লোকটা। এবারে শুধু মাথা খেলিয়ে সোনাটা আনতে হবে হাতে। তারপর আমাকে পায় কে। আমি তখন রাজা। হাঃ হাঃ...' জুপিটারের দিকে ফিরে হঠাৎ হাঁক ছাড়ল লেগ্রাণ্ড, 'কই হে জুপ, সোনামণিটাকে আনো দেখি।'

'কাকে আনব, স্যর? ওই পোকাটাকে?' আঁৎকে উঠল জুপিটার। 'মরে গেলেও ওটাকে আর ধরছি না আমি।'

'মরগে ব্যাটা গাধা কোথাকার,' রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে লেগ্রাণ্ড নিজেই গিয়ে একটা কাঁচের জারের মধ্যে থেকে পোকাটাকে বের করে আনল।

অপূর্ব সুন্দর দেখতে পোকাটা। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'বাহ্!'

'কীহে, এখন কেন বাহ্ বলছ?' খোঁচা দেবার এই সুযোগটা ছাড়ল না লেগ্রাণ্ড। আগের কথাগুলো মনে করে একটু লজ্জা পেলাম। সত্যি, যেমন বলেছিল লেগ্রাণ্ড ঠিক তেমনি পোকাটা।

পিঠের একপাশে দুটো কালো ফুটকি, অন্যপাশে কালো লম্বা দাগ। শক্ত কিন্তু তেলতেলা আঁশ সারা গায়ে। কাঁচা সোনার মত উজ্জ্বল রং। এবং অস্বাভাবিক রকমের ভারি। মনে হলো জুপিটারের কথাই সত্যি! কিন্তু তাই বলে লেগ্রাণ্ডের জন্যে সোনার খবর এনেছে পোকাটা, এটাকে পাগলামি ছাড়া কিছুই ভাবতে পারলাম না। পোকাটা ফিরিয়ে দিলাম ওর হাতে। উচ্ছ্বসিত হয়ে লেগ্রাণ্ড বলল, 'এবার শোনো, কেন তোমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছি। পোকাটাই আমার সৌভাগ্য বয়ে আনতে যাচ্ছে। তবে একটা ব্যাপারে তোমার পরামর্শ চাইছি, ব্যাপারটা হলো...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'একটা ব্যাপারেই তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তা হলো, তোমার শরীর খারাপ, সম্ভবত জ্বর এসেছে, সুতরাং ক'টা দিন চুপচাপ বিশ্রাম নাও। তারপর যা করার কোরো।'

'কে বলেছে আমার জ্বর, শরীর অসুস্থ?' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লেগ্রাণ্ড, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখো, পালস্ দেখো, জ্বর পাও কিনা।' হাত না ধরেই বললাম, 'জ্বর না হয় নাই হলো, কিন্তু তোমার শরীর অসুস্থ, তোমাকে ক'টা দিন বিশ্রাম নিতেই হবে। উত্তেজনা তোমার শরীরের জন্যে ক্ষতিকর...'

'দেখো, আমি খুব ভাল আছি। আর উত্তেজনার কথা বলছ? তুমি সাহায্য করলে উত্তেজনা কমানো তো একবেলার কাজ...'

'বলো তুমি, কী করতে হবে?'

'আজ রাতে আমি আর জুপ বেরোচ্ছি। পাহাড়ের ওপাশে, দ্বীপটার বাইরের দিকে। যেহেতু ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় সে-কারণেই তোমার আর জুপের মত বিশ্বাসী লোক ছাড়া হবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আজকের অভিযানই আমার উত্তেজনা কমানোর একমাত্র পথ।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' বললাম আমি। 'তবে একটা কথা, এই অভিযানের সঙ্গে পোকাটার কোনও সম্পর্ক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে মাফ করো ভাই, এর মধ্যে আমি নেই।'

'কী আর করা,' একটু ক্ষুণ্ণ মনেই বলল লেগ্রাণ্ড। 'তা হলে জুপকেই নিতে হয় শুধু,' বলে পা বাড়াল বাইরের দিকে।

হাত ধরে থামালাম আমি ওকে, বললাম, 'সত্যিই যাবে?'

'আজকে আমাকে যেতেই হবে।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'মোঘলের হাতে যখন পড়েছি, খানা তো খেতেই হবে একসাথে। যাব আমি, তবে এক শর্তে। শর্তটা হলো আর কোনওদিন এভাবে বেরোতে পারবে না। রাজি?'

'জো হুকুম, হুজুর,' মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বলল লেগ্রাণ্ড। 'ভেবো না, কালকে ভোরের মধ্যেই ফিরে আসব।'

রওনা হয়ে গেলাম আমরা। তিনটের মত বাজে। শীতের দিন আর চারপাশে ঝোপঝাড়ের জন্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। জুপিটারের হাতে কাস্তে আর কোদাল দুটো। সারা রাস্তা গজ্‌গজ্ করতে করতে চলল ও। মাঝে মাঝে পাগল, সোনা আর পোকা শব্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না। আমার হাতে মুখ খোলা দুটো লণ্ঠন। লেগ্রাণ্ডের হাতে শুধু একটা শক্ত সুতোয় বাঁধা সেই পোকাটা। এক প্রান্ত আঙুলে জড়িয়ে পোকাটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে, গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে চলেছে ও। 'আমার সোনার ময়না...' গানের এ কথাটুকু বুঝলাম শুধু। তারপর পোকা বলল না পাখি বলল ঠিক ধরতে পারলাম না। বাকিটুকু লা লা লা লা লা দিয়ে চলল। মনে হলো ঠিক একটা পাগল চলেছে। মনটা

কেমন যেন করে উঠল। ওকি সত্যিই পাগল হয়ে গেল? বার কয়েক জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছি। কোনও উত্তরই দিল না ও। লা লা লা শব্দটা একটু জোরালো হয়ে উঠল শুধু।

হাঁটতে হাঁটতে দ্বীপের উত্তর মাথায় পৌঁছালাম আমরা। নৌকায় করে একটা খাঁড়ি পার হলাম। অমন নির্জন জায়গায় নৌকা এল কী করে জানতে চাইতেই একটু মুচকি হাসল লেগ্রাণ্ড। বুঝলাম ওরই কীর্তি। মূল ভূমির একটা টিলার কাছে নৌকা ভিড়াল জুপ। টালমাটাল হয়ে নৌকা থেকে নামলাম সবাই। রওনা দিলাম সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে। অত্যন্ত অনুর্বর অঞ্চল ওটা, আর সে কারণেই বোধহয় খুব নির্জন। এবারে লেগ্রাণ্ড সবার আগে। এমন ভাবে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যেন বাড়ির পথ ধরেছে। ঘণ্টাখানেক এভাবে চলার পর ঠিক সূর্যাস্তের সময় যেখানে পৌঁছালাম তেমন নির্জন আর ভয়ঙ্কর জায়গা কল্পনাও করিনি কোনওদিন। একটা চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতেই পায়ে খিল ধরে গেল আমার। 'তোমরা গেলে যাও, আমি বিশ্রাম না নিয়ে নড়ছি না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম আমি।

'পাঁচ মিনিটের বেশি নয়,' রওনা দেবার পর এই প্রথম কারও সাথে কথা বলল লেগ্রাণ্ড। ধপ করে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম। একটু ধাতস্থ হয়ে নজর ফেরালাম চারপাশে। একটা মালভূমি এটা। একটু দূরেই শুরু হয়েছে বিশাল পাহাড়ের সারি। গায়ে লম্বা লম্বা গাছ আর ঝোপঝাড়। আর গাছের গুঁড়িগুলোকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য নুড়ি আর ছোট বড় পাথর। এখানে সেখানে পাহাড়ের ফাঁকে গভীর খাদ। সব মিলিয়ে একজন লোকের পক্ষে আতঙ্কিত হয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট।

'পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, ওঠো এবার,' বলল লেগ্রাণ্ড। 'ওই যে দূরে লম্বা একটা টিউলিপ গাছ দেখতে পাচ্ছ, ওটার কাছেই যাব

আমরা।' বলল তো যাব কিন্তু কীভাবে, ভেবে পেলাম না। রাস্তা বলতে কিছু নেই। সমস্তটাই কাঁটা আর ঝোপঝাড়ে ভর্তি।

'জুপ, কাস্তে লাগাও, রাস্তা বানাও।' হুকুম দিল লেগ্রাণ্ড।

জুপিটার কোদাল দুটো নামিয়ে রেখে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে একজন যেতে পারে এমন চওড়া একটা রাস্তা বের করতে লাগল। তার পিছনে আমি দু'হাতে লণ্ঠন দুটো বাড়িয়ে ধরে এগোতে লাগলাম। আমার পিছনে লেগ্রাণ্ড, হাতে কোদাল দুটো আর পকেটে সোনাপোকা। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর এসে পৌঁছালাম টিউলিপ গাছটার গোড়ায়। এই শীতের দিনেও জুপিটারের সারা গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। আমাদের কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ধপ করে বসে পড়লাম গাছটার গোড়ায়। এখানে পৌঁছে লেগ্রাণ্ড যেন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, কথা বলছে সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক জোরে। তাকিয়ে দেখি চারপাশে লম্বা লম্বা ওক গাছের মিছিল, কিন্তু টিউলিপ গাছটার কাছে ওগুলো শিশু মাত্র। রাজার মত গাম্ভীর্য নিয়ে বিশাল ডালপালা মেলে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা।

'গাছে চড়তে পারিস?' জুপিটারের দিকে ফিরে বলল লেগ্রাণ্ড।

'আমি চড়তে পারি না এমন গাছ এখনও জন্মায়নি, স্যর,' মিনমিনে গলায় বলল জুপিটার।

'নে, আর বাহাদুরি ফলাতে হবে না। উঠে পড় তাড়াতাড়ি।'

'কত দূর উঠতে হবে?'

'উঠতে থাক তো, তারপর বলছি। দাঁড়া, তার আগে এই সোনাপোকাটা নে।'

আঁৎকে উঠল জুপিটার, হাউমাউ করে বলল, 'ওরে বাবা, আমি পারব না। ওই শয়তানটাকে নিয়ে গাছে উঠলেই ও আমার ঘাড় মটকাবে। আমি পারব না, স্যর।'

'তুই যে একটা ভীতুর ডিম তা তো জানতাম না। আরে উজবুক, ছোট্ট একটা পোকাই তো। আর তোকে তো হাত দিয়ে ধরতে হচ্ছে না। সুতো ধরে তুলে নিবি। নে ওঠ হতভাগা, নইলে তোর মাথা ফাটাচ্ছি,' বলে হাত ধরে টেনে মাটি থেকে জুপিটারকে উঠিয়ে দিল লেগ্রাণ্ড। নেহায়েৎ যেতে হবেই, এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল জুপিটার। যেন বাচ্চার ভেজানো কাঁথা নিয়ে যাচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে সুতোটার একেবারে শেষ মাথাটা অত্যন্ত সাবধানে ধরল ও। পোকাটা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থেকে টিউলিপ গাছটাতে উঠতে শুরু করল।

টিউলিপ গাছ তরুণ অবস্থায় খুব মসৃণ থাকে, তারপর ধীরে ধীরে ডালপালা ছড়ায়। যখন বুড়ো হয় তখন গাছের ডাল ফেটে খস্‌খসে হয়ে যায়, নতুন ডালপালা গজায় কাণ্ডের চারপাশে। এইসব ডালপালা ধরে আর ফাটা ছালে পা রেখে উঠতে লাগল জুপিটার। মাটি থেকে প্রায় ষাট সত্তর ফুট ওঠার পরে পৌঁছোল গাছের প্রথম বড় ডালটাতে।

'পৌঁছে গেছি, স্যর,' চিৎকার ভেসে এল জুপিটারের। 'এবার কোন্‌দিকে? ডানে না বাঁয়ে?'

'ওপর দিকে, হতভাগা!' লেগ্রাণ্ডের বাজখাঁই আওয়াজ শুনে জুপিটার উঠে দাঁড়াল আবার। এরপর থেকে ডালপালা বেশি থাকায় তরতরিয়ে উঠতে লাগল ও।

'ওই যে সবচেয়ে বড় ডালটা দেখছিস, ওটা পর্যন্ত যা আগে। গুনতে গুনতে যা, ক'টা বড় ডাল পেরোলি।' ডাল-পালার আড়ালে জুপিটারকে আর দেখা যাচ্ছে না। পাতার আড়াল থেকে কিছুক্ষণ পর চিৎকার শোনা গেল জুপিটারের, 'আর কতদূর?'

'ক'টা ডাল পেরোলি?'

'পাঁচটা।'

'আর একটা বাদ দিয়ে পরেরটায় যা। সাত নম্বর ডালে, বুঝেছিস?'

কিছুক্ষণ পর চিৎকার শোনা গেল জুপিটারের, 'এসে গেছি, স্যর, এবার নামি?'

'তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব, বদমায়েশ কোথাকার।' যেভাবে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গাল দিয়ে উঠল লেগ্রাণ্ড তাতে ও যে এখন বদ্ধ উন্মাদ সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ রইল না আমার। 'এবারে ওই ডালটা বেয়ে সোজা এগো, কিছু চোখে পড়লে সাথে সাথে জানাবি,' চিৎকার করে জানাল লেগ্রাণ্ড। কিছুক্ষণ পর শোনা গেল জুপিটারের চিৎকার, 'আর এগোতে সাহস পাচ্ছি না, স্যর। ডালটা মরা, একেবারে শুকনো মনে হচ্ছে।'

'কি বললি, শুকনো ডাল?'

'জ্বী, স্যর, একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং।'

'চুপ,' ধমকে উঠল লেগ্রাণ্ড। একটুক্ষণ চিন্তা করল কী যেন। আমি বলতে গেলাম, 'অনেক হয়েছে, চলো এবার ফেরা যাক,' এমন ভাবে তাকাল আমার দিকে যে একটু ভয়ই পেলাম। ওপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল, 'জুপ।'

'বলেন, স্যর।'

'ছুরি আছে তোর সাথে?'

'আছে, স্যর।'

'তা হলে ডালটার গায়ে ছুরি বসিয়ে দেখ তো ওটা খুব পচা কিনা।'

খানিকক্ষণ পরে উত্তর এল জুপের, 'খুব পচা, স্যার, তবে একেবারে ঝাঁঝরা নয়। আমি একা হলে এগোতে পারতাম আরও।'

'একা হলে মানে?' অবাক হয়ে চিৎকার করল লেগ্রাণ্ড। 'তোর সাথে আবার কে জুটল ওখানে?'

'পোকাটা, স্যর। যা ভারি ব্যাটা। নীচে ফেলে দিই, স্যর? তা হলে একা একা ভালমত যাওয়া যাবে।'

'খবরদার, পাজী, ছুঁচো,' নিশ্চিন্ত গলায় বলল লেগ্রাণ্ড। 'পোকাটাকে ফেললে তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব। এগোতে থাক, বকশিশ পাবি আস্ত একটা রুপোর ডলার।'

সাথে সাথে উচ্ছ্বসিত গলায় উত্তর এল, 'একেবারে শেষ মাথা ছুঁয়ে ফেলব, স্যর।' কিছুক্ষণ পরপরই লেগ্রাণ্ড চিৎকার করতে লাগল, 'কীরে, কতদূর?' আর প্রত্যেকবারই উত্তর এল, 'এই তো, স্যর, প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছি।' বিরক্ত হয়ে চিৎকার বন্ধ করল লেগ্রাণ্ড। কিছুক্ষণ পর ওপর থেকে হঠাৎ আতঙ্কিত গলা ভেসে এল জুপিটারের, 'ওরে বাবারে! স্যর, মারা গেছি স্যর! একেবারে মারা গেছি।' লেগ্রাণ্ড উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো?'

'মড়ার মাথা, স্যর, মস্ত বড়, ডালে আটকে আছে।'

'দেখতে পেয়েছিস তা হলে? কিন্তু কীভাবে ডালে আটকে আছে দেখ তো।'

'আজব ব্যাপার, স্যর, কে বা কারা যেন পেরেক দিয়ে খুলিটা ডালের সাথে আটকে দিয়েছে।'

'তোর সাধু ভাষা থামা,' ধমকে উঠল লেগ্রাণ্ড। 'এবার মন দিয়ে আমার কথা শোন। দেখ তো ওটার বাঁ চোখ কোন্ দিকে।'

'চোখ কোথায় পাব, স্যর। চোখ-টোখ কিচ্ছু নেই, একেবারে ফক্কা।'

'প্যাচাল থামা, তোর ডান হাত কোন্টা, বাঁ হাত কোন্টা—চিনিস?'

'কী যে বলেন, স্যর, এ-তো সোজা। যে হাতে কাঠ কাটি সেটাই তো বাঁ হাত।'

'ব্যাটা বাঁইয়া,' হেসে উঠল লেগ্রাণ্ড। 'শোন এবার, তোর বাঁ হাতটা যেদিকে সেদিকেই তো বাঁ চোখ, তাই না? এবার দেখ খুলিটার বাঁ চোখের ফোকরটা খুঁজে পাস্ কিনা। বুঝেছিস্ তো?'

'জ্বী, স্যর, পানির মত। ওর বাঁ হাতের দিকেই ওর বাঁ চোখ, তাইতো? এত সোজা। ওহো, শুধু মুণ্ডুর আবার হাত পাই কই। মুশকিলে ফেললেন, স্যর।'

লেগ্রাণ্ড রাগের চোটে কী বলবে, ভেবে না পেয়ে কষে লাথি কসাল একটা মড়া ডালে। রকেটের মত ছিটকে চলে গেল ওটা। তারপর কিছু বলতে ওপরে তাকাতেই ভেসে এল জুপিটারের গলা, 'পেয়েছি স্যর, বাঁ চোখ, এবার কী করতে হবে? নেমে আসব?'

'চুপ শয়তান,' গালি দিয়ে উঠল লেগ্রাণ্ড। 'এবার ওই বাঁ চোখের গর্তে পোকাটাকে নামিয়ে দে।'

'ছেড়ে দেব, স্যর? উড়তে উড়তে নামুক?'

'খবরদার,' চেঁচিয়ে উঠল লেগ্রাণ্ড। 'সুতো ছেড়ে দিবি না। পোকাটা নামিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সুতো ছাড়তে থাক। থামতে বললে থামবি।'

'জ্বী, স্যর, এ আর এমন কী।'

চুপচাপ তাকিয়ে থাকলাম ওপরের দিকে। কিছুক্ষণ পর পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল পোকাটাকে। গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে আসা চাঁদের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে পোকাটা। একটু দুলছে আর সেই সাথে ছোট ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে একটু একটু করে নেমে আসছে নীচে। মনে হলো ঠিক যেন একটা সোনার তারা আকাশ থেকে খসে পড়ছে। লেগ্রাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি

সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে ও। পোকাটা নামতে নামতে ঠিক ঝোপঝাড়ের মাথার ওপর আসতেই চেঁচিয়ে উঠল লেগ্রাণ্ড, 'থাম।' থেমে গেল নামা। লেগ্রাণ্ড পোকাটার ঠিক নীচে খানিকটা জায়গায় উল্টো সোজা কাস্তে চালিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল। ওপর দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'নামা।' নামতে লাগল পোকাটা। নামতে নামতে এক সময় মাটি ছুঁলো। লেগ্রাণ্ড পড়ে থাকা একটা লম্বা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ওটাকে কেটে তিনটে চোখা খুঁটি বানাল। একটি খুঁটি পোকাটা যেখানে পড়েছে ঠিক সেখানে পুঁতল। 'সুতো ছেড়ে দিয়ে নেমে আয় এবার,' বলল লেগ্রাণ্ড। উঠে দাঁড়ালাম আমি। এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। ও ততক্ষণে গভীর মনোযোগ দিয়ে গাছের গুঁড়িটা পরীক্ষা করছে। বেশ ভাল ভাবে কিছুক্ষণ দেখে আরেকটা খুঁটি বের করে গাছের গুঁড়ির যে অংশটা প্রথম খুঁটিটার সবচেয়ে কাছে সেখানে পুঁতে দিল শক্ত করে। এবারে পকেট থেকে বের করল একটা মাপার ফিতে। প্রথম খুঁটিটার গোড়ায় একটা মাথা রেখে বলল, 'শক্ত করে ধরে থাক। জুপ একটা লণ্ঠন আর কাস্তে নিয়ে আমার সাথে আয়।' এরপর ফিতে ছাড়তে ছাড়তে এমনভাবে এগোতে লাগল যেন প্রথম ও দ্বিতীয় খুঁটির সাথে একই সরলরেখায় থাকে সে। ওর সামনে চলল জুপিটার, ঝোপঝাড়গুলো পরিষ্কার করতে করতে।

'দশ, বিশ...' গুনতে গুনতে চলল ও, জুপিটারের দিকে পিছন ফিরে। 'পঞ্চাশ। থাম।' একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফিতেটাকে টানটান আর সোজা করে নিল ও। 'দেখো তো, ফিতেটা খুঁটি দুটোর ওপর দিয়ে এল কিনা?'

'একটু ডাইনে সরাও,' বললাম আমি। 'আরেকটু, আরেকটু..., ব্যস, থাম।' লেগ্রাণ্ড এবার গুঁড়ি থেকে ঠিক পঞ্চাশ ফুটের মাথায় তৃতীয় খুঁটিটা পুঁতল।

'পরিষ্কার কর এখানে, গোল করে,' জুপিটারকে হুকুম দিল ও।

'সারারাত কি খালি ঝোপঝাড়ই কাটব নাকি, স্যর?' জুপিটারের সরল প্রশ্ন। এক ধমকে থামিয়ে দিল লেগ্রাণ্ড, 'যা বলছি, তাই কর। একদম ফালতু কথা বলবি না।' ধমক খেয়ে হাসি চাপতে চাপতে ঝোপঝাড় পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাল জুপিটার। মোটামুটি বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করার পর ওকে থামতে বলল লেগ্রাণ্ড। তারপর মাপার ফিতের এক মাথা আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

'আগের মতই খুঁটিটার গোড়ায় শক্ত করে ধরে থাকো।' মাটি থেকে ছোট মতন শক্ত একটা গাছের ডাল নিয়ে ফিতেটার দু'ফুট লেখা যেখানে সেখানে শক্ত করে ধরল ও। ফিতেটা টানটান করে ডালটা মাটিতে শক্ত করে চেপে ধরে ঘুরতে শুরু করল। বৃত্তটা সম্পূর্ণ হতেই কোদাল দিয়ে দাগটা আরও স্পষ্ট করে তুলল। কোদালটা দিয়ে এবারে বৃত্তটার মধ্যে খুঁড়তে শুরু করল। মিনিট দশেক একটানা পরিশ্রম করার পর কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'এবারে তুমি শুরু কর,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। এ ধরনের পরিশ্রম, বিশেষ করে এরকম অর্থহীন পরিশ্রম আমার একদম পছন্দ নয়। প্রতিবাদ করব কিনা, ভাবলাম একবার কিন্তু ও যেমন ক্ষেপে আছে তাতে আমার মাথায় কোদাল দিয়ে ঘা মেরে দেয় কিনা, সন্দেহ হলো। ঝামেলা করে লাভ নেই, ভাবলাম আমি। নিঃশব্দে কোদালটা তুলে নিলাম হাতে। মিনিট দশেক পরেই জান বেরিয়ে যাবার দশা হলো আমার। শীতকাল বলে লোহার মত শক্ত মাটি। জুপিটারের হাতে কোদাল ছেড়ে দিয়ে আধ হাতখানেক জিভ বের করে হাঁপাতে লাগলাম। এদিকে আরেক ঝামেলা। জার্ডিনকেও বোধহয় সোনাপোকাটা কামড়েছে।

গর্ত খোঁড়ার শুরু থেকে সেই যে প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে; আর থামাথামি নেই। আর রাগ-রাগিণীর সে-কী বাহার। অসহ্য হয়ে উঠল চিৎকার। 'ব্যাটা বদমাইশ যেভাবে চিৎকার করতে লেগেছে তাতে কবর থেকে মড়া পর্যন্ত উঠে আসবে মনে হচ্ছে।' চিন্তিত, বিরক্ত মুখে বলল লেগ্রাণ্ড। 'তা হলে বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ হয়। এই ব্যাটা জুপ, থামা ওটাকে।'

কোদাল রেখে উঠে এল জুপিটার। এই শীতের মধ্যেও ঘেমে ভূত হয়ে গেছে। কোমর থেকে দড়ির বেল্টটা খুলে আস্তে আস্তে জার্ডিনের দিকে এগিয়ে যেতেই মতলব বুঝতে পেরে ভাগবার চেষ্টা করল ওটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল জুপিটার। পিছনের ঠ্যাংটা কোনওমতে চেপে ধরল। দড়িটা দিয়ে কষে মুখটা বেঁধে ছেড়ে দিল ওটাকে। এদিক ওদিক লাফিয়ে দড়িটা খোলার কসরৎ দেখাতে শুরু করল জার্ডিন। কোদালটা তুলে নিয়ে গর্তটার মধ্যে নেমে পড়ল লেগ্রাণ্ড। পালা করে আমি, লেগ্রাণ্ড আর জুপিটার মাটি খুঁড়ে চললাম। ফুট তিনেক মত গর্ত হতেই সুবিধার জন্যে গর্তের ব্যাস আরও খানিকটা বাড়িয়ে নিলাম। চার, সাড়ে চার ফিট গর্ত খোঁড়া যখন শেষ হলো তখন ঘড়ির কাঁটা নটার ঘর পেরিয়ে গেছে। কোদালটা বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে গর্ত থেকে উঠে এল লেগ্রাণ্ড। 'চলো, যাওয়া যাক্ এবার।' প্রায় কান্নার মত শোনাল ওর গলা। মাটি থেকে কোটটা তুলে নেবার সময় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনওরকমে সামলে নিল। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। জুপিটার কোদাল কাস্তেগুলো গুছিয়ে নিয়ে আগে আগে রওনা দিল। পিছনে লেগ্রাণ্ড, তার পিছনে আমি, আমার পিছনে জার্ডিন। একটু এগোতেই হঠাৎ করে লেগ্রাণ্ড বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল জুপিটারের ঘাড়ে। ধক্ করে উঠল বুকের ভিতরে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে ও। শ'তিনেক ডলার তো

যাবেই, বেশিও যেতে পারে, কিন্তু ওকে এখান থেকে নেব কী করে। মাথায় এক ঘা বসিয়ে দেব নাকি! আশপাশে তাকালাম—আঘাত করার জন্যে কিছু একটা দরকার। ততক্ষণে দেখি, জুপিটারের গলা চেপে ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে লেগ্রাণ্ড। ভয়ে চোখ ঠিকরে আসার অবস্থা হয়েছে জুপিটারের। দু'হাত নেড়ে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে, একটা শব্দও বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে। দাঁত কিড়মিড় করে বলল লেগ্রাণ্ড, 'শয়তানের বাচ্চা, বল তোর বাঁ চোখ কোন্‌টা?' শুধু হাঁ করল জুপিটার। গলা ছেড়ে দিয়ে ঝাঁকুনি লাগাল লেগ্রাণ্ড ওকে। 'ব-বলছি, স্যর। এই তো আমার বাঁ চোখ,' থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে ডান হাতটা দিয়ে ডান চোখটা দেখাল জুপিটার। 'ইয়া-হু!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল লেগ্রাণ্ড, 'চল্‌, চল পাজি, শিগ্‌গির চল্‌, কোদাল-টোদালগুলো ওঠা তাড়াতাড়ি।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'এসো তাড়াতাড়ি, আসল খেলা দেখাব এবার।' মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝলাম না। বোকার মত রওনা হলাম পিছু পিছু।

টিউলিপ গাছটার গোড়ায় পৌঁছালাম আবার। কাস্তে, কোদাল নামিয়ে রাখল জুপিটার। লেগ্রাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'খুলিটার মুখ নীচের দিকে ছিল না ওপরের দিকে ছিল?'

'ওপরের দিকে, স্যর।'

'ঠিক আছে, এবারে বল তোর বাঁ চোখ কোন্‌টা?'

'এইটা, স্যর,' ভয়ে ভয়ে ডান চোখ দেখাল জুপিটার।

'ব্যস, ব্যস, দিব্যি চলে যাবে ওতেই,' খুশি মনে বলল লেগ্রাণ্ড। পোকাটা ধরিয়ে দিল ওর হাতে। 'ওঠ, এবারে পোকাটা ডান চোখ দিয়ে নামাবি, বুঝেছিস? ভুল হলে এবার তোকে ওই গর্তটার মধ্যে চাপা দেব।'

কোনও কথা না বলে উঠতে শুরু করল জুপিটার, বেশ

কিছুক্ষণ পরে পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিক্‌মিক্‌ ঝিক্‌মিক্‌ করতে করতে নামতে শুরু করল পোকাটা। নামতে নামতে এক সময় মাটি ছুঁলো, আগের জায়গা থেকে ইঞ্চি তিনেক দূরে। খুঁটিটা কুড়িয়ে নিয়ে পুঁতে দিল ওখানে। তারপর হাঁক ছাড়ল ওপরের দিকে তাকিয়ে, 'সুতো ছেড়ে দিয়ে নেমে আয়।' আগের মতই ফিতে ধরলাম আমি। ফিতে ছাড়তে ছাড়তে পিছাতে শুরু করল লেগ্রাণ্ড। পঞ্চাশ ফুট গিয়ে থামল ও। ঝাঁকুনি দিয়ে ফিতেটা সোজা করে খুঁটি দুটো আগের মতই একটা সরলরেখায় নিয়ে এল। পঞ্চাশ ফুটের মাথায় তৃতীয় খুঁটিটা যেখানে পুঁতল, সে জায়গাটা আগের গর্তের থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আগের মতই ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে বৃত্ত আঁকল লেগ্রাণ্ড। তারপর কোদাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঘণ্টা দেড়েক ধরে পালা করে গর্ত করে গেলাম আমরা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জার্ডিন। কোন্ ফাঁকে মুখের বাঁধন খুলে ফেলেছে খেয়ালই করিনি। লাফ দিয়ে পড়ল গর্তের মধ্যে। পাগলের মত মাটি আঁচড়াতে লাগল নখ দিয়ে। খানিকটা মাটি সরাতেই ছেঁড়া একটা কাপড় বেরিয়ে এল, মরচে ধরা পেতলের বোতাম ঝুলছে তাতে। তারপই বেরোল একটা হাড়ের টুকরো। কুকুরটাকে কোদালের ঘা মেরে ভাগাল লেগ্রাণ্ড। কোদালের কয়েকটা কোপ মারতেই বেরিয়ে পড়ল দুটো খুলি। মানুষের। প্রচণ্ড উৎসাহে দুজন মিলে খোঁড়া শুরু করলাম এবার। এরপর বেরোল বড় একটা স্প্যানিস ছোরা আর গোটা কয়েক সোনার মুদ্রা। লেগ্রাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি হতাশায় কালো হয়ে উঠেছে মুখটা। তবুও ঝুঁকে পড়ে আবার খুঁড়তে শুরু করল ও। আমিও হাত লাগালাম। একটু পরে ঘুরে দাঁড়াতে যেতেই হুমড়ি খেয়ে

পড়লাম। একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম কোদালের নীচে পড়া থেকে। ওদিকে কোনও খেয়ালই নেই লেগ্রাণ্ডের। কোদাল নামিয়ে রেখে তাকিয়ে আছে আমার পায়ের দিকে। তাকিয়ে দেখি লোহার কড়া একটা। লাফ দিয়ে উঠলাম। পাগলের মত কোদাল চালালাম চারপাশে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল শক্ত কাঠের বিরাট একটা সিন্দুক। লম্বায় কমপক্ষে সাড়ে তিন ফুট, তিন ফুট চওড়া আর আড়াই ফুট উঁচু। ধারগুলো লোহার পাত দিয়ে মোড়ানো। দুটো মস্ত বড় তালা ঝুলছে ওটাতে। দু'পাশে চারটে করে আটটা লোহার কড়া লাগানো। কড়াগুলো ধরে প্রাণপণে টান লাগালাম দু'জন। গর্তের মধ্যে লাফ দিয়ে নেমে হাত লাগাল জুপিটার। এক চুল নড়ল না বাক্সটা। 'এভাবে হবে না, তালা ভাঙতে হবে,' বলল লেগ্রাণ্ড। 'কুড়াল হলে সবচেয়ে ভাল হত, এখন কোদাল ছাড়া গতি নেই'। কোদালের উল্টো দিকে দিয়ে কষে বাড়ি লাগাল তালাটার গায়ে।'

প্রাণপণে ঘা মারল জুপিটার। গোটা ছ'য়েক ঘা মারতেই হার মানল তালা। অন্য তালাটাও একই ভাবে খুলে ফেলল জুপিটার। কড়া থেকে দূরে ছুঁড়ে মারল বাইরে। নীচু হয়ে কড়া দুটো ধরল লেগ্রাণ্ড। মুখটা ফ্যাকাসে, হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। এক ঝটকায় খুলে ফেলল ডালাটা। ম্লান হয়ে গেল বাকি সব।

একশ'টা সূর্য যেন জ্বলে উঠল এক সাথে। ধাঁধিয়ে গেল চোখ। এ-কী সত্যি নাকি স্বপ্ন! এ-যে কুবেরের ঐশ্বর্য। অবাস্তব মনে হলো সবকিছু। লক্ষ লক্ষ সোনার মুদ্রা, গহনা আর শত শত হীরে চাঁদের আলোয় ঝকমকিয়ে উঠল। মনে হলো আগুন লেগেছে বুঝি ওখানে।

কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, জার্ডিনের ডাকে হুঁশ

ফিরল। লেগ্রাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি ঠোঁটটা কাঁপছে থরথর করে, চিক্‌চিক্‌ করছে চোখের কোণ। জুপিটার দু'হাত বুকের কাছে জড়ো করে ওপরের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। পুরোপুরি বাস্তবে ফিরে এলাম সবার আগে। লেগ্রাণ্ডের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি লাগালাম, শূন্য দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল আমার দিকে। ভয় পেয়ে গেলাম। আরও জোরে ঝাঁকুনি লাগালাম, এবারে সংবিৎ ফিরল। একটু লজ্জিত হাসল। জুপিটারের দিকে তাকিয়ে দেখি একই ভাবে বসে আছে ও। লেগ্রাণ্ড ওর হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিতেই হুঁশ হলো ওর।

'এগুলো এবারে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হয়। সময় বেশি নেই।' আমিই প্রথম কথা বললাম। 'কীভাবে নেবে?'

চিন্তায় পড়ে গেল লেগ্রাণ্ড। 'আসলে এমন ভারি জিনিস হবে ভাবিনি। আর, তাড়াহুড়োতে বস্তা বা দড়িও আনা হয়নি। কী যে করি। ঠিক আছে, আগে বাক্সটা ওপরে তোলার ব্যবস্থা করি।' বাক্স থেকে ধনরত্ন বের করে গর্তের পাশে জমা করতে শুরু করল লেগ্রাণ্ড। হাত লাগালাম আমিও। বেশ খানিকটা করে নামাই আর ঝাঁকুনি দিয়ে দেখি বাক্সটা ওঠানোর মত ওজনে এল কিনা। প্রায় অর্ধেকের মত নামানোর পর তুলতে পারলাম ওটাকে।

লেগ্রাণ্ড বলল, 'যতটুকু পারি সাথে নিয়ে যাই, বাদবাকি জার্ডিন পাহারা দিতে থাক। বাড়ি থেকে বস্তা আর যা যা লাগে নিয়ে এসে ওগুলো নিয়ে যাব। এ ছাড়া আর করারও কিছু দেখছি না।' বাক্স থেকে আরও কিছু সোনাদানা নামিয়ে দু'জনে বইবার মত জিনিসপত্র রাখলাম। নামিয়ে রাখা ধনরত্নগুলোকে লতা পাতা দিয়ে ঢেকে দিলাম। লেগ্রাণ্ড ওর সোয়েটার আর মাফলারটা খুলে ফেলে দুটো বিড়ে মত বানিয়ে ফেলল। তিনজনে মিলে ধরাধরি

করে বাক্সটা উঠালাম। ওরা বাক্সটা একটু উঁচু করতেই আমি বিড়ে দুটো দুজনের মাথায় জায়গামত বসিয়ে দিলাম। জার্ডিনকে পাহারায় রেখে ফিরে চললাম আমরা। সামনে লণ্ঠন নিয়ে আমি, পিছনে ওরা দুজন। পালা করে বাক্সটা বয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে আমাদের। গ্রোগ্রাসে গিললাম হাতের কাছে যা পেলাম। জুপিটার কফি বানিয়ে নিয়ে এল এরই মধ্যে। একটু যেন জোর ফিরে এল পায়ে। বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ার ইচ্ছেটা অতি কষ্টে দূর করতে হলো। গোটা তিনেক বস্তা আর দড়ি নিয়ে আবার রওনা দিলাম। বাকি জিনিসগুলো তিনটে বস্তায় ভরে যখন কুটিরে পৌঁছালাম কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ভোরের আলো তখন চুইয়ে আসতে শুরু করেছে। দরজাটা বন্ধ করেছে জুপিটার, শুধু এটুকুই মনে আছে, তারপর কীভাবে যে জামা জুতো খুলেছি, বিছানা পর্যন্ত গিয়েছি কিচ্ছু মনে নেই। মড়ার মত ঘুমালাম দুপুর পর্যন্ত। লেগ্রাণ্ডের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল। দেখি ও উঠে এর মধ্যেই জুপিটারকে রান্নায় বসিয়ে দিয়েছে। গোসল করে পোশাক পাল্টে খেতে বসে গেলাম। রাক্ষসের মত গিললাম যা পড়ল পাতে। সবশেষে এককাপ কড়া কফি খাবার পর অনেকটা ঝরঝরে লাগল। ভাল করে দরজা-জানালা বন্ধ করে জোরালো আলো জ্বালিয়ে দিলাম ঘরের মধ্যে তারপর তিনজনে বসলাম গতরাতের সঞ্চয় পরীক্ষা করতে। পরীক্ষা করব কী, নেড়েচেড়ে দেখতেই আনন্দে আটখানা হয়ে ওঠে লেগ্রাণ্ড আর জুপিটার। হাত ঢুকিয়ে তুলে নেয় কিছু মুদ্রা, ওপর থেকে ঝন্‌ঝন্‌ করে ছেড়ে দেয় আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দু'জন। কষে ধমক লাগালাম। এবারে কাজে লাগল দু'জনই। সমস্ত জিনিসগুলোকে ভাগ করতে শুরু করলাম। স্বর্ণমুদ্রা, গহনাপত্র, বাসন-কোসন, দামী পাথর, ঘড়ি সব আলাদা

আলাদা করে ফেললাম। কোনও রুপোর লেশমাত্র নেই ওগুলোর মধ্যে। প্রথমে ধরলাম স্বর্ণমুদ্রা। ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান, ইটালিয়ান, পর্তুগীজ সব দেশের স্বর্ণমুদ্রাই আছে। নানা ওজনের, নানা মাপের। কতগুলো দেখে চিনতেই পারলাম না ওগুলো কোন্ দেশের। মুদ্রাগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য বাদই দিলাম, খুব কম করে ধরেও ওগুলোর দাম দাঁড়াল প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ডলার। হীরে পাওয়া গেল এক শ' দশটা। প্রত্যেকটাই বড়সড়, গোটা বারো অস্বাভাবিক রকমের বড়। আঠারোটা উজ্জ্বল চুনি, পান্না তিন শ' দশটা, একুশটা নীলা আর একটা ওপাল। এর বেশির ভাগই গহনা থেকে খুলে নেয়া। গহনাগুলো ঘা মেরে ওগুলোকে চেনার অবস্থায় রাখা হয়নি। জড়োয়ার অলঙ্কার আর পাকা সোনার গহনা গোণার চেষ্টা করলাম বারদুয়েক। 'দুত্তোর', বলে সরে এল লেগ্রাণ্ড ওখান থেকে। 'ওগুলো গুনে শেষ করা যাবে না, অমনি থাক ওগুলো।' দুল পেলাম দুশ'টা, হার তিরিশটা, সোনার ওপর কারুকাজ করা বাতিদান পাঁচটা, সোনার ওপর চুনি বসানো পান পাত্র দুটো, এক শ' সাতানব্বইটা সোনার ঘড়ি, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সোনার মূর্তি তিরাশিটা আর সোনার বাঁটের ওপরে পান্না বসানো দুটো তলোয়ার। সব মিলিয়ে ওজন প্রায় সাড়ে তিন শ' পাউণ্ড। হিসাব করতে গিয়ে মাথা খারাপ হবার দশা হলো আমাদের। অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু জিনিষের দাম ধরে যে হিসাব পেলাম তাতে চোখ উল্টে গেল আমাদের। খুব কম করে ধরেও প্রায় পনেরো লক্ষ ডলার। পরে অবশ্য বিক্রী করতে গিয়ে বুঝেছিলাম, চোখ উল্টানোর আরও কিছু বাকি ছিল আমাদের।

সমস্ত হিসাব নিকাশ শেষ করে বাক্স বন্ধ করে যখন উঠলাম রাত তখন শেষের দিকে। কফি বানিয়ে নিয়ে এল জুপিটার।

চেয়ারটাকে ফায়ার প্লেসের যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে গিয়ে বসলাম। আয়েশ করে চুমুক লাগালাম কফিতে।

'এবারে ঝুলি থেকে বেড়ালটা বের করো দেখি,' বললাম লেগ্রাণ্ডকে। 'তোমার সোনাপোকা কী করে সোনার সন্ধান নিয়ে এল।' চোখ বুজে মিটিমিটি করে হাসতে লাগল লেগ্রাণ্ড আর আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগল। কপি শেষ করে ঠিক করে রাখলাম কাপটা। এবারে চোখ খুলল লেগ্রাণ্ড। এক চুমুকে বাকি কফিটুকু শেষ করে কাপটা রেখে দিল পাশে। 'ঘটনাটা,' শুরু করল লেগ্রাণ্ড, 'খুব সাধারণ। সে রাতের কথা আশা করি মনে আছে তোমার, যেদিন সোনা পোকাটার ছবি এঁকে দেখালাম তোমাকে। তুমি অবশ্য দেখে বলেছিলে মড়ার মাথা এঁকেছি। এবং আশা করি এখন অস্বীকার করবে না যে বেশ একটু বিদ্রূপই করেছিলে আমার আঁকা নিয়ে, সুতরাং আমার মেজাজটাও একটু গরম ছিল। যাহোক বিরক্ত হয়ে আগুনে ফেলে দিতে গিয়েছিলাম কাগজটা। ফেলে দিতে গিয়েও কী মনে করে তাকালাম, দেখি স্পষ্ট মড়ার খুলি আঁকা ওর মধ্যে। হাঁ হয়ে গেলাম। কোত্থেকে এল ওটা? কাগজটা উল্টে দেখি অন্যদিকে পোকাটা ঠিকই আছে। একই রকম দেখতে প্রায়, কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটা এল কীভাবে? ছবি আঁকার আগে ভাল করে উল্টেপাল্টে পরিষ্কার জায়গা খুঁজেছিলাম। ছবিটা যে আগে ওখানে ছিল না তা বাজি রেখে বলতে পারি। সুতরাং প্রশ্ন হলো ছবিটা এল কীভাবে? ভূত নাকি? মাথা গরম হয়ে গেল আমার। অন্য কোনও দিকে মন দেবার অবস্থাও রইল না। রকমসকম দেখে তুমিও চলে গেলে। ভালই হলো। তুমি যাবার পরে ভাল করে পরীক্ষা করলাম কাগজটা। দেখি ওটা আসলে একটা পার্চমেন্ট-এর টুকরো। কোথায় পেলাম, কোথায় পেলাম ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মনে পড়ল কোথায় পেয়েছি।

সমুদ্রের ধারে, মেইন ল্যাণ্ডে। জায়গাটা এখান থেকে মাইল চারেক হবে। সোনা পোকাটাকেও ওখানে পাই। পোকাটা দেখামাত্র যেই ধরতে গেছি, রাম কামড় বসিয়ে দিল হাতে। উহ্ করে তো ফেলে দিলাম পোকাটাকে, দেখি রওনা দিয়েছেন ভদ্রলোক। জুপকে বললাম তাড়াতাড়ি ধরতে। ও ব্যাটা ভীতুর ডিম, খালি হাতে ধরবেই না। আশপাশে তাকিয়ে ধরার মত কিছু একটা খুঁজল। চারপাশে ভাঙা জাহাজের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তারমধ্যে চোখ পড়ল ওই পার্চমেন্টটার ওপরে। একটা কোণা বেরিয়ে ছিল বালির বাইরে। ওটা বের করে পোকাটা ধরল জুপ। ফিরছি, রাস্তায় লেফটেন্যাণ্ট-এর সঙ্গে দেখা। দেখালাম ওকে, দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ। বলল বাসায় নিয়ে যাবে একদিনের জন্যে, বউ ছেলে মেয়েকে দেখাবে। দিলাম ওর পকেটে চালান করে। তখনই হয়তো আনমনে পার্চমেন্টটা রেখে দিয়েছিলাম পকেটে। তারপর সেদিন পোকার ছবিটা আঁকবার সময় ওটা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। সুতরাং যখনি বের করতে পারলাম ওটা কোথায় পেয়েছি, সাথে সাথে জাহাজের ভাঙা টুকরোগুলোর কথা মনে ভেসে উঠল। আর তারপরই বিদ্যুৎ চমকের মত মাথায় এল, লোকে পার্চমেন্ট কাগজ ব্যবহার করে স্থায়ী কিছু লেখার জন্যে, ধরো দলিল বা নকশা। সুতরাং মড়ার খুলি আঁকা কাগজটা নিশ্চয়ই কোনও জলদস্যুর আঁকা নকশা জাতীয় কিছু হবে। উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ঘুম হারাম হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে বসলাম। প্রথমেই প্রশ্ন হলো ছবিটা এল কী করে? আমি আঁকিনি, তুমি আঁকোনি, জুপের তো প্রশ্নই ওঠে না, তা হলে কে? আর ঘটনাটা ঘটেছে কাগজটা আমার হাত থেকে তোমার হাতে যাবার সময়টুকুর মধ্যে। একবার মনে হলো কোনও প্রেতাত্মার কাজ নয়তো? ধারণাটাকে অবশ্য হেসে উড়িয়ে

দিলাম তক্ষুণি। খুব ভালভাবে মনে করতে লাগলাম তখনকার ঘটনাগুলো। বাইরে ঠাণ্ডা, ঘরে আগুন জ্বলছে। আমি বিছানার কাছে, তুমি ফায়ার প্লেসের কাছে, জুপ ওই কোণাটায়। তারপর কাগজটা আমি তোমার হাতে দিলাম, তুমি যখনই দেখতে গেলে তখনই ঘরে ঢুকল জার্ডিন, লাফ দিয়ে উঠল তোমার ঘাড়ে। তুমি বাঁ হাত দিয়ে ওর পিঠে আদর করতে লাগলে। ওর আদরের চোটে হেলে গেছ ডানদিকে, আর ডান হাতটা সরে গেছে আগুনের দিকে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠছিলাম, "কাগজটা পুড়ে যাবে" বলে, তখনি তুমি হাতটা টেনে নিলে বাইরে। তারপরই তো বিদ্রূপ শুরু করল আমার আঁকা নিয়ে। সুতরাং আমার ধারণা হলো, ছবিটা আগে থেকেই ছিল, এখন আগুনের আঁচে ফুটে উঠেছে। এমন লেখার কথা তো শুনেছই অনেক। রাস্তায় লটারি করে দিল্লীকা-লাড্ডু বা স্নো পাউডারের; দেখেছই তো, পানির মধ্যে ফেলে দিলে লেখা ফুটে ওঠে, অনেকটা ওইরকম। ছবিটা ভাল করে লক্ষ্য করেছিলাম তখনই। ধারের দিকে যত স্পষ্ট ছিল মাঝের দিকে ততটা নয়। তখনই কাগজটা আবার দেখলাম ভাল করে। দেখি অনেকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ছবিটা, কোনও সন্দেহ রইল না আর। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারপ্লেসের কাছে উঠে গেলাম। ভাল করে গরম করলাম কাগজটাকে। স্পষ্ট ফুটে উঠল খুলির ছবি, খুলির বেশ নীচে, ডান দিকে একটা ছাগল ছানার ছবি।'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলাম ওর কথা শুনে। বললাম, 'ব্যা ব্যা করছিল বুঝি। তা ওই ছাগলের বদৌলতেই এত কিছু?'

লেগ্রাণ্ড হাসল না একটুও। বলল, 'ছাগল নয়, ছাগলের বাচ্চা।'

বললাম, 'কেন, ছাগলের বাচ্চা কী ছাগল না?'

'সব সময় নয়।'

'কী রকম?'

'আগে শোনো, তারপর বোঝ। কাগজটার ওপরে খুলির ছবি, নীচে ডানপাশে ছাগলছানার ছবি, ঠিক যেন মনোগ্রাম করা কাগজে কিছু লিখে সই করা। সই-এর জায়গাটাতেই ওই ছাগলছানার ছবি। নিশ্চয়ই এমন কারও সই যার নাম ওই ছাগলছানার সাথে জড়িত। কী হতে পারে, কী হতে পারে ভাবতেই মনে পড়ল ছাগলছানার ইংরেজি হলো কিড আর তক্ষুণি বুঝলাম এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন কিডের নকশা। এক লাফে ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছে হলো খুশিতে। ক্যাপ্টেন কিড আর তার গুপ্তধনের কথা কে না জানে। কথাটা কিংবদন্তীর মত। কত শত বছর ধরে সে চলে আসছে তার ঠিক নেই। আমি শুনেছি আমার বাবার কাছে, বাবা শুনেছেন দাদার কাছে। ধারণা করা হয় আটলান্টিকের ধারে কাছে কোথাও আছে এই অসীম সম্পদ। অনেকে হয়তো খোঁজ করে পায়নি, ফলে ছড়িয়ে পড়েছে কথাটা। আর যেহেতু কেউ পেয়ে গেছে এমন কথা শুনিনি কখনও, তাই ধরে নিলাম গুপ্তধন এখনও গুপ্তই আছে, কেবল মাথা খেলিয়ে বের করার অপেক্ষা। সুতরাং কাজে নেমে পড়লাম।'

এতক্ষণে একটু ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু শুধু মড়ার মাথা আর ছাগলের মাথা নিয়ে কী খেললে সেটা তো আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'ঢুকবে বৎস, ঢুকবে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। পার্চমেন্টটাকে আবার গরম করলাম কিন্তু খুলি আর ছাগলছানার মধ্যে কোনও লেখা ফুটল না। চিন্তা করলাম নিশ্চয়ই লেখাটার ওপর ময়লা জমেছে। পানি গরম করলাম তক্ষুণি। গরম পানি দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলাম কাগজটা, তারপর পানির মধ্যেই ছেড়ে দিলাম ওটাকে। পানি ফুটতে শুরু করতেই নামিয়ে নিলাম কাগজটা। এর ফল যা

হলো, দাঁড়াও, দেখাই তোমাকে।'

একটা বাক্সের তালা খুলে ভেতর থেকে একটা ডাইরী বের করল লেগ্রাণ্ড। ওর মধ্যে থেকে ছোট্ট কাগজের টুকরোটা বের করে ফায়ারপ্লেসের মধ্যে ধরল ও। আস্তে আস্তে ছবি ফুটে উঠল উপরে, মাঝখানে মড়ার মাথার খুলি, নীচে, ডান দিকে ছাগলছানার ছবি আর মাঝখানে হিজিবিজিতে ঠাসা।

'দাঁড়াও, মাঝখানের লেখাগুলো তোমাকে দেখাই। লিখে রেখেছি খাতায়।'

ডাইরিটা খুলে লেখাটা বের করে আমার হাতে দিল লেগ্রাণ্ড। দেখলাম ইংরেজি সংখ্যা আর চিহ্ন দিয়ে লেখা–

53++†305)) 6*; 4826) 4+.) 4+); 806* 48†
8760)) 85;1 + (; + * 8 † 83 (88) 5 * †; 46 (
88 * 96 * ? ; 8) * + (; 485) ; 5 * † 2 * + (;
4956*2 (5 * —4) 878 * ; 4069285) ; (6†8) 4++
; 1 (+ 9 48081 ; 8 8+ 1 ; 48 † 85; 4) 485 †
528806 * 81 (+ 9 48 ; (88 4 (+ ? 34 ; 48) 4±
161; 188; ± ?

দেখাই সার। মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝলাম না। লেগ্রাণ্ডের হাতে ডাইরিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললাম, এর মধ্যে যদি বাদশা সোলায়মানের রত্নভাণ্ডারের কথাও লেখা থাকে, আমার সাধ্য কি এর মানে বের করি।'

মিটিমিটি হাসতে লাগল লেগ্রাণ্ড।

'তা হলেই ভেবে দেখো দুজনের মগজে কত তফাৎ,' মাথার পাশে আস্তে দুটো টোকা মেরে বলল ও।

'তা বের করলে কেমন করে সেটাই বলো দেখি,' একটু ঝাঁঝের সাথে বললাম।

লেগ্রাণ্ড বলল, 'যতটা কঠিন মনে হচ্ছে দেখে, আসলে কিন্তু তা নয়। সংখ্যা আর চিহ্ন দিয়ে এমন ভাবে ধাঁধা তৈরি করা হয়েছে যে দেখলে মনে হবে এর মাথামুণ্ডু কিচ্ছু নেই। ক্যাপ্টেন কিড যেহেতু জলদস্যু ছিল সুতরাং ধরে নিলাম অন্য বিষয়ে যত জ্ঞানই থাক অত্যন্ত জটিল কোনও সংকেত সম্ভবত সে তৈরি করতে পারবে না। সুতরাং মনকে বোঝালাম সমস্যাটা জটিল নয়। এখন প্রথমে বের করতে হবে সঙ্কেতটা কোন্ ভাষায় লেখা। যদি কোনওদিন কোনও সঙ্কেতের পাঠোদ্ধার করতে যাও, প্রথমে দেখবে, যে সংকেত বানিয়েছে সে কোন্ কোন্ ভাষা জানত। সে ভাষাগুলোর প্রত্যেকটা দিয়ে চেষ্টা করবে সবার আগে, তাতে কাজ না হলে তুমি নিজে যে ক'টা ভাষা জানো, ব্যবহার করবে। আমার জন্যে কাজটা খুবই সোজা হলো কারণ, ক্যাপ্টেন কিড নাম লিখতে ব্যবহার করেছে ইংরেজি, সুতরাং ধরেই নেয়া যায় যে, সে পুরো জিনিসটাই ইংরেজিতে লিখেছে। এখন বের করতে হবে লেখাগুলো। খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই, কোনওরকম ফাঁক-ফোকর নেই সংকেতটার মধ্যে। কোন্ শব্দের কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই, সুতরাং এক গোছা চিহ্নকে একটা শব্দ ধরে তারপর সেটা থেকে প্রতিটা অক্ষরের জন্যে ব্যবহার করা চিহ্ন বের করে বাকি লেখাগুলোর সমাধান করবে সে উপায় নেই। তাই অন্যভাবে এগুলাম আমি। প্রথমেই একটা তালিকা বানালাম, কোন্ চিহ্ন কতবার ব্যবহার হয়েছে তালিকাটা দেখো।'

লেগ্রাণ্ড ডাইরী খুলে একটা তালিকা বের করল।

দেখলাম তালিকাটা—

যে সংখ্যা বা চিহ্ন যতবার ব্যবহার হয়েছে:

8	৩৩ বার
	২৬

4	১৯
†	১৬
)	১৬
*	১৩
5	১২
6	১১
(	১০
†	৮
।	৮
0	৬
9	৫
2	৫
	৪
3	৪
?	৩
7	২
	১
—	১

'তুমি তো লেখো, বলো দেখি ইংরেজি ভাষায় কোন্ অক্ষরটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়?' তালিকাটা দেখা শেষ হতেই জিজ্ঞেস করল লেগ্রাণ্ড।'

বললাম, 'e'।

তারপর?'

'a'।

'তারপর?'

'o'।

'তারপর?'

'জানি না।'

'জানি না বলে কোনও অক্ষর অবশ্য ইংরেজি ভাষায় নেই। যাকগে, তারপর হলো i, তারপর হলো d, এভাবেই আসে h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x এবং সবশেষে z । তাই যখন দেখলাম সঙ্কেতটার মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহার হয়েছে o তখন ধরে নিলাম ওটা e। ইংরেজি অনেক শব্দ আছে যার মধ্যে পাশাপাশি দুটো e আছে। এখানেও দেখলাম পাশাপাশি দুটো 8 আছে, পাঁচবার। এরপর এসো ইংরেজি বাক্যে। ইংরেজি বাক্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় the, এ একেবারে ট্রেনের কামরায় ফেরিওয়ালার মত, বাক্যের মধ্যে কোথাও না কোথাও থাকবেই থাকবে। সুতরাং খুঁজলাম তিনটে পাশাপাশি চিহ্ন বা সংখ্যা যার শেষটা হবে 8 দিয়ে। পেলাম 48। মোট সাতবার। ধরলাম; হলো t, 4 হলো h আর 8 তো e হিসাবে আছেই। সঙ্কেতটার মধ্যে বসিয়ে ফেললাম অক্ষরগুলো। দেখো, এই যে পরের পৃষ্ঠায়। এবারে শেষের থেকে চব্বিশটা অক্ষর, চিহ্ন আর সংখ্যা ছেড়ে এসো। কী পাচ্ছ? পাচ্ছ the-এর পরে ; (88; 4 অর্থাৎ t (eeth)। এখন তা হলে বের করতে হবে (চিহ্নটার মানে। যতদূর জানি শেষে th দিয়ে ছয় অক্ষরের কোনও ইংরেজি শব্দ নেই। সুতরাং শেষে একটি বা দুটি অক্ষর নিশ্চয়ই অন্য শব্দের গোড়া। এখন (চিহ্নটার জন্যে প্রথমে ধরো a। তা হলে দাঁড়াল taeeth। কোনও মানে হয় না। যদি ধরো taee বা taeet তাও কোন মানে হয় না। ধরো b । তাতেও লাভ হলো না। এভাবে c, b, e ধরে এগোতে থাক। r বসালে পাবে treeth। পাওয়া গেল মানে। tree এবং th। সুতরাং; (মানে r এবং th পরের শব্দের গোড়া। এবারে ধরো পরের শব্দ।

।।।।। । ' । ।। । বলো দেখি এবারে সাত অক্ষরের একটা "ইংরেজি শব্দ যার শুরু thr দিয়ে এবং শেষ h দিয়ে?"' '

বললাম; 'পারব না।'

চেষ্টা করো।

'বললাম তো বাবা পারব না।'

'থ্রু (through)। একটু চিন্তা করলেই পারতে। লেখার অভ্যাস করতে গিয়ে চিন্তা করার অভ্যাস অবশ্য তোমার গেছে। সে যাই হোক, তা হলে দাঁড়াল † মানে o,? মানে u, আর 3, মানে h। এখন পরপর চারটে শব্দ পাওয়া গেল, the tree through the। সঙ্কেতটার মধ্যে এবার o, u এবং g বসিয়ে ফেললাম। পৃষ্ঠাটা উল্টাও। তাতে চেহারাটা কেমন দাঁড়াল দেখতেই পাচ্ছ। এখন প্রথম থেকে একান্নটা চিহ্ন বাদ দিয়ে এসো। পাবে †egree) । একটুখানি চেনা চেনা শব্দ মনে হচ্ছে না? প্রথমে ধরেছিলাম †e-টুকু আগের শব্দের শেষ অংশ। বাকিটা green অর্থাৎ) মানে n । কিন্তু তা হলে সঙ্কেতটার শেষের দিকে through the-এর পরে দাঁড়ায় nhot 161। কিন্তু nh দিয়ে কোনও শব্দ শুরু হয় না সুতরাং) মানে n নয়। k বসালে হয় Greek কিন্তু একই সমস্যা, khot দিয়ে শুরু কোনও শব্দ নেই। সুতরাং k-ও নয়। একই কারণে d বা t হতে পারে না। তাই শুরু করলাম সামনে থেকে। † এর বদলে a, b, c দিয়ে দেখতে লাগলাম। d বসাতেই পেলাম degree। মনে পড়ল ক্যাপ্টেন কিডের কথা। যেহেতু নাবিক ছিল লোকটা, degree লেখার সম্ভাবনা খুব বেশি। ধরলাম † মানে d। এবারে † অর্থ d ধরে পঞ্চম চিহ্ন বসাও। পাওয়া গেল good। সুতরাং † মানে d-ই। আর তা হলে good-এর আগে 5 রইল শুধু। এক অক্ষরের শব্দ ইংরেজিতে একটাই আছে, a। সুতরাং 5 হলো

a। এবারে সঙ্কেতটার চেহারা। দাঁড়াল এমন–'

একটা পৃষ্ঠা উল্টে দিল লেগ্রাণ্ড। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার শুরু করল, 'শেষের দিক থেকে পঞ্চান্ন নম্বর থেকে শুরু করো এবার, পাওয়া গেল death) heada2ee06*e 10r9। head একটা আস্ত শব্দ সুতরাং ওর পরের a টা হয় একটি অর্থে ব্যবহার হচ্ছে নয়তো পরের শব্দের প্রথম অক্ষর। এখন death এবং head-এর মাঝখানে ওই a, b, c, d করে বসিয়ে যাও। অর্থ পাবে s বসালে। সুতরাং) মানে s। s বসতে প্রথম থেকে তৃতীয় শব্দ দাঁড়াল g0ass6* the। একইভাবে চেষ্টা করে বেরোল 0-এর জায়গায় বসানো যায় e অথবা r। কিন্তু r বসাল আগে পিছে শব্দের সাথে কোনও সম্পর্ক থাকে না, সুতরাং 0 অর্থ l-ই হবে। তা হলে দাঁড়াল A good glass 6* the। সুতরাং 6* একটা আলাদা শব্দ। এখন দেখো s বসানোর পরে একটা জায়গাতে পাচ্ছ orth east, আরেক জায়গাতে শুধু east। এখন degree পেলে, একটা দিক পেলে, স্বভাবতই মনে হবে অন্যান্য দিকের কথা। পাওয়া গেল north। সুতরাং যদি ধরি * অর্থ n তা হলে degrees-এর আগে রইল one, পরে রইল and, north-east এবং north-এর মাঝে and 2:। সুতরাং * যে n তাতে কোনও সন্দেহই রইল না। এখন glass আর the-এর মাঝখানে রইল 6n। চারটে মাত্র শব্দ হতে পারে এখন, an, in, on এবং un। ব্যাকরণগত শুদ্ধ হবে in অথবা on বসালে। সুতরাং 6 অর্থ i অথবা o। এখানে i-ই হবে কারণ thorteen-এর কোনও অর্থ হয় না। এখন thirteen এবং north- east শব্দ দুটোর মাঝখানের শব্দটা minutes ছাড়া কিছু হতে পারে না, তা হলে দাঁড়াল 9 অর্থ m। একই ভাবে line এবং the tree শব্দ দুটোর মাঝের শব্দটা

দাঁড়াল from। পেলাম l অর্থ f। f বসিয়ে শেষের দিকের শব্দে এর জায়গায় পাই y। এখন and এবং north-এর মধ্যে থাকল 2y। 2-এর জায়গাতে b বসালে হলো by। এখন বাকি থাকল bishos hostel, de7ilsseat, bran—h এবং se7enth। শেষের শব্দটা দেখে এক নজরেই বলতে পারবে ওটা হবে seventh। সুতরাং আরেকটা শব্দ হবে devilsseat। বাকি থাকল bran—h। c বসালেই হলো branch। এখন বাকি শুধু । bishops hostel-এরই অর্থ হয় শুধুমাত্র। সুতরাং খেল খতম। তা হলে দাঁড়াল–

a=5 m=9
b=2 n=*
c= — o=+
d=† p=
e=8 r= (
f=l s=)
9=3 t= ;
h=4 u=?
i=6 v=7
I=o y=

এবার অক্ষরগুলো বসালে পাবে–

A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat forty-one degrees and thirteen minutes north-east and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out.

তা হলে মানেটা দাঁড়াল–

'বিশপের হোস্টেলে ডেভিলের চেয়ারে একটা ভাল দূরবীন একচল্লিশ ডিগ্রী তেরো মিনিট উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর প্রধান ডালের পূর্ব দিকের সপ্তম শাখা মড়ার মাথার বাঁ চোখ দিয়ে ঝুলানো কার্তুজ গাছের সবচেয়ে কাছ থেকে কার্তুজ ছোঁয়া বিন্দু দিয়ে পঞ্চাশ ফিট দূরে।'

বললাম, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এখনও তো এর মাথা-মুণ্ডু বুঝছি না কিছু। বিশপের হোস্টেলে থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে দেখে ওখানে আস্তানা গাড়লে, আর শয়তানও না হয় তোমাকে দেখে সসম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু দূরবীন, মড়ার মাথা, কার্তুজ ঝুলানো, এগুলো কী? আর বিশপের হোস্টেলটাই বা কোথায়?'

লেগ্রাণ্ড বলল, 'তা হলে তো দেখছি সবই বুঝে গেছ। আর সামান্য একটু বাকি। আসলে সঙ্কেতটা শব্দে লিখবার পরও যাতে জটিল থাকে সেজন্য যে সঙ্কেতটা বানিয়েছে সে ইচ্ছে করেই দাঁড়ি-কমা কিছু রাখেনি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখবে ব্যাপারটা পানির মত সোজা।'

বললাম, 'তোমার কাছে হয়তো তাই।'

অনাবিল একটা 'আপনাদের দোয়ায়' জাতীয় হাসি দিল লেগ্রাণ্ড। বলল, 'ঠিকমত দাঁড়ি-কমা বসানোর পর ব্যাপারটা দাঁড়াবে যে প্রথমে বিশপের হোস্টেল নামে একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, তারপর বের করতে হবে সেখানে ডেভিলের চেয়ার নামে বসার মত কোনও কিছু আছে কিনা। সেই চেয়ারটা পাওয়া গেলে সেটাতে বসে মাথা ঘোরাতে হবে উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর দিকে। মোটামুটি একচল্লিশ ডিগ্রী তেরো মিনিট ঘোরানোর পর একটা শক্তিশালী দূরবীন লাগাতে হবে চোখে। তাতে বিশেষ

কোনও একটা গাছ চোখে পড়বে যার প্রধান ডালের পূর্ব দিকের সপ্তম শাখায় থাকবে একটা মড়ার খুলি। সেই খুলির বাঁ চোখের গর্ত দিয়ে একটা কার্তুজ সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হবে নীচে। কার্তুজটা যেখানে মাটি স্পর্শ করবে সেখান থেকে গাছের গুঁড়ির যে অংশটা সবচেয়ে কাছে সেই অংশটা বের করতে হবে। এবার গাছের গুঁড়িটার ওই বিন্দু থেকে কার্তুজটা যেখানে মাটি ছুঁয়েছে সেই বিন্দু দিয়ে পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা সরলরেখা টানলে রেখাটা যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেখানে মাটি খুঁড়লেই কেল্লা ফতে।

'এবার তো প্রায় সবই বুঝলাম,' বললাম আমি, 'কিন্তু বিশপের হোস্টেল, ডেভিলের চেয়ার এগুলো পেলে কোথায়?'

'ওটাই তো আসল প্রশ্ন ছিল আমার কাছে। ক'দিন তো শূন্যে ভাসছিলাম শুধু, সুলিভ্যান দ্বীপ চষে ফেলেছি বিশপের হোস্টেল, বিশপের বাড়ি বা বিশপের যে কোনও কিছুর খোঁজ কেউ দিতে পারে কিনা। কেউ শোনেইনি এমন কিছুর কথা। শেষে একদিন হঠাৎ মনে পড়ল দ্বীপের মাইল চারেক উত্তরে বেসপ বলে অনেক পুরানো এক জমিদার পরিবারের একটা বাড়ি আছে বলে শুনেছিলাম। রওনা দিলাম তক্ষুণি।

'পৌঁছে অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক বুড়িকে পেলাম। তার কাছে শুনলাম বেসপের কেল্লা বলে একটা জায়গা আছে, তবে সেটা নাকি একটা পাহাড়। বুড়িকে নানী-টানী বলে অনেক তোয়াজ করে, পান-দোক্তা খাইয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি করালাম জায়গাটা দেখিয়ে দিতে। জায়গাটা পাওয়ার পর খুঁজতে শুরু করলাম ডেভিলের চেয়ার। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখি পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটু পুব দিক ঘেঁষে একটা সমান পাথর, একটু ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। পাহাড়ের গা-টাও এই জায়গায়, একটু গর্ত মতন আর খুব মসৃণ। চওড়ায় ফুটখানেক হবে আর

হাতখানেক সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। ঠিক যেন পুরানো দিনের পিঠতোলা চেয়ার। সাথে সাথে বুঝলাম এই সেই ডেভিলের চেয়ার। উঠে গিয়ে বসলাম চেয়ারে। দেখি এমনভাবে চেয়ারটা তৈরি হয়েছে যে বসলে নড়াচড়া করার উপায় নেই। মাথা ঘুরিয়ে উত্তর-উত্তর পূর্ব দিকে তাকালাম। লম্বা লম্বা গাছের চেহারা ছাড়া বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। সেদিন আর সময় ছিল না, পরদিন তাই ভোরবেলা জুপের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আগের দিন রাতে শহর থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম চমৎকার একখানা দূরবীন। সময় ছিল না বলে তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি সেদিন। আশা করি এখন মনে কিছু করবে না সেজন্যে। যা হোক, সূর্য ওঠার সাথে সাথে গিয়ে পৌঁছালাম ওখানে। ডেভিলের চেয়ারে বসে আন্দাজ মত একচল্লিশ ডিগ্রী তেরো মিনিট উত্তরপূর্ব-উত্তরে মাথা ঘোরালাম। এবারে দূরবীনে চোখ লাগাতেই গাছপালাগুলো লাফ দিয়ে এগিয়ে এল কাছে। ধীরে ধীরে দূরবীনটা একটু এপাশ ওপাশ করতেই চোখে পড়ল বনের মধ্যে ফাঁকামত একটা জায়গা। দেখি তালগাছ একপায় দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে-র মত একটা বিশাল ঝাঁকড়া গাছ। পুবদিকের ডালগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। দেখলাম একটা ডালে আবছা মতন মড়ার খুলিটা দেখা যাচ্ছে। ব্যস, বাকিটুকু এক নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল। পুব দিকের সপ্তম ডালে মড়ার খুলি আটকানো আছে। ওর বাঁ চোখ দিয়ে একটা কার্তুজ ঝুলিয়ে দিলে যেখানে মাটি স্পর্শ করবে, সেই বিন্দু থেকে গাছের গুঁড়ির যে অংশটা সবচেয়ে কাছে সেখান থেকে ওই বিন্দু দিয়ে একটা সরলরেখা আঁকতে হবে পঞ্চাশ ফিট পর্যন্ত। তারপর খোঁড়ো মাটি, তোলো গুপ্তধন।'

'তা হলে আমরা যে প্রথমবার ভূতের বেগার খাটলাম সেটা

নিশ্চয়ই জুপের ভুলের জন্যে?'

'নিশ্চয়ই। ও ব্যাটা বাঁ চোখের বদলে ডান চোখ দিয়ে পোকাটা নামানোতে ওটা আসল জায়গা থেকে সরে গিয়েছিল ইঞ্চি দু'তিন দূরে। আর তার ফলে ওই বিন্দু থেকে গাছের গুঁড়ির সবচেয়ে কাছের অংশটারও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল সামান্য। সব মিলে প্রথমবার আমরা আসল জায়গা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলাম।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সবই পরিষ্কার হলো, কিন্তু এখানে সোনাপোকাটার ভূমিকাটা ঠিক বুঝলাম না। কার্তুজ ঝুলিয়েই যদি কাজ হত তা হলে ওটার কী দরকার ছিল? আর পোকাটা ছাড়া অন্য কোনও কিছু বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেও তো একই কথা ছিল।'

'হাঃ, হাঃ, ওইটাই তো আসল কথা,' মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলল লেগ্রাও, 'কেমন বোকা বানালাম তোমাদের? ওটা নেয়ার জন্যেই তোমরা ভেবেছিলে ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যজনক কিছু আছে। আমি যদি একটা ইঁটের টুকরো ঝুলাতাম তা হলে কি ব্যাপারটা জুতসই হত?'

'তা না হয় বুঝলাম, সুযোগ পেয়ে মাথায় ঘোল ঢেলেছ আমাদের কিন্তু গর্তের মধ্যে কঙ্কালগুলো কি ক্যাপ্টেন কিডের কোনও সাঙ্গপাঙ্গর?'

'খুব সম্ভব,' উত্তর দিল লেগ্রাও। 'এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। কোনও প্রমাণ রাখে না কেউ কখনও। ক্যাপ্টেন কিড নিশ্চয়ই তার সাঙ্গপাঙ্গকে দিয়ে গুপ্তধন রাখার কাজগুলো করিয়েছে তারপর এক সুযোগে পটলডাঙ্গার টিকেট ধরিয়ে দিয়েছে সবগুলোর হাতে।'

বাইরে তাকিয়ে দেখি ভোর হয়ে গেছে। নিভু নিভু হয়ে এসেছে ফায়ারপ্লেসের আগুন। ধারে কাছেই কোথাও মা হারিয়ে একটা

ছাগলের বাচ্চা ডেকে উঠল ম্যা ম্যা করে।

'ক্যাপ্টেন কিড।'

গা কাঁপিয়ে হেসে উঠলাম দু'জন। ইঃ ইঃ শব্দে তাকিয়ে চোখ কোণের দিকে শুধু দুটো সাদা দাঁতের সারি। ওর মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসছে শব্দটা।

হাসিতে যোগ দিয়েছে জুপিটার।

মূলঃ এডগার অ্যালান পো
রূপান্তরঃ জাহিদ হাসান

এক ফালি মাংস

পাউরুটির শেষ টুকরোটা দিয়ে ময়দার অবশিষ্ট ক্বাথটুকু মুছে নিয়ে মুখে পুরে দিল টম কিং, ধীরে ধীরে চিবুতে লাগল ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে। টেবিল ছেড়ে উঠতে টের পেল, খিদে তার একটুও মেটেনি। অথচ বাড়ির মধ্যে সে-ই শুধু খেয়েছে। অন্য ঘরে সন্ধ্যার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে- বাচ্চা দুটোকে, যাতে রাতের খাবারের কথা তাদের আর মনে না থাকে। কিছুই পড়েনি স্ত্রীর পেটেও, চুপচাপ বসে স্বামীকে লক্ষ্য করছে সে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে। শ্রমজীবী মহিলাদের মত হালকা-পাতলা শরীর তার, যদিও এক সময়কার সৌন্দর্যের রেশ রয়ে গেছে এখনও। ক্বাথ তৈরির জন্যে ময়দাটুকু সে ধার করে এনেছে এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে, পাউরুটি কিনতে খরচ হয়ে গেছে সর্বশেষ দুটো আধ পেনি।

জানালার কাছের একটা চেয়ারে বসে পড়ল টম কিং, জীর্ণ চেয়ারটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল তার শরীরের ভারে। একটা হাত প্রায় যান্ত্রিকভাবে ঢুকে গেল পকেটে, পাইপটা বের করে এনে ঝুলিয়ে দিল ঠোঁটে। অন্য হাত থাবড়া দিতে লাগল কোটের পাশের পকেটে। আর ঠিক তখনই তার মনে পড়ে গেল, তামাক নেই। একটা ভ্রুকুটি হেনে পাইপটা আবার পকেটে রেখে দিল সে। নড়াচড়া তার খুবই ধীর, যেন ভারী মাংসপেশীগুলো শরীরের

পা'শে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। টম কিং একজন শক্তসমর্থ মানুষ। মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, কোনওকিছুতেই বিচলিত হবার পাত্র সে নয়। পুরনো পোশাকগুলো তার কেমন যেন জবুথুবু। তলায় পট্টির ওপর পট্টি লাগানোয় জুতোর ডগার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে পেছন দিকের ভার বহন করা। দু'শিলিংয়ের সুতির সস্তা জামার কলার ক্ষয়ে গেছে, স্থায়ীভাবে বসে গেছে বেশ কয়েকটা দাগ।

টম কিংয়ের মুখমণ্ডলই বহন করছে তার পরিচয়। ভালভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এটা একটা জাত পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার মুখ, রিংয়ে কেটে গেছে যার বছরের পর বছর। আর এসব বছর লড়াকু জানোয়ারের যাবতীয় চিহ্ন এঁকে দিয়েছে তার মুখে। ঠোঁটজোড়ার কোনও আকার নেই বললেই চলে, চেহারা বীভৎস, ভারী পাতাঅলা চোখদুটো অভিব্যক্তিহীন, সিংহের মত তাতে কেবল একটা ঘুমজড়ানো ভাব। ভিলেনের মত মাথাটায় হেলানো কপাল, খাটো করে ছাঁটা চুলগুলো পড়ে আছে খুলি কামড়ে। অজস্র ঘুসিতে দু'বার ভাঙা নাকটা দারুণ বাঁকাচোরা, ফুলকপির মত এবড়োখেবড়ো একটা কান নিজস্ব আকারের দ্বিগুণ হয়ে ফুলে গেছে চিরদিনের জন্যে, ওদিকে নিখুঁতভাবে কামানোর ফলে গালের চামড়া ধারণ করেছে একটা নীলাভ-কালো রং।

মোট কথা, টম কিংয়ের মুখ এমন এক ধরনের মুখ, যা অন্ধকার কোনও গলি বা নির্জন স্থানে দেখলে আঁতকে উঠবে মানুষ। কিন্তু তাই বলে সে অপরাধী নয়, অন্যায় কোনও কাজই করেনি কখনও। ঝগড়া করেছে দু'চারবার, কিন্তু ক্ষতি করেনি কারওই। সে একজন পেশাদার, এবং তার যাবতীয় নিষ্ঠুরতা তোলা থাকে পেশাদার লড়াইয়ের জন্যে। রিংয়ের বাইরে সে একজন সাদাসিধে ভাল মানুষ। কারও প্রতি কোনও বিদ্বেষ নেই,

শত্রুর সংখ্যাও খুব কম। রিংয়ে সে আঘাত হানে আহত করার জন্যে, পঙ্গু করার জন্যে, এমনকী ধ্বংস করার জন্যে; কিন্তু তার পেছনে টম কিংয়ের কোনও প্রতিহিংসা নেই। সম্পূর্ণটাই নেহাত পেশাগত একটা ব্যাপার। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর পরস্পরকে নকআউট করতে চাইছে, পকেটের পয়সা খরচ করে তা-ই দেখতে চায় দর্শক। জয়ী পায় বেশি অঙ্কের পুরস্কার। বিশ বছর আগে টম কিং যখন মুখোমুখি হয় উলুমুলু গাউগারের, তখন সে জানত, মাত্র চার মাস আগে নিউক্যাসলে লড়তে গিয়ে চোয়াল ভেঙেছে গাউগার। সুতরাং সেই চোয়ালটাই হয়ে দাঁড়াল তার একমাত্র লক্ষ্য। এবং নবম রাউণ্ডে চোয়ালটা আবার ভেঙে দিল সে। অথচ গাউগারের প্রতি সে অশুভ কোনও মনোভাব পোষণ করত না। কাজটা সে শুধু করেছিল এজন্যে যে, জয়লাভ করে বেশি অঙ্কের পুরস্কারটা পাবার ওটাই ছিল সহজতম পথ। গাউগারেরও তার প্রতি কোনও শত্রুতা ছিল না। উভয়েই জানত, পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ কাকে বলে, আর লড়েছেও সেভাবেই।

বকবক করা টম কিংয়ের অভ্যাসের বাইরে। জানালার কাছে চুপচাপ বসে সে তাকিয়েছিল। নিজের দুটো হাতের দিকে। ফুলে আছে বেশ কয়েকটা শিরা, ভেঙে বিশ্রী আকার ধারণ করেছে গাঁটগুলো। ধমনীগুলো অন্যান্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশি রক্ত সঞ্চালন করতে করতে এখন কিছুটা ক্লান্ত, ফলে সেও সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দ্রুত বিশ রাউণ্ড আর খেলতে পারে না সে। ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে সেই ছুটে যাওয়া, অসংখ্য ঘুসি চালানো প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে, নিজেও অসংখ্য ঘুসি হজম করা, উত্তেজনায় ফেটে পড়া দর্শকদের উত্তেজনায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিতে সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণটা বিশতম রাউণ্ডের জন্যে জমিয়ে রাখা—না, এখন আর তেমনটা পারে না সে। ঘুসির পর

ড্রাম চলছে—বম্ বম্ বম্ বম্, অবিরাম, অজস্র, ওদিকে ধমনীগুলো রক্ত সঞ্চালন করে বিশ্বস্ততার সাথে—আহ্! কোথায় গেল সেসব দিন। আবার তাকাল সে হাত দুটোর দিকে। যৌবনে গাঁটগুলো ছিল কতই না সুন্দর! মনে পড়ল টম কিংয়ের। প্রথম গাঁটটা সে ভেঙেছিল বেনী জোন্স্-এর মাথায়, 'ওয়েলশের আতঙ্ক' নামেই সে ছিল সমধিক পরিচিত।

খিদেটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল।

'তা হলে কি এক ফালি মাংসও পাব না আমি!' বলে উঠল টম কিং, বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল একটা শপথ।

'বার্ক আর সলি, দু'দোকানেই গেছি আমি,' কুণ্ঠিত স্বরে বলল স্ত্রী।

'কেউ দিল না?' জানতে চাইল টম কিং।

'না। বার্ক বলল—' তোতলাতে লাগল মহিলা।

'কী?'

'বলল, আজ রাতে সহজেই তোমাকে ধরাশায়ী করবে স্যাণ্ডেল।'

ঘোঁত করে উঠল টম কিং, কিন্তু কোনও জবাব দিল না। চিন্তার পর চিন্তা ভর করল তার মাথায়। যৌবনে পোষা বুল টেরিয়ারটাকে মাংস খাওয়াত সে, টুকরোর পর টুকরো। তখন এক হাজার ফালি মাংস বাকি দিতেও বার্ক আপত্তি করেনি। কিন্তু আজ দিন বদলেছে। বুড়িয়ে গেছে টম কিং। এমন মুষ্টিযোদ্ধাদের কেউ ধার দেয় না।

আজ সকাল থেকেই এক ফালি মাংসের জন্যে আকুল হয়ে আছে সে! এবারে প্রস্তুতিটাও হয়নি ভালমত। অস্ট্রেলিয়ায় প্রচণ্ড খরা গেছে এ বছর, সময় খুব খারাপ, অনিয়মিত কাজ জোটানোও কঠিন হয়ে পড়েছে। কোনও স্প্যারিং পার্টনার ছিল না তার,

খাবারও পায়নি যথেষ্ট পরিমাণে। মজুরের কাজও সে করেছে, পা দুটোকে ঠিক রাখার জন্যে। দৌড়াদৌড়ি করেছে সকালে। কিন্তু পার্টনার ছাড়া প্রস্তুতি নেয়া বড় কঠিন, এবং সেটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যদি কাঁধের ওপর চেপে থাকে স্ত্রী আর দুই বাচ্চার খাদ্য জোগানোর দায়িত্ব। স্যাণ্ডেলের সাথে লড়াইয়ের কথাটা পাকাপাকি হয়ে যাবার পরও আহামরি কোনও সুবিধে দোকানদারেরা তাকে দেয়নি। গেইটি ক্লাবের সেক্রেটারি অগ্রিম দিয়েছে তিন পাউণ্ড—হারলে যে অঙ্কটা সে পাবে—অনেক বলেও পাওয়া যায়নি অতিরিক্ত একটা পেন্স। মাঝে সাঝে দু'চার শিলিং সে জোগাড় করেছে পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে। খরার ফলে তাদের অবস্থাও খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। হ্যাঁ—ব্যাপারটা মানতেই হচ্ছে—প্রস্তুতি তার সন্তোষজনক নয়। আরও ভাল খাবার খাওয়া উচিত ছিল তার, উচিত ছিল চিন্তামুক্ত থাকা। তা ছাড়া, বিশ বছর বয়েসে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যতটা সহজ, চল্লিশ বছরে ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়।

'কয়টা বাজে, লিজি?' জানতে চাইল সে।

হলঘরে গিয়ে আবার ফিরে এল মহিলা। 'পৌনে আটটা

'প্রথম প্রতিযোগিতাটা শুরু হবে আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই,' বলল সে। 'তারপর চার রাউণ্ডের এক প্রতিযোগিতা ডিলার ওয়েল্‌শ্‌ আর গ্রিডলির। দশ রাউণ্ডের তৃতীয় প্রতিযোগিতাটা হবে স্টারলাইটের সাথে কোনও এক নাবিক ছোকরার। আমার লড়াই দেরি আছে এক ঘণ্টারও বেশি।'

দশ মিনিট নিশ্চুপ বসে থেকে উঠে পড়ল টম কিং।

'আসলে, লিজি, ট্রেনিংটা আমার ভাল হয়নি।'

হ্যাটটা নিয়ে দরজার দিকে রওনা দিল টম। স্ত্রীর চুমুর জন্যে অপেক্ষা করল না—কখনোই করে না সে কোথাও যাবার

সময়—কিন্তু আজ চুমু খাবার সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছে মহিলা। দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে স্বামীর মুখটা সে নামিয়ে আনল নিজের মুখের ওপর।

'গুড লাক, টম,' বলল সে। 'আশা করি তুমি ওকে হারাতে পারবে।'

'হ্যাঁ, হারাব ওকে,' বলল টম। 'কাজ তো একটাই—ওকে হারানো।'

প্রাণখোলা একটা হাসি হাসার চেষ্টা করল সে, মহিলা আরও সেঁটে গেল তার শরীরের সাথে। স্ত্রীর কাঁধের ওপর দিয়ে শূন্য ঘরটায় একটা দৃষ্টি বোলাল সে। এই তার যাবতীয় সম্পত্তি—আসবাবহীন একটা ঘর, বাকি পড়া ভাড়া, এক স্ত্রী আর দুই সন্তান। এখন সে চলেছে তাদের মুখে তুলে দেয়ার জন্যে কিছু খাবার আনতে, যে-খাবার তাকে জোগাড় করতে হবে লড়াইয়ের মাধ্যমে। আধুনিক মানুষ এভাবে খাবার আনতে যায় না, এটা যেন অনেকটা আদিম মানুষদের শিকারে বেরোনোর মত।

'হারাবোই ওকে,' টমের কণ্ঠে প্রকাশ পেল খানিকটা বেপরোয়া ভাব। 'জিতলে পাব তিরিশ পাউণ্ড—সমস্ত ঋণ মিটিয়েও থেকে যাবে অনেকটা। আর যদি হারি—একটা পেন্সও পাব না। পরাজিত মুষ্টিযোদ্ধার যা পাবার কথা, অগ্রিম দিয়েছে সেক্রেটারি। গুড বাই, লিজি। যদি জিতি সোজাসুজি ফিরে আসব বাড়িতে।'

'অপেক্ষা করব আমি তোমার জন্যে,' বলল মহিলা।

গেইটির দূরত্ব পুরো দু'মাইল। হাঁটতে হাঁটতে টমের মনে পড়ল সেইসব দিনের কথা—সে যখন ছিল নিউ সাউথ ওয়েলশের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন—ক্যাবে চড়ে আসত সে লড়াই করার জন্যে, বেশির ভাগ সময়েই ভাড়া মিটিয়ে দিত অন্ধ কোনও সমর্থক। টমি বার্নস আর আমেরিক্যান সেই নিগ্রো—জ্যাক জনসন

যেত মোটরে করে। অথচ আজ সে হেঁটে চলেছে! আর, এ-কথা সবাই জানে, প্রতিযোগিতার আগে দু'মাইল হাঁটা মোটেই ভাল নয়। সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, বুড়ো মানুষকে পৃথিবীর কেউ পছন্দ করে না। মজুরের কাজ ছাড়া আর কিছুই তার দ্বারা হবে না, এমনকী সে কাজের পক্ষেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার ভাঙা নাক আর ফোলা কান। কোনও একটা ব্যবসা যদি জানা থাকত তার! শেখাত যদি কেউ! কিন্তু তার অন্তরাত্মা জানে, শেখালেও শিখতে সে চাইত না। এই উত্তেজনার কি তুলনা আছে! কয়েকটা ঘুসি ছোঁড়ো, লুটে নাও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কিছু দিন বিশ্রাম নাও, তারপর আবার ছোঁড়ো ঘুসি—বম্ বম্ বম্ বম্। শেষ রাউণ্ডের সেই আক্রমণ, চারপাশ থেকে ভেসে আসা দর্শকদের চিৎকার, লড়াই শেষে রেফারির ঘোষণা 'কিং জিতেছে!' এবং পরদিন খেলার পাতায় খবর বড় বড় অক্ষরে।

কী দিনই না ছিল সেসব! তখন সে ছিল যুবক, উঠতি; আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিল বুড়ো, পড়তি। লড়তে আসত তারা কমজোর হাড় আর থেঁতলে যাওয়া গাঁট নিয়ে, ফলে নেহাত সোজা হয়ে দাঁড়াত পুরো ব্যাপারটাই। বুড়ো স্টাউসার বিলকে সে নকআউট করেছিল রাস-কাটারস বে-তে। আঠারো রাউণ্ডে পরাজিত হবার পর বুড়ো বিল শিশুর মত কান্নায় ভেঙে পড়েছিল ড্রেসিং-রুমে গিয়ে। বাড়ি ভাড়া হয়তো বাকি ছিল বেচারির। হয়তো পথ চেয়ে বসে ছিল স্ত্রী আর দুই সন্তান। হয়তো আকুল হওয়া সত্ত্বেও সে-রাতে মাত্র এক ফালি মাংস সে জোটাতে পারেনি। দুর্লভ এক থোক টাকার জন্যে সে-রাতে লড়েছিল বিল, পক্ষান্তরে টম কিং লড়েছিল সহজলভ্য টাকা আর গৌরবের জন্যে।

প্রত্যেক মুষ্টিযোদ্ধারই লড়াইয়ের একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকে। কেউ লড়তে পারে একশোটা শক্ত লড়াই, কেউ হয়তো মাত্র

বিশটা; সবই নির্ভর করে তার দৈহিক গঠনের ওপর, পেশির ধরনের ওপর। নির্ধারিত সংখ্যক সেই লড়াইয়ের পর থেকেই শুরু হয় মুষ্টিযোদ্ধার পতন। হ্যাঁ, গড়পড়তা মুষ্টিযোদ্ধার চেয়ে অনেক বেশি লড়ার ক্ষমতা নিয়ে সে এসেছে এই পৃথিবীতে। লড়াইও এ-যাবৎ কম করেনি, যে লড়াইগুলো কুরে কুরে খেয়েছে তার অদম্য মানসিক শক্তি, সহনশীলতা। হ্যাঁ, সমকালীন মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে ভাল করেছে। সঙ্গীদের কেউই আর টিকে নেই। একে একে সবার পতন দেখেছে সে, কয়েকজন তো তারই হাতে খতম হয়ে গেছে।

তখন সে ছিল যুবক, তার ওপর পড়ত বুড়োদের খতম করার ভার। তাই তো ড্রেসিংরুমে বুড়ো স্টাউসার বিলকে কাঁদতে দেখে হেসেছিল সে দুলে দুলে। এখন সে বুড়ো, তাকে খতম করার ভার দেয়া হচ্ছে বর্তমানের যুবকদের ওপর। সেই ভার নিয়েই স্যাণ্ডেল এসেছে নিউজিল্যাণ্ড থেকে, লড়াইয়ে যার রয়েছে ধারাবাহিক রেকর্ড। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ায় তাকে কেউ চেনে না। টম কিংয়ের বিপক্ষে সে যদি ভাল করতে পারে, তাকে দেয়া হবে আরও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই সাথে বাড়তে থাকবে পুরস্কারের অঙ্ক। সুতরাং লড়াইটা স্যাণ্ডেল হিংস্রভাবেই লড়বে। তার অর্থ আর গৌরবোপার্জনের পথে টম কিং মূর্তিমান বাধা, অতএব সে-বাধা অপসারণের জন্যে সে যথাসাধ্য করবে। পক্ষান্তরে টম কিংয়ের লক্ষ্য স্রেফ ওই তিরিশ পাউণ্ড, যা দিয়ে সে মেটাতে চায় বাড়িভাড়া আর কিছু ঋণ। হ্যাঁ, বার্ধক্য পরাজিত হয় তারুণ্যের কাছে। তারপর, হার মানার খাতিরে, সে-তারুণ্যও ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় বার্ধক্যের দিকে।

ক্যাসলিরিয়া স্ট্রীটে পৌঁছে সে বামদিকে ঘুরল, তিনটে ব্লক পরেই গেইটি। সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল তরুণ একদল মাস্তান,

ফিসফিস করতে লাগল পরস্পর, 'এই যে! এই সেই টম কিং!'

ড্রেসিং-রুমের দিকে এগোতে দেখা হলো সেক্রেটারির সাথে। তীক্ষ্ণ চোখ, ধূর্ত চেহারার লোকটা করমর্দন করল তার সাথে।

'কেমন বোধ করছ, টম?' জানতে চাইল সে।

'সম্পূর্ণ সুস্থ,' জবাব দিল কিং। কথাটা মিথ্যে, জানা আছে তার। মাত্র একটা পাউণ্ড হাতে থাকলেও সে খেত এক ফালি মাংস।

ড্রেসিং-রুম থেকে বেরিয়ে সহকারীদের নিয়ে এগোতে লাগল সে রিং অভিমুখে। হৈ হৈ করে উঠল অপেক্ষমাণ জনতা। ডানে বামে ঝুঁকে অভিবাদন গ্রহণ করল সে, তবে বেশির ভাগ মুখই অচেনা। একের পর এক যখন সুনাম অর্জন করছিল সে, তখন হয়তো এদের জন্মই হয়নি। আলগোছে পাটাতনে লাফিয়ে উঠে, মাথা নীচু করে দড়ি পার হয়ে, সোজাসুজি নিজের কোণে গিয়ে বসে পড়ল সে একটা ভাঁজ করা টুলে। জ্যাক বল, রেফারি, হাত মেলাল এগিয়ে এসে। সেও ছিল মুষ্টিযোদ্ধা, দশ বছর আগে একটা দুর্ঘটনায় পড়ার পর আর রিংয়ে প্রবেশ করতে পারেনি। জ্যাক বল রেফারি থাকায় খুশিই হলো টম কিং, বুড়ো তারা দু'জনেই। সুতরাং স্যাণ্ডেলকে দু'চারটে বেআইনী আঘাত হানলে জ্যাক বল সেটা এড়িয়ে যাবে, এটুকু ভরসা তার ওপর করা যায়।

একের পর এক রিংয়ে উঠছে উচ্চাভিলাষী তরুণ হেভিওয়েটরা। রেফারি তাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে দর্শকদের সাথে। এ ছাড়া সে জানিয়ে দিচ্ছে হেভিওয়েটদের চ্যালেঞ্জ।

'এটা হলো প্রোন্টো,' ঘোষণা করল বল। 'এসেছে উত্তর সিডনি থেকে। জয়ীর প্রতি সে ছুঁড়ে দিচ্ছে পঞ্চাশ পাউণ্ডের চ্যালেঞ্জ। পঞ্চাশ পাউণ্ড, পঞ্চাশ পাউণ্ড, পঞ্চাশ পাউণ্ড।'

স্যাণ্ডেল রিংয়ে উঠে তার টুলে গিয়ে বসে পড়তে আবার হৈ

হৈ হৈ করে উঠল জনতা। কৌতূহলী চোখে তাকাল টম কিং। কারণ, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা জড়িয়ে পড়বে নিষ্ঠুর এক লড়াইয়ে। একে অপরকে অজ্ঞান করে ফেলার জন্যে তারা প্রয়োগ করবে সর্বশক্তি। কিন্তু খুব একটা কিছু সে দেখতে পেল না। তার মতই, রিংয়ের পোশাকের ওপর স্যাণ্ডেল পরেছে ট্রাউজার আর সোয়েটার। ছোকরা দেখতে বেশ সুন্দর, কোঁকড়া কোঁকড়া হলুদ চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। মোটা, পেশীবহুল ঘাড়।

তরুণ হেভিওয়েটদের যেন শেষ নেই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে টম কিং। বুড়ো মুষ্টিযোদ্ধাদের মাড়িয়ে এরা মুঠোয় আনে জয়, তারপর একদিন নিজে বুড়ো হয়ে সুগম করে দেয় অন্য তরুণের জয়ের পথ।

প্রেস বক্সের দিকে তাকিয়ে কিং মাথা নোয়াল, 'স্পোর্টসম্যান'-এর মরগান আর 'রেফারি'-র করবেটের উদ্দেশে। তারপর বাড়িয়ে দিল দু'হাত। তার দুই সহকারী, সিড সুলিভ্যান আর চার্লি বেটস, গ্লাভস পরিয়ে বেঁধে দিল শক্ত করে। মনোযোগ দিয়ে গ্লাভস্ বাঁধা দেখল স্যাণ্ডেলের এক সহকারী, এর আগে গাঁটের ওপরের টেপগুলো লক্ষ্য করেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। স্যাণ্ডেলের কোণে গিয়ে এই একই কাজ করছে তার এক সহকারী। ট্রাউজার খুলে নেয়া হয়েছে স্যাণ্ডেলের, খুলে নেয়া হলো সোয়েটারটাও। টম কিং দেখল, ধপধপে সাদা চামড়ার নীচে কিলবিল করছে পেশী।

দু'জনেই দু'জনের দিকে এগোল মিলিত হবার জন্যে। ঘণ্টা পড়ল ঢং করে, ভাঁজ করা টুল দুটো নিয়ে রিং ত্যাগ করল সহকারীরা। দ্রুত হাত মিলিয়ে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। স্প্রিংয়ের মত যাতায়াত শুরু করল স্যাণ্ডেল। বামহাতি একটা ঘুসি চালাল চোখে, পাঁজরে ডানহাতি,

প্রতিপক্ষের একটা ঘুসি এড়াল মাথা নীচু করে, হালকাভাবে নাচতে নাচতে সরে গেল, আবার এগিয়ে এল ভয়ঙ্কর নাচ নাচতে নাচতে। সে যেমন ক্ষিপ্র তেমনি চালাক। লড়াইয়ের কৌশলটাও চোখ ধাঁধানো। সমস্ত দর্শক হৈ হৈ করে সমর্থন জানাল তাকে। কিন্তু চোখ ধাঁধানো কোনও কৌশলের আশ্রয় টম কিং নিল না। অনেক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তার, তরুণদের বিপক্ষেও কম লড়েনি। এই ধরনের ঘুসি চেনা আছে তার। এগুলো দ্রুতগতি, কিন্তু বিপজ্জনক নয়। শুরু থেকেই কিছু একটা ঘটানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে স্যাণ্ডেল। তরুণেরা এমনই।

পুরো রিং জুড়ে যেন বিদ্যুতের মতই চমকাতে লাগল স্যাণ্ডেল। এক কৌশল ব্যর্থ হলো, তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করল আরেকটা। হাজারো কৌশলের তার একটাই উদ্দেশ্য–টম কিংকে ধরাশায়ী করা, যে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাগ্যকে আড়াল করে। অপেক্ষা করতে লাগল টম কিং ধৈর্যের সাথে। যৌবনের তেজ সে চেনে। আর এ-ও জানে যে, যৌবন এখন আর তার পক্ষে নেই। ধৈর্য তাকে ধরতেই হবে, যতক্ষণ না খানিকটা দম হারিয়ে ফেলে স্যাণ্ডেল। ইচ্ছেকৃত একটা শয়তানী শুরু করল টম কিং, মুষ্টিযুদ্ধে যা বেআইনী নয়। এড়িয়ে যাওয়া যায়, এমন কিছু ঘুসি সে গ্রহণ করতে লাগল মাথা পেতে। মাথার ওপরদিকে আঘাত হানলে গাঁটগুলো থেঁতলে যায়। এই কাজের জন্যে অবশ্য বিবেকের কোনও দংশন অনুভব করল না টম কিং। গাঁটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মুষ্টিযোদ্ধার নিজের। ছোট এই ব্যাপারটা তোয়াক্কাই করল না স্যাণ্ডেল। করার কথাও নয়। কিন্তু অনেক দিন পর আজকের কথা স্মরণ করে আপসোস হবে তার। নিজের হাত দুটো উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে মনে পড়বে, কীভাবে প্রথম গাঁটটা সে ভেঙেছিল টম কিংয়ের মাথায়।

প্রথম রাউণ্ডটা পুরোপুরিই স্যাণ্ডেলের। প্রত্যেকটা ঘুসির সাথে সাথে উত্তেজিত হয়ে উঠল দর্শক। পক্ষান্তরে একটা আঘাতও হানল না কিং। ব্লক করল, ঘুসি এড়াল মাথা নামিয়ে, কখনও শাস্তির হাত থেকে অন্তত কিছুটা রেহাই পাবার জন্যে জড়িয়ে ধরল স্যাণ্ডেলকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড পাঞ্চে বোঁ করে উঠল মাথা, কিন্তু সামলে নিয়েই খুব ধীরে সরে গেল সে, অযথা লাফিয়ে উঠে নষ্ট করল না বাড়তি এক তোলা কর্মক্ষমতা। তার ঢুল ঢুলু চোখজোড়া দেখলে মনে হয়, ওই চোখ বুঝি সমস্ত তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলেছে। আসলে বিশ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞ ওই চোখকে রিংয়ের কোনও দৃশ্য ফাঁকি দিতে পারে না।

কোণায় গিয়ে এক মিনিটের বিশ্রাম নিতে বসল টম কিং। পা দুটো সামনে ছড়ানো, হাঁ করে গিলছে সহকারীদের তোয়ালে দোলানো বাতাস। চোখ বন্ধ, কানে ভেসে আসছে দর্শকদের নানারকম কথা। 'লড়ছ না কেন, টম?' চেঁচিয়ে উঠল কে যেন। 'নিশ্চয় তুমি ভয় পাও না ওকে, নাকি পাও?'

'পেশী জমে গেছে,' মন্তব্য করল সামনের আসনের এক দর্শক। 'দ্রুত নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে ওর। একে দুই, স্যাণ্ডেলের ওপর—পাউণ্ডে।'

ঘণ্টা পড়ল। কোনা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দুই মুষ্টিযোদ্ধা। তিন চতুর্থাংশ দূরত্ব অতিক্রম করে ছুটে এল কৌতূহলী স্যাণ্ডেল। কিং কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক ধাপও যেতে চায় না। প্রস্তুতি সুবিধে হয়নি তার, ভাল খাবারও পড়েনি পেটে, প্রতিটা পদক্ষেপই তাই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া, লড়াইয়ের আগে সে হেঁটে এসেছে দু'মাইল। প্রথম রাউণ্ডেরই পুনরাবৃত্তি হলো দ্বিতীয় রাউণ্ডে। ঝড়ের বেগে আক্রমণ চালাল স্যাণ্ডেল। বিরক্ত দর্শকেরা বারবার জানতে চাইল, কিং কেন লড়ছে না। ধীরে দু'একটা ঘুসি চালানো ছাড়া

ব্লক, আঘাত এড়ানো আর জড়িয়ে ধরা নিয়েই ব্যস্ত রইল সে। গতি বাড়াতে চাইল স্যাণ্ডেল, কিন্তু সে সুযোগ কিং তাকে দিল না। স্যাণ্ডেলের প্রত্যেকটা আক্রমণের ওপর কিংয়ের রয়েছে তীক্ষ্ণ নজর। বেশির ভাগ সাধারণ দর্শকের মনে হলো, স্যাণ্ডেলের সাথে কিংয়ের কোনওরকম তুলনাই চলে না। এক পাউণ্ডে তিন পাউণ্ড বাজি ধরতে লাগল তারা স্যাণ্ডেলের ওপর। তবে জাত কিছু দর্শক, যদিও তাদের সংখ্যা খুব কম, টম কিংকে বেশ ভাল করেই চেনে।

তৃতীয় রাউণ্ড শুরু হলো গতানুগতিক ভাবেই। একতরফা ঘুসি চালাতে লাগল স্যাণ্ডেল। কেটে গেল আধ মিনিট। অতি আত্মবিশ্বাসী স্যাণ্ডেলের মুখের ওপর থেকে গার্ড সরে গেল মুহূর্তের জন্যে। ঝলসে উঠল কিংয়ের ডান হাত। হুক-বাঁকানো বাহু, তার সাথে যোগ হলো আধ পাক খাওয়া দেহের সম্পূর্ণ ওজন। দড়াম করে চোয়ালের পাশে গিয়ে পড়ল হুকটা, ঘুমন্ত সিংহ যেন থাবা চালাল হঠাৎ, বলদের মত মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল স্যাণ্ডেল। ঢোক গিলল দর্শক, প্রশংসার একটা গুঞ্জন উঠল। পেশি মোটেই জমে যায়নি লোকটার, বরং তার হাতে রয়েছে হাতুড়ির সমান আঘাত হানার ক্ষমতা।

উপুড় হয়ে উঠার চেষ্টা করল স্যাণ্ডেল। কিন্তু চিৎকার দিয়ে নিষেধ করল সহকারীরা, বিশ্রাম নিতে বলল যথাসম্ভব। এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে চুপ করে রইল স্যাণ্ডেল, ওদিকে কানের কাছে জোরে জোরে গুণে চলেছে রেফারি। নয় গুণতেই লাফিয়ে উঠল সে, লড়ার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে মনে আপসোস করল টম কিং, ঘুসিটা যদি চোয়ালের গোড়ার দিকে আর একটা ইঞ্চি সরে পড়ত! তা হলে ওটা হত একটা নকআউট, তিরিশ পাউণ্ড নিয়ে টম কিং রওনা দিতে পারত বাড়ির উদ্দেশে।

গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ হলো রাউণ্ডের তিন্নটি মিনিট। এই প্রথম প্রতিপক্ষের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল স্যাণ্ডেলের মধ্যে। সহকারীদের হাবভাব দেখে কিং যেই বুঝল যে রাউণ্ড শেষ হয়ে আসছে, চলে এল সে নিজের কোণায়। ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে বসে পড়ল টুলে। কিন্তু কোণায় যাবার জন্যে প্রায় পুরো রিংটাই অতিক্রম করতে হলো স্যাণ্ডেলকে। ফলে অতি সামান্য হলেও ক্ষয়ে গেল শক্তি, সেই সাথে ব্যয় হলো মহামূল্যবান একটা মিনিটের কিছু অংশ। ব্যাপারটা একেবারেই ছোট, কিন্তু ছোট ছোট ব্যাপার একত্র হয়েই বিরাট আকার ধারণ করে। প্রত্যেক রাউণ্ডের শুরুতে খুব ধীরে রওনা দিল কিং, যাতে প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করতে হয় অধিকতর দূরত্ব, আবার রাউণ্ড শেষ করল নিজের কোণায়, যাতে এক মুহূর্তও নষ্ট না করে বসে পড়তে পারে।

পার হয়ে গেল আরও দুটো রাউণ্ড। যথারীতি ঝোড়ো আক্রমণ বজায় রাখল সাণ্ডেল, কিং রইল সতর্ক ররাবরের মতই। তবে স্যাণ্ডেলের গতি বাড়ানোর চেষ্টা একবার ঝামেলায় ফেলে দিল কিংকে, তাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া অজস্র ঘুসির বেশ কয়েকটা আঘাত হানল জায়গামত। আরও সতর্ক হয়ে গেল কিং, ওদিকে আক্রমণ তীব্রতর করার জন্যে তার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে মাথাগরম দর্শকের দল। ষষ্ঠ রাউণ্ডে আবার সামান্য একটা ভুল করল স্যাণ্ডেল, বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল কিংয়ের ডান হাত। আবার পড়ল স্যাণ্ডেল, উঠল নয় গুণতে গুণতে।

সপ্তম রাউণ্ডে আক্রমণের সেই ধার আর রইল না স্যাণ্ডেলের। বুঝতে পারল সে, এ যাবৎ লড়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে টম কিংই সবচেয়ে শক্ত। এর আগেও আরও অনেক বুড়োর বিপক্ষে লড়েছে সে, কিন্তু এই বুড়োর বুদ্ধি কোনও কিছুতেই গুলিয়ে যায় না।

প্রতিরোধে সে যেমন দক্ষ, তেমনি আঘাত করার বেলায়। বুড়োর উভয় হাতেই রয়েছে নকআউটের মার। তবু কিন্তু তাড়াহুড়ো করল না টম কিং। ক্ষতবিক্ষত গাঁটগুলোর কথা ভোলেনি সে। শেষ রাউণ্ড পর্যন্ত টিকতে চাইলে ওগুলোর কথা মনে রাখতেই হবে। কোণায় বসে অপর কোণায় বসা প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা চিন্তা দোলা দিল টম কিংয়ের মনে। তার মেধা এবং স্যাণ্ডেলের তারুণ্য এক করলে তৈরি হতে পারে একজন বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু যত গোল রয়েছে ওই এক করায়। স্যাণ্ডেল কখনোই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না। মেধায় কমতি আছে তার। সুতরাং মেধা কিনতে হবে তাকে তারুণ্যের মূলে; ফলে মেধা যখন তার হবে, ফুরিয়ে যাবে ততদিনে তারুণ্যের সঞ্চয়।

বিন্দুমাত্র সুযোগও ছাড়ল না কিং। জড়িয়ে ধরতে একবারও ভুল হলো না তার। আর ওই অবস্থাতেই আঘাত হানল কাঁধ দিয়ে, পাঞ্চের চেয়ে কোনওমতেই যা কম কার্যকর নয়। জড়িয়ে ধরলে বিশ্রামও মেলে, কিন্তু অস্থির হয়ে ওঠে স্যাণ্ডেল। 'বিশ্রাম' শব্দটা তার অভিধানে নেই। কিং যখন কাঁধ দিয়ে আঘাত হানল তার পাঁজরে, নিজের পিঠের পিছনে হাত ঘুরিয়ে ঘুসি মারল সে কিংয়ের মুখে। চিৎকার ছাড়ল উত্তেজিত দর্শক। মারটায় চালাকি আছে কিন্তু ভয়ঙ্করত্ব নেই। আর অযথা ঘুসি চালানো শক্তি ক্ষয়েরই নামান্তর। শক্তির এই অপব্যয় ক্লান্তি ডেকে আনে। কিন্তু ক্লান্তি কী জিনিস, স্যাণ্ডেল বুঝি তা জানে না।

ঘুসির বন্যা বইয়ে দিল স্যাণ্ডেল। দর্শক ভাবল, পিটুনি খেয়ে মরতে চলেছে টম। কিন্তু অভিজ্ঞরা ঠিকই লক্ষ্য করল, প্রত্যেকটা ঘুসি আছড়ে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কিংয়ের বাম-হাতি গ্লাভস ছুঁয়ে যাচ্ছে স্যাণ্ডেলের বাইসেপ্স্। অত্যন্ত চতুর এই স্পর্শ

আঘাতের পরিমাণ অর্ধেক করে দেয়। নবম রাউণ্ডে এক মিনিটেই তিনটে হুক কষাল কিং। তিনবারই পাটাতনে আছড়ে পড়ল স্যাণ্ডেল, তিনবারই উঠল নয় গুণতে গুণতে। গতি সে কিছুটা হারিয়েছে সত্যি, কিন্তু শক্তি বুঝি এতটুকু হারায়নি। তারুণ্যই স্যাণ্ডেলের প্রধান সম্পদ, কিংয়ের যেখানে অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা জানে, তরুণকে কীভাবে প্রলুব্ধ করতে হয়। বারবার হাত, পা ব্যবহার করে স্যাণ্ডেলকে পেছনে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করল কিং। সে বিশ্রাম নিল ঠিকই, কিন্তু স্যাণ্ডেলকে সে—সুযোগ দিল না। এটাই বয়েসের কৌশল।

দশম রাউণ্ডের শুরু থেকেই প্রতিরোধের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল কিং। ছুটে আসা স্যাণ্ডেলের মুখে সে চালাতে লাগল স্ট্রেট লেফট। প্রথমে সেগুলো এড়ানোর চেষ্টা করল স্যাণ্ডেল, তারপর পাল্টা জবাব দিতে লাগল হুকের সাহায্যে। হুকগুলো কার্যকর নয়, বেশির ভাগই পড়তে লাগল মাথার ওপরের দিকে। হঠাৎ একটা হুক জায়গামত পড়ল, ধীরে ধীরে যেন চোখের সামনে নেমে এল কালো একটা পর্দা, দর্শকেরা উধাও। তারপর কানে আবার ভেসে এল কলরব, একজন দু'জন করে ফিরে এল সমস্ত দর্শক। জ্ঞান হারিয়েছিল সে, কিন্তু তা এতই অল্প সময়ের জন্যে যে, সবাই দেখল হাঁটু ভাঁজ হয়েই আবার সোজা হয়ে গেল কিংয়ের। চিবুকটা সে আরও নামিয়ে দিল বাম কাঁধের আড়ালে।

বেশ কয়েকটা হুক লাগাল স্যাণ্ডেল। সামলে নিল কিং কোনও মতে। তারপর আধ ধাপ পিছিয়ে এল সে, সর্বশক্তি দিয়ে ঝাড়ল একটা ডানহাতি আপারকাট। স্যাণ্ডেলের পুরো শরীর উঠে গেল শূন্যে, মাথা আর কাঁধ দিয়ে আছড়ে পড়ল ম্যাটের ওপর। আরেকবার স্যাণ্ডেলকে শুইয়ে দিল কিং, তারপর বিরতিহীন ঘুসোতে ঘুসোতে নিয়ে গেল দড়ির ওপর। অনেক চেষ্টা করেও

এক মুহূর্তের দম পেল না স্যাণ্ডেল, অজস্র ঘুসি এসে পড়ছে চোখে, মুখে, নাকে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে সারা হল, চিৎকারে কান পাতা দায়। একটা নকআউট যেন অবশ্যম্ভাবী, পুলিশের একজন ক্যাপ্টেন রিংয়ের পাশে এসে লড়াই বন্ধ করে দিতে বলল। আর ঠিক তখনই ঢং করে পড়ল রাউণ্ডের ঘণ্টা। টলতে টলতে নিজের কোণার দিকে এগিয়ে গেল স্যাণ্ডেল। পুলিশ ক্যাপ্টেনের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, শারীরিক দিক দিয়ে পুরোপুরি সমর্থ আছে সে। পেছনদিকে দুটো লাফ ছাড়ল স্যাণ্ডেল, সামর্থ্য প্রমাণ করার জন্যেই সম্ভবত। উপায়ান্তর না দেখে হাল ছেড়ে দিল পুলিশ ক্যাপ্টেন।

আপন কোণায় হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল হতাশ টম কিং। রেফারি লড়াই থামিয়ে দিলেই সিদ্ধান্ত যেত তার পক্ষে। স্যাণ্ডেলের মত সে গৌরবের জন্যে লড়ছে না, তার লক্ষ্য স্রেফ ওই তিরিশ পাউণ্ড। কিন্তু এক মিনিটের বিশ্রামেই অনেকটা সামলে নেবে স্যাণ্ডেল।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। স্যাণ্ডেলের মত লড়লে সে পনেরো মিনিটও টিকত না। পা দুটো ভারী হয়ে আসছে, রাউণ্ডের মাঝখানের বিশ্রাম আর কোনও কাজে লাগছে না তার। লড়াইয়ের আগে দু'মাইল হাঁটাটা মোটেই উচিত হয়নি। আর এক ফালি মাংসের জন্যে সেই নিদারুণ আকুলতা! কসাইদের ওপর ভীষণ একটা ঘৃণা জন্মালো তার, তুচ্ছ এক ফালি মাংস ব্যাটারা বাকি দিতে রাজি হয়নি। খুব জোর কয়েক পেন্স মূল্য হবে মাংসের, যদিও তার কাছে সেটা তিরিশ পাউণ্ডের সমতুল্য।

এগারো রাউণ্ডের ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে ছুটে এল স্যাণ্ডেল, যেন তেজ একটুও কমেনি তার। আসলে পুরো ব্যাপারটাই ধোঁকা, এবং কিং তা জানে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্যাণ্ডেলকে জড়িয়ে

ধরল সে, ছেড়ে দিল আবার। পিছিয়ে গেল স্যাণ্ডেল, এটাই চাইছিল কিং। বামহাতি ঘুসি চালাল সে, এড়ানোর জন্যে স্যাণ্ডেল মাথা নামাতেই হুক করল, তারপর আধ ধাপ পিছিয়ে লাগাল পূর্ণশক্তির আপারকাট। ম্যাটের ওপর ছিটকে পড়ল স্যাণ্ডেল। এবারে উঠতে কিং আর তাকে দম ফেলার সুযোগ দিল না। নিজে মার খেল, কিন্তু মারল তার দ্বিগুণ।

উন্মাদ হয়ে উঠল হলের সমস্ত দর্শক, যারা এখন আর স্যাণ্ডেলের নয়। প্রায় সবাই চিৎকার করছে, 'এগিয়ে যাও, টম!' 'ধরো!' 'ধরো ব্যাটাকে!' 'জিতেই গেছ তুমি, টম!' 'লাগাও আর কয়েকটা!' লড়াই শেষ হতে চলেছে ঝড়ের গতিতে, আর এই ঝড় উপভোগের জন্যেই দর্শক আসে গাঁটের পয়সা খরচ করে।

আধ ঘণ্টা ধরে যে-শক্তি কিং জমিয়ে রেখেছিল কৃপণের মত, এবারে সে তা দু'হাতে খরচ করতে লাগল। যা কিছু করার, তাকে এই রাউণ্ডেই করতে হবে। দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে শক্তি, নিঃশেষ হবার আগেই ধরাশায়ী করতে হবে প্রতিপক্ষকে। আক্রমণ চালাতে চালাতেই কিং হাড়ে হাড়ে টের পেল, স্যাণ্ডেলকে নকআউট করা কী ভয়াবহ রকমের কঠিন। তার রয়েছে অসীম সহ্যক্ষমতা। এমন যাদের শারীরিক গঠন, তারাই হয় সার্থক মুষ্টিযোদ্ধা।

টলমল করতে লাগল স্যাণ্ডেল। ওদিকে খিল ধরতে চাইছে কিংয়ের পায়ে, প্রত্যেকটা আঘাতের সাথে সাথে জ্বালা করে উঠছে ক্ষতবিক্ষত গাঁটগুলো। দুর্বলতা ধীরে ধীরে পেয়ে বসছে তাকে। ঘুসিগুলো জায়গামত এখনও পড়ছে ঠিকই, কিন্তু কোনও ওজন যেন আর নেই তাতে, প্রত্যেকটা ঘুসিই যেন স্রেফ ইচ্ছে শক্তির ফসল। সীসের মত ভারী পা জোড়া নড়তেই চাইছে না আর। ব্যাপারটা লক্ষ করে স্যাণ্ডেলের সমর্থকেরা হৈ হৈ করে উৎসাহ দিল তাকে।

প্রচণ্ড ইচ্ছে শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে আবার খানিকটা সচল করে তুলল কিং। চোখের পলকে দুটো ঘুসি চালাল সে—বামহাতি একটা সোলার প্লেক্সাসের সামান্য ওপরে, তারপর চোয়ালে একটা রাইট ক্রস। ঘুসি দুটোতে কোনও জোর ছিল না বললেই চলে, তবু পড়ে গিয়ে কাঁপতে লাগল অতি দুর্বল স্যাণ্ডেল। একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গুণতে লাগল রেফারি। দশ সেকেণ্ডের মাথায় স্যাণ্ডেল যদি উঠতে না পারে, তা হলে সব শেষ। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সমস্ত দর্শক। কিং দাঁড়িয়ে আছে নিজের কোণায়। পা কাঁপছে থরথর করে, বনবন করে ঘুরছে মাথা, রেফারির গলা যেন ভেসে আসছে কোন্ সুদূর থেকে। এত আঘাত হজম করে উঠে দাঁড়ানো কোনও মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু তারুণ্যের পক্ষে সম্ভব। স্যাণ্ডেল উঠল। চার গুণতে উপুড় হলো, দড়ি হাতড়াল অন্ধের মত। সাত গুণতে ভর দিল হাঁটুতে, মাথা ঝুলে আছে কাঁধের ওপর। 'নয়!' চিৎকার ছাড়ল রেফারি। লাফিয়ে উঠে অবস্থান নিল স্যাণ্ডেল। বাম বাহু মুখ ঢেকে আছে, ডান বাহু পেট। এখন তার ইচ্ছে, সুযোগ পাওয়া মাত্র কিংকে জড়িয়ে ধরে খানিকটা বিশ্রাম নেয়া।

স্যাণ্ডেল ওঠার সাথে সাথে কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিং। কিন্তু যে দুটো ঘুসি সে চালাল, দুটোই ব্যাহত হলো স্যাণ্ডেলের বাড়িয়ে দেয়া বাহুতে। পরমুহূর্তেই তাকে জড়িয়ে ধরল স্যাণ্ডেল। দুই মুষ্টিযোদ্ধাকে আলাদা করে দেয়ার জন্যে ছুটে এল রেফারি। নিজেকে মুক্ত করতে কিংয়ের মাঝে প্রকাশ পেল অস্থিরতা। বিশ্রামের এই সুযোগ দেয়ার ভয়াবহতা সে জানে। বড় শিগগির নিজেকে সামলে নিতে পারে তরুণ। এখন বিশ্রামের সুযোগটা নষ্ট করতে পারলেই জয় হবে তার। আর মাত্র একটা কড়া পাঞ্চ—ব্যস। অবশ্য এক দিক দিয়ে ধরলে সন্দেহাতীতভাবে

জয়লাভ করেছে কিং। লড়াইয়ের প্রত্যেকটা বিভাগে সে পরাস্ত করেছে স্যাণ্ডেলকে। কিংকে ছেড়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল স্যাণ্ডেল, দুলতে লাগল জয়-পরাজয়ের সূক্ষ্ম সুতোর ব্যবধানে। এখন শক্ত একটা ঘুসিই ওকে নকআউট করার পক্ষে যথেষ্ট। তিক্ততার একটা স্মৃতি ভেসে এলা টম কিংয়ের মনে। অতি প্রয়োজনীয় এই পাঞ্চটার পেছনে যে জোর থাকা উচিত, সেটা হয়তো সরবরাহ করতে পারত সেই এক ফালি মাংস। ঘুসিটার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিল সে, কয়েক মুহূর্ত পরেই ছুটে গেল সেটা লক্ষ্যবস্তুর দিকে। টলে গেল স্যাণ্ডেল, কিন্তু পড়ল না। হাহাকার করে উঠল যেন কিংয়ের অন্তর। আরেকটা ঘুসি চালাল সে। কিন্তু শরীরটা যেন এখন আর তার নয়। চোয়াল লক্ষ্য করে চালানো ঘুসিটা আঘাত হানল কাঁধে। ঘুসিটা সে জায়গামতই মারতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্লান্ত পেশী বর্তমানে তার আদেশ পালনে অসমর্থ। আর ঘুসির ধাক্কায় নিজেই পিছনে ছিটকে এল টম কিং, পতনটা সামলাল কোনওরকমে। আবার হাত চালাল সে, পুরোপুরিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো এবারের পাঞ্চটা। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল দারুণ এক অবসন্নতা। জ্ঞান হারিয়ে পাটাতনে লুটিয়ে পড়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতেই যেন স্যাণ্ডেলকে জড়িয়ে ধরল টম কিং।

নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা আর করল না সে। সম্পূর্ণ শক্তি যেন উবে গেছে। জড়িয়ে ধরা অবস্থাতেই টের পেল, মুহূর্তে মুহূর্তে শক্তি ফিরে পাচ্ছে স্যাণ্ডেল। দু'জনকে আলাদা করে দিল রেফারি। আঘাত হানতে লাগল স্যাণ্ডেল। তার দুর্বল, লক্ষ্যভ্রষ্ট পাঞ্চগুলো ক্রমেই হয়ে উঠল কড়া আর নিখুঁত। ঝাপসা চোখে চোয়ালের উদ্দেশ্যে চালানো ঘুসিটা দেখতে পেল টম কিং, বাধা দিতে চাইল হাত তুলে। বিপদটা ঠিকই টের পেল সে। ব্যবস্থাও

নিতে চাইল যথাযথ, কিন্তু কেউ যেন তার হাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে হাজারখানেক সীসের টুকরো। শরীর যখন কথা শুনল না, হাতটা টেনে তুলতে চাইল সে আত্মার সাহায্যে। পরমুহূর্তেই চোয়ালের পাশে আছড়ে পড়ল গ্লাভস পরা হাতটা। দপ্‌ করে একটা আলো যেন জ্বলে উঠল মাথার ভিতর, তারপরই নেমে এল কালো একটা পর্দা।

চোখ মেলে টম কিং দেখল, শুয়ে আছে সে নিজের কোণায়। সমুদ্র গর্জনের মত কানে ভেসে আসছে দর্শকদের চিৎকার। ভেজা একটা স্পঞ্জ চেপে ধরা হয়েছে খুলির গোড়ায়। মুখে আর বুকে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিচ্ছে সিড সুলিভ্যান। এর মধ্যেই খুলে নেয়া হয়েছে গ্লাভস দুটো, সামনে ঝুঁকে তার সাথে হাত মেলাচ্ছে স্যাণ্ডেল। নকআউট করলেও স্যাণ্ডেলের প্রতি কোনওরকম বিদ্বেষ তার নেই। শুভেচ্ছা জানাল কিং। এবারে স্যাণ্ডেল গিয়ে দাঁড়াল রিংয়ের মাঝখানে। প্রোন্টোর চ্যালেঞ্জ শুধু গ্রহণই করল না, বাজির মাত্রা বাড়াতে বলল পঞ্চাশ থেকে একশো পাউণ্ডে। মুখ আর বুকের পানি মুছিয়ে দিল সহকারীরা, উদাস চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কিং। হঠাৎ তীব্র একটা খিদেয় মোচড় দিয়ে উঠল তার পেট। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য—স্যাণ্ডেল দুলছে জয়-পরাজয়ের মাঝখানে। মাত্র এক ফালি মাংস পেলেই প্রয়োজনীয় পাঞ্চটা সে মারতে পারত আরও খানিকটা জোরে। নকআউট হয়ে যেত স্যাণ্ডেল। তার পরাজয়ের মূলে রয়েছে সেই এক ফালি মাংস।

রিংয়ের দড়ি পার হবার সময় সাহায্য করতে চাইল সহকারীরা। ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে দিল কিং, লাফিয়ে নামল রিং থেকে। ভিড় সরিয়ে পথ করে দিল সহকারীরা। বড় হল পেরিয়ে রাস্তায় নামতে যাবে, এগিয়ে এল এক তরুণ।

'হাতে পেয়েও স্যাণ্ডেলকে পরাজিত করতে পারলেন না কেন?' জানতে চাইল সে।

'জাহান্নামে যা!' খেঁকিয়ে উঠল টম কিং।

রাস্তার মোড়ে যেতে হঠাৎই খুলে গেল পাবলিক হাউসটার দরজা। হাসিতে ঝলমল করছে বারমেইডদের মুখ। ক্রেতাদের মাঝে জোর আলোচনা চলছে সদ্য সমাপ্ত লড়াইয়ের। কে যেন প্রস্তাব দিল মদ্যপানের। এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় দুলল টম কিং, তারপর প্রত্যাখ্যান করে এগোল আবার সামনে।

একটা পেনিও এখন আর তার পকেটে নেই, বাড়ির এই দু'মাইল রাস্তা মনে হচ্ছে বড় বেশি দীর্ঘ। সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সে। আরও খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ একটা বেঞ্চে বসে পড়ল টম কিং। লড়াইয়ের ফলাফল জানার অপেক্ষায় বসে আছে স্ত্রী, ভাবতেই ভীষণ একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরল তাকে। সবচেয়ে কঠিন নকআউটও যেন ওই প্রশ্নের জবাব দেয়ার তুলনায় অনেক সোজা।

দুর্বলতা আর যন্ত্রণা অনুভব করল সে। গাঁটগুলো যেভাবে ব্যথা করছে, মজুরের কাজ পেলেও অন্তত এক সপ্তাহের মধ্যে কোনও গাঁইতি বা বেলচার হাতল ধরা তার পক্ষে অসম্ভব। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা। খাবার চাই—খাবার। চরম দুর্দশা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, চোখজোড়া ভিজে উঠল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। দু'হাত তুলে মুখ ঢাকল টম কিং। কাঁদতে কাঁদতে তার মনে পড়ল সেই বুড়ো মুষ্টিযোদ্ধার কথা। বেচারি স্টাউসার বিল! হাউমাউ করে কেঁদেছিল সে ড্রেসিং-রুমে। স্টাউসার বিলের কান্নার পুরো অর্থ টম কিং উপলব্ধি করল এতদিনে।

মূল: জ্যাক লণ্ডন
রূপান্তর: খসরু চৌধুরী

ছবি-রহস্য

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁচের পাত্রটার দিকে তাকিয়ে আছে হোমস, যেন দুনিয়ার কোনওদিকে খেয়াল নেই তার। কী এক রাসায়নিক পদার্থ ফুটছে ওটাতে, দুর্গন্ধে গুলিয়ে উঠল আমার গা। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে যাব, এমন সময় হোমস বলে উঠল, 'তা হলে ওয়াটসন, দক্ষিণ আফ্রিকার শেয়ার বাজারে তুমি টাকা খাটাচ্ছ না?'

'তুমি জানলে কী করে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এ সম্পর্কে তোমাকে তো আমি কিছু বলিনি!'

আমার দিকে ঘুরল সে। হাতে কাঁচের নল, ধোঁয়া উঠছে তা থেকে। হেসে, মাথা নেড়ে সে বলল, 'তা হলে স্বীকার করছ, অবাক করে দিয়েছি তোমাকে?'

'হ্যাঁ, করছি।'

'তা হলে কাগজে লিখে সই করে দাও।'

'কেন?'

'ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেই বলবে, আরে এ তো পানির মত সহজ।'

হেসে ফেললাম আমি। 'না-না, বল তুমি, তেমন কিছু বলব না।'

'তোমার বাঁ হাতের তর্জনী,' উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে বলতে শুরু করল হোমস, 'আর বুড়ো আঙুলের মাঝের ফাঁকটুকু

দেখেই বুঝতে পেরেছি, তোমার সামান্য সঞ্চয় তুমি সোনার খনিতে খাটাতে সাহস পাচ্ছ না।'

'আঙুলের ফাঁকের সঙ্গে টাকা খাটানোর কী সম্পর্ক? নাহ্, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আছে, খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দুই ঘটনার মাঝখানের সূত্রগুলো ধরিয়ে দিলেই পানির মত সহজ হয়ে যাবে।

'এক নম্বর, গতরাতে তুমি ক্লাব থেকে ফিরলে, তোমার বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ফাঁকে চকের দাগ ছিল।'

'হ্যাঁ, তাতেই বা কী?'

'আঃ, শোনই না সব। দুই নম্বর, বিলিয়ার্ড স্টিকটা ঠিক রাখার জন্যে তুমি চকটা ওখানটাতেই রাখ। তিন, থার্স্টন ছাড়া আর কারও সঙ্গে তুমি বিলিয়ার্ড খেল না। চার, মাসখানেক আগে তুমি আমাকে বলেছিলে, থার্স্টন দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনিতে টাকা খাটাতে চায়। তুমিও ওর পার্টনার হতে চাও। এর মেয়াদ শেষ হতে তখন মাসখানেক বাকি ছিল। পাঁচ হলো, তোমার চেক বই আমার ড্রয়ারে তালা দেয়া আছে। এবং বেশ কিছু দিন হলো তুমি চাবিটা আমার কাছ থেকে নাওনি। তা হলে কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে, তুমি টাকা খাটাতে রাজি নও?'

'উঃ, হোমস!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'সত্যিই কি সহজ!'

'হুঁ, তা তো বলবেই,' গম্ভীর হবার ভান করল সে। 'বুঝিয়ে দেবার পর সব সমস্যাই পানির মত সহজ মনে হয়। তা আরেকটা ধাঁধা দিচ্ছি, উত্তর বের কর। আমি এর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না,' বলে এক চিলতে কাগজ টেবিলের ওপর মেলে ধরল সে।

তাতে কার্টুনের মত করে আঁকা কিছু নাচুনে মূর্তির ছবি।

'এ তো কোনও বাচ্চার আঁকিবুঁকি বলে মনে হচ্ছে,' তাচ্ছিল্য

ভরে বললাম আমি।

'ও, তোমার বুঝি তাই মনে হলো?'

'কেন, এ ছাড়া কিই-বা হতে পারে?'

'মি. হিলটন কিউবিট অন্য কিছু ধারণা করছেন। রিডলিং থোর্প ম্যানর থেকে চিঠি সহ এই কাগজটা আজকের প্রথম ডাকে এসেছে। ভদ্রলোকও আজই আসবেন।'

হোমসের কথা শেষ না হতেই কলিংবেল বেজে উঠল।

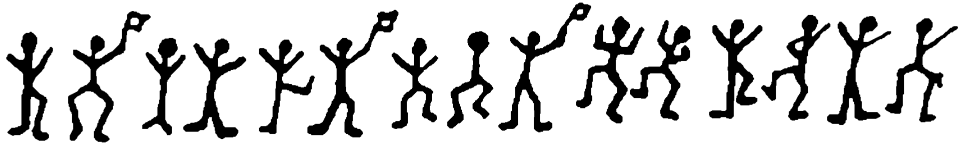
'এসে গেছে বোধহয়,' বলল হোমস।

সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকল বিশালদেহী এক ভদ্রলোক। টকটকে গায়ের রং, ঝকঝকে স্বচ্ছ চোখ আর নিখুঁতভাবে কামানো চিবুক। পরিষ্কার বোঝা গেল আমাদের বেকার স্ট্রীটের কুয়াশা ঘন এই জঘন্য পরিবেশের সঙ্গে ওর কোনোই সম্পর্ক নেই। পূর্ব উপকূলের তাজা বাতাস নিয়েই যেন সে ভিতরে ঢুকল। আমাদের সঙ্গে করমর্দনের পালা শেষ করে চেয়ারে বসল সে। তারপর টেবিলের কাগজটাতে চোখ পড়তেই অস্বস্তি ভরে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পারলেন, মি. হোমস? শুনেছি, যত জটিল আর অদ্ভুত সব রহস্য আপনি পছন্দ করেন। এরচেয়ে বিদঘুটে ধাঁধা নিশ্চয়ই আপনি আগে দেখেননি, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' নড়েচড়ে বসল হোমস। 'দেখে মনে হয় বাচ্চাদের দুষ্টুমি করে আঁকা ফালতু ছবি। খুদে কার্টুন মার্কা মানুষ নাচতে নাচতে চলেছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। বৈশিষ্ট্যহীন। আপনি এটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন, মি. কিউবিট?'

'গুরুত্ব আমি দিচ্ছি না। দিচ্ছে আমার স্ত্রী। ভয়ে বেচারি আধমরা হয়ে গেছে। মুখ ফুটে কিছু বলছে না ঠিকই। তবে আমি স্পষ্ট দেখছি ওর চোখে আতঙ্ক। তাই...'

কাগজটা আবার আলোয় মেলে ধরল হোমস। স্কুলের খাতা থেকে ছিঁড়ে নেয়া একটা পাতা। পেন্সিলে আঁকা ছবিগুলো ঠিক এমন—



বেশ খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখার পর সযত্নে কাগজটা ভাঁজ করে পকেট বুকে রেখে হোমস বলল, 'ঘটনাটা কি খুলে বলবেন, মি. কিউবিট?'

'নিশ্চয়ই। তবে আগেই বলে রাখছি, আমি কিন্তু গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। কাজেই বুঝতে অসুবিধে হলে জিজ্ঞেস করবেন আমাকে। গত বছর, মানে আমাদের বিয়ের সময় থেকেই শুরু করি। ধনী না হলেও, রিডলিং থোর্পে আমরা পাঁচশো বছরের পুরনো। নরফোকের সবাই এক ডাকে চেনে আমাদের।

'জুবিলি উৎসব উপলক্ষে গত বছর লণ্ডন গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম রাসেল স্কোয়ারের একটা মেসে। ওখানেই পরিচয় হয় এলসি প্যাট্রিকের সাথে। আশ্চর্য সুন্দরী এক আমেরিকান তরুণী। গভীরভাবে ভালবেসে ফেললাম ওকে। মাসখানেকের মধ্যে রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে করে ওকে নিয়ে চলে এলাম নরফোকে। ভাবছেন, সম্ভ্রান্ত বংশের একজন পুরুষ হয়ে মেয়েটির অতীত জীবন কিংবা সামাজিক অবস্থান না জেনে কী করে বিয়ে করলাম। আসলে মুখে আর কী বলব, ওকে দেখলে, আলাপ করলেই বোঝা যায়। আমি কোনও ভুল করিনি।

'এলসি খুব সরল, অকপট। কিছুই লুকোয়নি আমার কাছে। বিয়ের আগে আমাকে সরাসরি বলেছিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল সে। তাতে ভীষণ মানসিক কষ্টে

ভুগেছে। ও সব ভুলতে চায়। বলেছিল, ওর ব্যক্তিগত চরিত্রে কোনও কলঙ্ক নেই। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল আমাকে, ওর অতীত নিয়ে যেন কোনও প্রশ্ন না তুলি। অবশ্য এ-ও বলেছিল, শর্ত কঠিন মনে হলে ফিরে যেতে। ওর শর্ত মেনে নিয়েছিলাম আমি এবং আজ পর্যন্ত আমি আমার কথা রেখেছি।

'বিয়ের পর এক বছর কেটে গেছে। সত্যি বলছি, মি. হোমস, দাম্পত্য জীবনে আমরা খুবই সুখী। কিন্তু মাসখানেক হলো, অশান্তির কালো ছায়া ঘিরে রেখেছে আমাদেরকে। আমেরিকা থেকে একটা চিঠি এল, এবং সেই থেকেই শুরু। ওটা পড়েই ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। তারপর চিঠিটা দুমড়ে-মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ফায়ারপ্লেসের আগুনে। এ সম্পর্কে একটা কথাও বলল না আমাকে। প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। এরপর থেকেই কেমন জানি হয়ে গেল সে। সারাক্ষণই উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। জোরে একটু শব্দ হলেও চমকে ওঠে। যেন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার অপেক্ষাতে রয়েছে। নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারত আমার ওপর। অতীতে যাই ঘটে থাকুক, তবু ওর সততা সম্পর্কে একবিন্দু সন্দেহ আমার নেই, মি. হোমস। আমার বংশ কলঙ্কিত হোক কিংবা আমার কোনও ক্ষতি হোক, এমন কিছুই এলসি করতে পারে না; এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

'সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটেছে সপ্তাহখানেক আগে। এক মঙ্গলবারে ঘরের জানালার চৌকাঠে এই ধরনের কিছু ছবি দেখতে পাই, চক দিয়ে আঁকা। ভাবলাম, কাজের ছেলেটা করেছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতেই সে কসম কেটে অস্বীকার করল। যা হোক, নিজহাতে আমি মুছে দিলাম ওগুলো। এটা এলসিকে বলতেই ও যেন কেঁপে উঠল। মুহূর্তে সামলে নিয়ে অনুনয় করে আমাকে বলল, এমন কোনও ছবি দেখলে যেন ওকে অবশ্যই দেখাই। এক

সপ্তাহের মধ্যে আর এমন কোনও ছবি-টবির দেখা পেলাম না। মাত্র গতকাল পেলাম একটা কাগজ। বাগানের সূর্য-ঘড়িটার ওপর পড়ে ছিল। এলসিকে দেখাতেই সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এরপর থেকে আর সে কোনওমতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। আর থেকে থেকে আতঙ্কে শিউরে উঠছে। ওর এই অবস্থা দেখে একটা চিঠি লিখে কাগজটা পাঠিয়ে দিলাম আপনার কাছে। এটা নিয়ে পুলিশের কাছে গেলে হেসেই অস্থির হত তারা। এলসির জন্যে আমি সব করতে পারি, মি. হোমস। ওর ভালর জন্য আমি শেষ পয়সাটিও বিসর্জন দিতে রাজি আছি।' এতক্ষণ তন্ময় হয়ে আমরা শুনছিলাম ভদ্রলোকের কাহিনি। শেষ হবার পরও খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল হোমস। আমি তো ভদ্রলোকের পত্নী-প্রেম দেখে একেবারে মুগ্ধ।

'আচ্ছা, মি. কিউবিট, আপনি সরাসরি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেও তো দেখতে পারেন,' হঠাৎ বলল হোমস। 'এই পরিস্থিতিতে আপনাকে তার সব খুলে বলা উচিত।'

'তা আমি পারব না, মি. হোমস। প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। ও নিজ থেকে বললে অবশ্যই ভাল হত। নিজের যুক্তি অনুযায়ী চলার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আমার আছে, কী বলুন?'

'অবশ্যই। এ ব্যাপারে আপনি আমার আন্তরিক সহযোগিতা পাবেন, মি. কিউবিট। আচ্ছা, আপনার বাড়ির আশপাশে কি কোনও অচেনা লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন?'

'না। আমাদের এলাকাটা খুবই নিরিবিলি। নতুন মুখ দেখলে অবশ্যই মনে থাকত।'

'এই ছবিগুলোর নিশ্চয়ই কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। কিন্তু এটা এত সংক্ষিপ্ত যে, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনার কথা থেকেও এমন কিছু পেলাম না যার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু

করতে পারি। জানালার আঁকগুলো দেখতে পেলেও একটা কাজ হত। ঠিক আছে, আপনি নরফোকে ফিরে যান। আশপাশে নজর রাখবেন। এমন ছবি, কোথাও দেখতে পেলে সাথে সাথে নকল করে পাঠিয়ে দিবেন আমার কাছে। কোনও নতুন মুখ আপনার এলাকায় দেখলে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিবেন। কিছু ঘটার সম্ভাবনা দেখলে সোজা চলে আসবেন আমার এখানে। প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেই চলে যাব আপনার বাড়িতে।'

নাচুনে মূর্তির ব্যাপারটা হোমসকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে, বুঝতে পারলাম। প্রায়ই কাগজটা বের করে গভীর মনোযোগের সাথে দেখে সে। এটা নিয়ে গবেষণা করতে তার প্রায় পনেরো-ষোলো দিন কেটে গেল। অথচ এ সম্পর্কে সে একটি কথাও বলল না আমাকে।

একদিন বাইরে বেরুনোর মুহূর্তে সে ডাকল আমাকে। বাইরে যেতে নিষেধ করল। সেই নাচুনে মূর্তির উৎস মি. হিলটন কিউবিট নাকি আসবে। আজ সকালেই এসেছে তার টেলিগ্রাম। হোমসের ধারণা, নরফোকে সাংঘাতিক কোনও ঘটনাই ঘটেছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। এসে পড়ল লোকটা। তার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। একেবারে ভগ্নদশা। কপালে ভাঁজ, চোখের কোণে কালি পড়েছে। সমস্ত শরীরে তাঁর ক্লান্তি আর উদ্বিগ্নতার ছাপ।

'আমি আর পারছি না, মি. হোমস,' বলে এলিয়ে পড়ল সোফাতে। 'অজানা শত্রু আমার চারপাশে এঁকেই চলেছে বিদঘুটে এই ছবি। আর তাই দেখে তিল তিল করে মরণের পথে এগোচ্ছে আমার স্ত্রী। কত আর সহ্য হয় বলুন? স্পষ্ট দেখছি, তিলে তিলে নিজেকে ধ্বংস করছে এলসি।'

'এর পরও উনি কিছু জানাননি আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল

হোমস।

'না। কিছু যেন বলতে গিয়েও থেমে যায়। ওর ভয় ভাঙানোর অনেক চেষ্টা করেছি। পারিনি।'

'আপনি নিজে নিশ্চয়ই খবর-টবর কিছু সংগ্রহ করেছেন?'

'হ্যাঁ। নতুন আঁকা কয়েকটা ছবিও এনেছি। লোকটাকেও দেখেছি।'

'ছবি আঁকা লোকটাকে দেখেছেন?' উত্তেজিত হয়ে উঠল হোমস।

'হ্যাঁ, আঁকার সময় দেখেছি। পুরো ঘটনাটা আপনাকে বলছি। আপনার এখান থেকে যাবার পরদিনই দেখলাম যন্ত্রপাতি রাখার কালো দরজায় আরেক দল নাচিয়ে মূর্তি। চক দিয়েই আঁকা। আপনার কথামত ওগুলো কাগজে তুলে এনেছি,' বলে সে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ টেবিলের ওপর রাখল।

'বাহ্, চমৎকার!' খুশি হলো হোমস। জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'ছবিটা তুলে নেয়ার পর মুছে ফেললাম। দু'দিন পর সেই একই জায়গায় আবার দেখলাম। এই যে সেগুলোও এনেছি।' হোমসের দিকে বাড়িয়ে দিল সে কাগজগুলো।

'মালমশলা দেখি ভালই জোগাড় করেছেন,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল হোমস।

'এর তিন দিন পর সূর্য-ঘড়ির ওপর নুড়ি চাপা দেয়া এই কাগজটা পেলাম। সেই একই রকম। তখনই ঠিক করলাম, এবার পাহারা দেব। রিভলভার নিয়ে পড়ার ঘরের জানালা থেকে নজর রাখতে শুরু করি। ওখান থেকে লন আর বাগান স্পষ্ট দেখা যায়। এক রাতে ঘর অন্ধকার করে বসে পাহারা দিচ্ছি। বাইরেটা চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। রাত তখন দুটোর মত হবে। হঠাৎ

পায়ের শব্দে চমকে তাকালাম, ঘরে ঢুকল আমার স্ত্রী। ঘুমোবার জন্যে বারবার করে অনুরোধ করল আমাকে। একটু রুক্ষ স্বরেই ওকে বললাম, "বদমাশটা কে আমি দেখতে চাই।"

'এলসি বলল, "প্লীজ, মাথা গরম কোরো না। নিশ্চয় কেউ ঠাট্টা করে করছে এসব। আর যদি ব্যাপারটা তোমার কাছে অসহ্য মনে হয়, তা হলে চল না কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি।"

"না, তা যাব না আমি," কঠোর ভাবে বললাম। "ঠাট্টা-কৌতুকের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালানটা গাধামি হবে।"

'এলসি বলল, "ঠিক আছে, এখন তা হলে শুতে যাই চল। কাল বরং কথা বলব এ সম্পর্কে," বলতে বলতে সে শক্তভাবে চেপে ধরল আমার হাত। এরপর কাঁপতে শুরু করল। ঝট করে বাইরে তাকালাম আমি। যন্ত্রপাতি রাখার ঘরের কাছটাতে কী যেন নড়ে উঠল। খেয়াল করে দেখতেই বুঝলাম একজন মানুষের ছায়ামূর্তি ওটা। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ওটা দরজার সামনে বসল গুড়ি মেরে। রিভলভারটা তাক করে ছুটে বাইরে যেতে চাইলাম। প্রাণপণ শক্তিতে আমাকে জাপটে ধরল এলসি। ঝটকা মেরে সরাতে চাইলাম ওকে, পারলাম না। শেষে যখন নিজেকে মুক্ত করতে পারলাম, ততক্ষণে পালিয়ে গেছে শয়তানটা। তবে এঁকে রেখে গেছে সেই একই নাচুনে মূর্তি। টুকে নিলাম। আশপাশে অনেক খোঁজাখুঁজিও করলাম কিন্তু ওর টিকিও দেখতে পেলাম না। অবাক কাণ্ড কী জানেন? ও ঘাপটি মেরে ছিল কোথাও। কারণ সকালে ওগুলোর পাশে দেখতে পেলাম আরও নতুন কিছু মূর্তি।'

'সবই টুকে এনেছেন তো?' আগ্রহী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হোমস।

'অবশ্যই। ওই কাগজগুলোর মধ্যেই সব আছে।'

'খুব ভালো করেছেন। সাংঘাতিক জরুরী এগুলো। হ্যাঁ, এবার শুনি আপনার কাহিনির বাকি অংশটুকু!'

'আর বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে সেদিন রাতে এলসির ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। ও ওভাবে আমাকে আটকে না দিলে ব্যাটা উল্লুককে আমি ঠিকই ধরতে পারতাম।'

'কেন সে এ-কাজ করল, জিজ্ঞেস করেননি?'

'করেছি। আমার বিপদের ভয়েই নাকি করেছে।'

'আপনার কি তাই ধারণা?'

'আমার ধারণা ঠিক এর উল্টো। লোকটার ক্ষতির ভয়েই সে আমাকে আটকে ছিল। ওই মুহূর্তে আরও মনে হয়েছিল, লোকটাকে এবং তার আঁকা ছবিগুলো সম্পর্কে সব জানে এলসি। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, মি. হোমস, ওর কণ্ঠস্বর আর চাউনিতে এমন করুণ আকুতি আমি দেখেছিলাম, যে ওর সম্পর্কে অমন ধারণা করার জন্যে পরে সত্যিই অনুতপ্ত হলাম। ওর দ্বারা আমার কোনও ক্ষতি হওয়া অসম্ভব।

'এখন আমার ইচ্ছে, খামারের কিছু লোকজন দিয়ে পাহারা বসিয়ে বাঁদরটাকে ধরে ধোলাই দিই।'

'এতে আপনার সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার মনে হয় না।' একটু চুপ থেকে আবার জিজ্ঞেস করল হোমস, 'আজ কি আপনি লণ্ডনে থেকে যাবেন?'

'নাহ, ফিরতেই হবে আমাকে। এলসিকে একা রাখা ঠিক হবে না। সে-ও অবশ্য ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেছে।'

'ঠিক আছে। দু'চার দিনের মধ্যে নরফোকে আমরাও যাব।'

হিলটন কিউবিট বেরিয়ে যেতেই কাগজগুলো নিয়ে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল হোমস। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। ওর

দেখা, লেখা কোনটাই যেন শেষ হতে চায় না। পাশে বসে থাকলেও আমার অস্তিত্ব সে সম্পূর্ণ ভুলে গেল। কাজের মধ্যে গুনগুন গান আর শিস দিতে দেখে বুঝলাম, ফলাফল সন্তোষজনকই। ঝাড়া দু'ঘণ্টা পর সোল্লাসে সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। খানিকক্ষণ ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পায়চারি করল। আবার চেয়ারে বসে লিখতে শুরু করল। লেখা শেষ করে সে তাকাল আমার দিকে।

বলল, 'বুঝলে ওয়াটসন, এটি একটি টেলিগ্রাম। এর জবাব যদি আশানুরূপ হয়, তা হলে তুমি আরেকটি গল্পের প্লট পাবে। দারুণ ইন্টারেষ্টিং গল্প। রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে হয়তো কালই আমাদের নরফোকে হানা দিতে হতে পারে।'

কৌতূহলে ফেটে যাচ্ছি আমি। তবু ভাল করেই জানি, সময় না হলে অথবা স্বেচ্ছায় হোমস না বললে, একটা শব্দও বের করতে পারব না ওর পেট থেকে। সুতরাং ধৈর্য ছাড়া গতি নেই।

অধীর প্রতীক্ষায় কেটে গেল দুটো দিন। দ্বিতীয় দিন সন্ধে বেলায় এক সঙ্গে টেলিগ্রামের জবাব এবং মি. কিউবিটের একটা চিঠি এল। আবার সেই নাচুনে মূর্তি।

টেলিগ্রামটা পড়ে এবং নাচনে মূর্তিগুলো খুঁটিয়ে দেখে অস্থির হয়ে উঠল হোমস। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'ওঃ ওয়াটসন, এতদিন দেরি করে ভীষণ ভুল করেছি। দেখ তো নর্থ ওয়ালস্যামের কোনও ট্রেন আজ রাতে আছে কিনা?'

সময় সূচীতে দেখলাম, শেষ ট্রেনটা চলে গেছে এই মাত্র।

'আগামীকালের প্রথম ট্রেনটাই আমরা ধরব,' বলল হোমস। 'খবর দুটো পেয়ে, বুঝেছ ওয়াটসন, ভারি অস্থিরতাবোধ করছি। এটাকে যতটা ছেলেমানুষি ভেবেছিলাম, ততটা তো নয়ই, বরং বিপজ্জনক। ভদ্রলোক ভয়ঙ্কর এক বিপদের জালে জড়িয়ে

পড়েছেন।'

শেষ পর্যন্ত চরম ভয়ঙ্কর ব্যাপারই ঘটে গেল। এমন একটা ফালতু ব্যাপারে যে এত ভয়াবহ পরিণতি লুকিয়ে ছিল, তা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। আমার পাঠক-পাঠিকাকে মধুর পরিসমাপ্তি উপহার দিতে পারলে সত্যিই খুশি হতাম আমি।

নর্থ ওয়ালস্যামে নেমে স্টেশন মাস্টারকে আমাদের গন্তব্য জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা? লণ্ডন থেকে এসেছেন, তাই না?'

'আপনার এমন ধারণা হবার কারণ?' বিরক্ত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল হোমস।

'না, মানে, একটু আগেই নরউইচ থেকে ইন্সপেক্টর মার্টিন ওখানে গিয়ে পৌঁছেছেন তো, তাই ভাবলাম। ভদ্রমহিলা এখনও মারা যাননি। না মরলেও খুব একটা লাভ তার হবে না। স্বামী হত্যার অপরাধে ফাঁসিতে ওকে ঝুলতেই হবে।'

'কী ঘটেছে রিডলিং থৌর্প ম্যানরে?' উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হোমস।

'ব্যাপার খুবই ঘোরাল রে ভাই,' রসিয়ে রসিয়ে বলতে শুরু করল স্টেশন মাস্টার। 'ও বাড়ির চাকরের কাছেই সব শুনলাম। মিসেস কিউবিট গুলি করে প্রথমে স্বামীকে হত্যা করেন। তারপর ওই একই রিভলভারের গুলিতে নিজেও আত্মহত্যা করার চেষ্টা চালান। আহা, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এতবড় বনেদি বংশের সম্মান আজ পথের ধুলোয় লুটিয়ে গেল।'

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ভাড়াটে গাড়িতে চেপে বসলাম আমরা। পথে একটি কথাও বলল না হোমস।

ভীষণ মুষড়ে পড়েছে বেচারি। অহেতুক দেরি করার জন্য হয়তো নিজেকেই দোষী করছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।

চারপাশে অপরূপ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য; তবু কোনওদিকেই নজর নেই ওর। কোনও ভাবনার জগতে যেন তলিয়ে গেছে সে। পথের দু'পাশে সারি সারি গাছ। দূরে গাঢ় সবুজ মাঠ। মাঝে মাঝে ছোট্ট কুটির আর পুরাকালের অ্যালিয়েন ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে গির্জার উঁচু উঁচু চূড়া। এক সময় ছবির মত ভেসে উঠল সমুদ্রের সেই বেগুনে সৈকত রেখা। অদ্ভুত সুন্দর নরফোকের এই শ্যামলী উপকূল। ঘন সবুজের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ইঁট-কাঠের কারুকাজ করা পুরানো আমলের দুটি খিলান। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কোচোয়ান বলল, 'ওই, ওটাই রিডলিং থোর্প ম্যানর।'

গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকতেই চোখে পড়ল, অদ্ভুত এই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত সেই যন্ত্রপাতি রাখার ঘর আর উঁচু বেদীওলা সূর্য-ঘড়িটা। পাশেই টেনিস কোর্ট। বেঁটেখাটো চটপটে চেহারার এক লোক আমাদের দেখেই এগিয়ে এল। তার বড় গোঁফের ডগা মোম দিয়ে পাকানো। ভদ্রলোক নিজেই সাড়ম্বরে নিজের পরিচয় দিলেন, নরফোক কন্সট্যাবিউলারির ইন্সপেক্টর মার্টিন। শার্লক হোমসের নাম শুনেই চুপসে গেলেন তিনি।

অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. হোমস, খুন হয়েছে রাত তিনটায়, লণ্ডনে বসে তাড়াতাড়ি আপনি খবর পেলেন কী করে?'

'এমন একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। সে জন্যেই এখানে আসা। তবে এত তাড়াতাড়ি যে ঘটে যাবে আশা করিনি।'

'আপনি দেখি অনেক খবরই রাখেন, মি. হোমস,' একটু খোঁচা দিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর।

'খবর বলতে তো শুধু একটাই পেয়েছি। তা ওই নাচুনে মূর্তি,' গম্ভীরভাবে বলল হোমস। 'আর তাতেই বুঝেছি অনেক

কিছু।'

'নাচুনে মূর্তি! সেটা আবার কী?'

'পরে বলব। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। খুনটা ঠেকাতে পারলাম না বলে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। এখন পুরো ব্যাপারটার যাতে যথাযথ ব্যাখ্যা এবং সুবিচার হয়, তার ব্যবস্থা করতে চাই আমি। তদন্তে কি আপনি আমার সহযোগিতা চান, নাকি নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে চান, আগে এটা জানতে চাই!'

'আপনার সাথে কাজ করতে পারলে খুশি হব, মি. হোমস,' আন্তরিকভাবে বললেন ইন্সপেক্টর মার্টিন।

'তা হলে চলুন সাক্ষ্য-প্রমাণের কাজটা আগে সেরে ফেলি,' বলল হোমস। 'তারপর বাড়িটা ঘুরে দেখা যাবে।'

বুদ্ধিমান ইন্সপেক্টর বুঝলেন হোমস থাকতে তার করণীয় কিছুই নেই। হোমসকে তিনি খুশিমত কাজ করতে দিয়ে নিজে শুধু ফলাফল টুকুই টুকে নিতে থাকলেন।

আমাদের আসার খবর পেয়ে মিসেস কিউবিটের কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ সার্জন। জানালেন, মিসেস কিউবিট গুরুতর আহত হলেও বাঁচার সম্ভাবনা আছে। জ্ঞান এখনও ফেরেনি। ফিরতে দেরি হবে। ভদ্রমহিলাকে গুলি করা হয়েছে নাকি নিজেই আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে খুব কাছ থেকে। ঘরের মেঝেয় পাওয়া গেছে রিভলভার। ওটার দুটো ঘর খালি। মি. কিউবিটের হৃৎপিণ্ড এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে।'

'মি. কিউবিটের মৃতদেহ কি সরান হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল হোমস।

'না। মিসেস কিউবিটকে শুধু তার ঘরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া কিছুতেই হাত দেয়া হয়নি,' বললেন ডাক্তার। 'আহত

ব্যক্তিকে তো আর ওভাবে ফেলে রাখা সম্ভব নয়।'

'না। ঠিকই করেছেন। আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব, আপনি কখন এসেছেন এ বাড়িতে?'

'ভোর চারটায়।'

'আর কেউ আছে এখানে?'

'একজন কন্সটেবল আছে।'

'আপনাকে ডেকে এনেছিল কে?'

'স্যাণ্ডার। এ বাড়ির পরিচারিকা।'

'ঘটনাটা কি সে-ই প্রথমে দেখেছিল?'

'রাঁধুনী মিসেস কিং আর সে।'

'ওরা এখন কোথায়?'

'বোধহয় রান্নাঘরেই আছে।'

'ইন্সপেক্টর, ওদের ডেকে পাঠান,' ইন্সপেক্টরকে বলল হোমস।

উঁচু উঁচু জানালা আর কড়িকাঠের দেয়ালওলা হলঘরটাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অস্থায়ী দপ্তর হিসেবে বেছে নিল হোমস।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় হোমস আর আমি ছাড়াও উপস্থিত রইলেন ইন্সপেক্টর মার্টিন, ডাক্তার আর স্থানীয় একজন কন্সটেবল।

জেরার জবাবে একই কাহিনি শোনাল মহিলা দুজন। পরপর দুটো গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় দুজনেরই। পাশাপাশি ঘরে ঘুমোয় তারা। মিসেস কিংই প্রথম স্যাণ্ডারের ঘরে ছুটে আসে। দু'জনেই একসাথে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, পড়ার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভিতরে টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে। মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন মি. কিউবিট। জানালার সামনে, দেয়ালের কাছটাতে পড়ে আছেন মিসেস কিউবিট। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘরের মেঝে। ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে দম বন্ধ করা অবস্থা। দু'জনেই জোর দিয়ে বলল, জানালাটা

ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল। সাথে সাথে তারা থানায় এবং ডাক্তারকে খবর দেয়। এমনটি কেন ঘটল তারা কল্পনা করতে পারছে না। মি. এবং মিসেস কিউবিটকে তারা কখনোই ঝগড়া করতে দেখেনি। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল খুবই সুখের, গভীর দুঃখ সহকারে জানাল তারা। ডাক্তার এসে দুজনকে পরীক্ষা করে দেখার পর মিসেসকে শোবার ঘরে নিয়ে যেতে বলেন।

ইন্সপেক্টর মার্টিনও এসে সব ঘরের জানালা ভিতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। অর্থ দাঁড়াল, কেউ বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকেনি কিংবা ভিতর থেকে বাইরে যায়নি।

'মহিলা দুজন নীচে নেমে বারুদের গন্ধ পায়। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, ইন্সপেক্টর, পয়েন্ট আউট করুন,' বলল হোমস। 'চলুন, এবার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখি।'

পড়ার ঘরটা মাঝারি আকারের। তিন পাশের দেয়ালের তাক বইয়ে ঠাসা। টেবিলের সামনে জানালা। স্পষ্ট দেখা যায় বাগানটা। প্রথমেই দৃষ্টি চলে গেল রক্তে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মি. কিউবিটের বিশাল শরীরের দিকে। অবিন্যস্ত রাতের পোশাক দেখে, মনে হলো বেচারা দ্রুত বিছানা থেকে উঠে এসেছিলেন। গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে সামনে থেকে। সাথে সাথেই যে মারা গেছেন তা দেখেই বোঝা গেল।

'গুলিটা ওর দেহের ভেতরেই আছে,' বললেন ডাক্তার। 'ওর হাতে কিংবা পোশাকে কোথাও বারুদের চিহ্ন নেই। মিসেস কিউবিটের মুখে বারুদের চিহ্ন থাকলেও, হাতে নেই।'

'চিহ্ন থাকা না থাকা দিয়ে কিছুই প্রমাণিত হয় না,' হোমস বলল। 'ইন্সপেক্টর, মৃতদেহটা এখন সরান যেতে পারে।'

'ডাক্তার সাহেব, মিসেস কিউবিটের গুলিটাও নিশ্চয় ভিতরেই আছে?' ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল হোমস।

'হ্যাঁ। বড় ধরনের অস্ত্রোপচার করে বের করতে হবে ওটা। মাথা তো। এখানে সম্ভব নয়। রিভলভারে গুলি রয়েছে চারটা,' এরপর মিনমিন করে বলতে শুরু করলেন ডাক্তার, 'অর্থাৎ ছোঁড়া হয়েছে দুটো! ক্ষতচিহ্নও দুটো। কাজেই অনুমান করা খুবই সহজ যে...

'থামুন, থামুন, ও হিসেব আর দিতে হবে না,' ডাক্তারকে বাধা দিল হোমস। 'বরং জানালায় যে গুলিটা লেগেছে সেটার হিসাব দিন, ডাক্তার সাহেব।'

হোমসের কথায় ঝট করে তার দিকে ফিরে তাকালাম সবাই। আঙুল তুলে দেখাল সে, জানালার চৌকাঠ থেকে ছয় ইঞ্চি মত ওপরে একটা পরিষ্কার ফুটো।

'হায় ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠলেন ইন্সপেক্টর। 'আপনি ঠিকই দেখতে পেলেন অথচ আমাদের কারও চোখেই পড়ল না!'

'আমি যে এটাই খুঁজছিলাম।'

'আশ্চর্য!' অবাক কণ্ঠে বললেন ডাক্তার। 'তা হলে গুলি ছোঁড়া হয়েছে তিনটা। তারমানে, লোক ছিল তিনজন। কে সেই তৃতীয় ব্যক্তি, মি. হোমস? আর কী করেই বা সে এখান থেকে হাওয়া হলো?'

'সেটাই বের করতে হবে,' রহস্যময় হাসি হেসে বলল হোমস। 'মহিলা দুজন বেরিয়েই যে বারুদের গন্ধ পেয়েছিল, পয়েণ্ট আউট করতে বলেছিলাম মনে আছে, মি. মার্টিন?'

'আছে। কিন্তু এতেও তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সহজ। গুলি ছোঁড়ার সময় পড়ার ঘরের দরজা-জানালা সবই খোলা ছিল। না হলে ধোঁয়া বারুদের গন্ধ এত দ্রুত বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারত না। অবশ্য জানালাটা খোলা হয়েছিল খুব অল্প সময়ের জন্য।'

'এ ধারণার পক্ষে কি কোনও প্রমাণ আছে?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'নিশ্চয়ই, জানালা খোলা থাকলে মোমবাতি নিভে যেত বাতাসে।'

'তাই তো! সত্যি, মি. হোমস, আপনার বুদ্ধির কোনও তুলনা নেই।'

'দুর্ঘটনার সময় জানালা খোলা ছিল, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরই আমি ধরে নিলাম, তৃতীয় কোনও ব্যক্তি ছিল, যে খোলা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়েছে। সেই থেকে খুঁজতে শুরু করলাম তৃতীয় কোনও চিহ্ন। পেয়েও গেলাম।'

'কিন্তু জানালাটা ভিতর থেকে বন্ধ করল কে?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'মিসেস কিউবিট,' বলে টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল হোমস, 'আরে, এটা আবার কী? মনে তো হচ্ছে মেয়েদের হাতব্যাগ।'

কুমিরের চামড়ার ওপর রুপোর কারুকাজ করা হাতব্যাগটি খুলে টেবিলের ওপর উপুড় করে দিল হোমস। মোড়ানো বিশটা পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না ওটাতে।

নোটগুলো আবার ব্যাগে ভরে ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে বলল হোমস। 'রাখুন, বিচারের সময় লাগতে পারে। মিসেস কিংকে আবার একটু ডাকুন।'

'মিসেস কিং, শুধু একটি প্রশ্নের জবাব দিন তো,' মিসেস কিং আসতেই প্রশ্ন শুরু করল হোমস, 'তখন বললেন না গুলির প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আপনার, তার মানে দ্বিতীয় শব্দটার চেয়ে প্রথমটা বেশি জোরাল ছিল?'

'শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু কোনটা বেশি তা বলতে পারব

না।'

'আপনার কি মনে হয়, দুটো গুলি একই সঙ্গে ছোঁড়া হয়েছিল?'

'ঠিক বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে মিসেস কিং, আপনি এখন যেতে পারেন। চলুন, মি. মার্টিন, বাগানটাতে ঘুরে আসি একবার।'

পড়ার ঘরের জানালার নীচের ফুলের ঝোপটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম সবাই। নির্মমভাবে যেন পায়ে ডলে গিয়েছে ফুলের গাছগুলো। নরম মাটিতে পড়েছে পায়ের ছাপ। লম্বা, পুরুষের পা, সামনের দিকটা একটু ছুঁচালো। চারপাশ তন্নতন্ন করে কী যেন খুঁজতে লাগল হোমস। খানিক বাদে উৎফুল্ল মুখে ফিরে এল। হাতে একটা কার্তুজের খোল।

'হুঁ, যা ভেবেছিলাম তাই,' গম্ভীর মুখে বলল সে। 'ইজেক্টরই লাগানো ছিল রিভলভারটায়। নিন, ইন্সপেক্টর, আপনার তিন নম্বর কার্তুজ। আমার কাজ প্রায় শেষ।'

হোমসের অতি দ্রুত অথচ আশ্চর্য নিপুণ কর্মতৎপরতা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর মার্টিন। অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কাকে সন্দেহ করছেন, মি. হোমস?'

'ছোটখাট দু'একটি ব্যাপার এখনও ক্লিয়ার হয়নি। তবে যতটুকু জেনেছি তা দিয়ে ঘটনাটার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি। তবু অস্পষ্ট ব্যাপারগুলো পরিষ্কার করে নিতে চাই।'

'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল বোঝেন করেন, আমার শুধু খুনীটাকে পেলেই হলো।'

'শিগ্‌গিরই পাবেন। শুধু একটা জিনিস জানতে চাই, কাছাকাছি কি এলরিজ নামে কোনও সরাইখানা আছে?'

প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর। না, ওই নামের

কোনও সরাইখানাই নেই। আস্তাবলের ছেলেটা শুধু জানাল, ওই নামের একজন চাষী আছে।

'কোথায় থাকে সে?' হোমসের কণ্ঠে উত্তেজনা।

'মাইল দুয়েক দূরে, ইস্ট রাস্টনের দিকে।'

'ওর খামার বাড়িটা কি খুব নির্জন?'

'হ্যাঁ, খুবই নির্জন?'

'রাতে এখানে যা ঘটেছে, ওখানে কি সে খবর পৌঁছে গেছে এতক্ষণে?'

'খুব সম্ভব না।'

একটু চুপ থাকার পর হোমস ছেলেটিকে বলল, 'ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এক্ষুণি তৈরি হয়ে নাও। একটা চিঠি দেব তোমাকে, ওটা নিয়ে যাবে এলরিজের খামার বাড়িতে।'

এবার পকেট থেকে বের করল সেই নাচুনে মূর্তির কাগজগুলো। ওগুলো টেবিলের ওপর বিছিয়ে, কী যেন লিখতে শুরু করল গভীর মনোযোগের সাথে। আস্তাবলের ছেলেটা তৈরি হয়ে আসতেই তার হাতে লেখা কাগজটি দিল হোমস। এবং খুব করে সতর্ক করে দিল, চিঠির ওপরে লেখা নামের লোকটিকেই যেন সে চিঠিটি দেয়। ঠিকানাটা দেখলাম আমি; অ্যাবে স্লানি, এলরিজের খামার বাড়ি, ইস্ট রাস্টন, নরফোক।

ছেলেটি বেরিয়ে যাবার আগেই হোমস বললেন, 'মি. মার্টিন, আমার অনুমান সত্যি হলে, খুব বিপজ্জনক একটা লোককে পাকড়াও করতে হবে আপনাকে। অবশ্যই সহকারী লাগবে। হেডকোয়ার্টারে একটা টেলিগ্রাম করে দিন। এলরিজের খামার-বাড়িতে যাবার পথে এই ছেলেটিই ওটা ডাকে ফেলে যাবে।'

এরপর আমাকে বলল, 'ওয়াটসন, দেখ তো, লণ্ডনে ফেরার বিকেলে কোনও ট্রেন আছে কি না? আজই ফিরতে চাই। জরুরি

একটা রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ শেষ করতে হবে আমাকে।'

আমাদের অবাক চোখের সামনে দিয়ে চিঠি আর টেলিগ্রাম নিয়ে চলে গেল ছেলেটি। পরিচারকদের কড়া নির্দেশ দিল হোমস, 'কোনও অচেনা লোক মিসেস কিউবিটের সাথে দেখা করতে এলে যেন তাঁর এই অবস্থা সম্পর্কে কিচ্ছু জানানো না হয়। সোজা ড্রইংরুমে নিয়ে বসাবে। যা বললাম অবশ্যই সেই মত করবে।' এমন করে বোঝালেন যেন এই কাজের ওপরই নির্ভর করছে সব কিছু। পরিচারকদের তালিম দেয়ার পালা শেষ করে তিনি আমাদের, নিয়ে বসার ঘরে এলেন। ডাক্তার রোগী দেখার অজুহাতে বিদায় নিলেন। রইলাম শুধু আমি, হোমস আর ইন্সপেক্টর।

'ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে আমাদের,' বললেন হোমস। 'তবে অপেক্ষাটা আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি আমি,' বলে তিনি সাইড টেবিল টেনে নিয়ে ওটার ওপর একে একে বিছাতে লাগলেন সেই বিদঘুটে ছবিঅলা কাগজগুলো।

'অসীম ধৈর্য ধরে কৌতূহল দমনের জন্যে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বন্ধু ওয়াটসনকে,' বক্তৃতার ঢঙে বলতে শুরু করলেন হোমস। 'ইন্সপেক্টর মার্টিন, নিশ্চয়ই আমার কার্যকলাপ দেখে ভারি অবাক হয়ে যাচ্ছেন। ভয় নেই, এখনই ফাঁস করে দেব সব রহস্য। তবে এ সম্পর্কে কিছু বলতে হলে, মি. কিউবিট যেদিন বেকার স্ট্রীটে প্রথম আমার সাথে দেখা করতে আসেন, সেদিনের থেকেই শুরু করতে হবে।'

সংক্ষেপে তিনি প্রায় সব ঘটনাই বললেন, 'এ ছবিগুলো দেখে যে কেউই ফালতু বলে উড়িয়ে দিত। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা না ঘটলে আজও আমি কাউকে বোঝাতে পারতাম না।

'নানান ধরনের সাঙ্কেতিক লিপির সঙ্গে মোটামুটি পরিচয়

আছে আমার। এ সম্পর্কে একটা গবেষণা গ্রন্থও প্রকাশ করেছি। তবে এটা আমার কাছে একেবারে নতুন মনে হয়েছে। এই সঙ্কেত যারা আবিষ্কার করেছে, তাদের উদ্দেশ হলো প্রকৃত সংবাদ গোপন করা। সোজা অর্থে, সবাইকে ধোঁকা দেয়া। যাতে দেখলেই লোকে ভাবতে পারে, বাচ্চাদের খেয়াল খুশিতে আঁকা ফালতু ছবি এটি।

'যখনই বুঝতে পারলাম, মূর্তিগুলো এক একটা অক্ষরের প্রতীক তখনই পানির মত সহজ হয়ে গেল সব। প্রথম যে লেখাটা পেলাম তা এত সংক্ষিপ্ত যে কিছুই বের করতে পারলাম না তা থেকে। এটুকু শুধু ধরতে পারলাম,

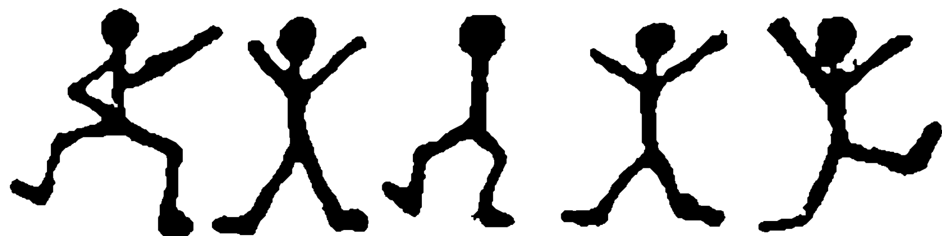


এটার অর্থ E। জানেন নিশ্চয়ই ইংরেজি বর্ণমালায় E-এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ছোটখাটো বাক্যের মধ্যেও কয়েকটা E থাকে। প্রথম খবরটাতে চারটা প্রতীক ছিল হুবহু এক। তাই এই প্রতীককে ধরে নিলাম E। মাঝে মাঝে প্রতীক চিহ্নগুলোর হাতে নিশান আছে। কিন্তু ওগুলো দেখলাম কেমন ছড়ানো ছিটানো। সহজেই ধরে নিলাম নিশানমূর্তিগুলো সব এক একটা বাক্যের ফুলস্টপ।

'এটুকু বের করার পর আসল ঝামেলা শুরু হলো। কারণ E-এর পর কোন্ শব্দের প্রভাব বেশি তা আমি কেন, অন্য গবেষকরাও বের করতে পারেননি। একটা বইয়ের পাতা নিয়ে গবেষণা করতে বসলাম, কিন্তু ব্যর্থই হলাম। তবু গবেষণা করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে অক্ষরগুলো T.A.O.I.N.S.H.R.D.L

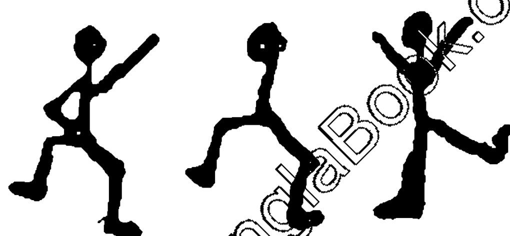
এভাবে সাজালাম। তবে বাক্যে T.A.O এবং I-এর ব্যবহারিক অনুপাত এক, তাই পরবর্তী ছবিগুলোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'দ্বিতীয় বার দেখা করতে গিয়ে মি. কিউবিট আমাকে দুটো ছোট বাক্য আর একটা সংবাদ দিলেন।



এই শব্দটির মধ্যে কোনও নিশান না থাকায় বুঝতে পারলাম ওটা একটা গোটা শব্দ। এর মধ্যে E-এসেছে দুবার—দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থানে। শব্দটা NEVER, SEVER কিংবা LEVER হতে পারে। এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে "অনুনয়-বিনয়"-এর প্রত্যুত্তরে। এবং বিচার-বিবেচনা করে বুঝতে পারলাম, এটা লিখেছেন মিসেস কিউবিট নিজে।

'এই অনুমান সত্যি ধরলে



এই তিনিটি যথাক্রমে N, V, R।

'অন্যান্য অক্ষরগুলো সম্পর্কে তখনও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবে অন্য ছবিগুলোর সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলাম ছবি আঁকিয়ে মিসেস কিউবিটের পূর্ব পরিচিত।



পতাকা হাতের পরের এই পাঁচটিতে E-আছে দুইবার, শুরুতে আর শেষে। এটি ধরে নিলাম ELSIE, কারণ এই প্রতীকটি তিন-তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে খবরের শেষে। এখানেই পেয়ে গেলাম L.S. এবং I-কে। এলসির আগের তিনটি প্রতীক দিয়ে যে COME-হবে, তা নিশ্চিত ধরে নিলাম। C.O.M ধরেই E-টা শেষে বসিয়ে নিলাম। এই সামান্য পুঁজি নিয়েই প্রথম খবরটা পড়ার চেষ্টা করলাম। ছোট ছোট শব্দে ভাগ করে যে প্রতীকগুলো বুঝতে পারলাম না সে জায়গায় ফুলস্টপ বসিয়ে দিলাম। ফলাফল দাঁড়াল এই—M. ERE.SLNE।

'এখন প্রথম বর্ণটা A না হয়ে পারে না, কেননা সংক্ষিপ্ত খবরটার মধ্যে একই প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে তিনবার। এবং এগুলো রীতিমত অর্থবহন করছে। দ্বিতীয় শব্দের প্রথম বর্ণটাকে ধরে নিলাম H। তা হলে বাক্যটা দাঁড়াচ্ছে—AM HERE AE SLANE.C

AE একটা নাম ধরলে, এর মাঝে B বর্ণটা বসাই স্বাভাবিক। তা হলে সম্পূর্ণ বাক্যটা হলো—AMHERE. ABE SLANEY.

এক সঙ্গে অনেকগুলো শব্দ পেয়ে যাওয়াতে বিনা বাধায় দ্বিতীয় খবরটা পড়লাম।



এটা থেকে পেলাম A. ELLRI. ES। ভেবে দেখলাম T আর G

দিয়ে যদি শূন্যস্থান পূরণ করি, তা হলে একটি অর্থ পাই, AT ELLREGES, কোনও সরাইখানা কিংবা বাড়ির নাম, যেখানে লোকটা আস্তানা গেড়েছে।'

ইন্সপেক্টর মার্টিন আর আমি এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম হোমসের প্রতীকি ধাঁধার অর্থ উদ্ধারের তাক লাগানো কাহিনি। হোমস একটু থামতেই অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর, 'তারপর? বলুন, থামলেন কেন?' ইন্সপেক্টরের যেন তর সইছে না।

ABE SLANEY নামটা যে আমেরিকান সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। ABE শব্দটা আমেরিকাতেই প্রচলিত। আমেরিকা থেকে মিসেস কিউবিটের নামে চিঠি আসার পর থেকেই তো শুরু হয়েছে এই রহস্যের। বিয়ের আগের জীবন সম্পর্কে স্বামীকে কিছুই না জানানো, এবং চিঠির প্রসঙ্গটাও চেপে যাওয়াতে বুঝলাম, রহস্যটা অপরাধ সংক্রান্ত। উইলসর হারগ্রিয়েভ, নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমার বন্ধু অ্যাবে স্লানি সম্পর্কে তথ্যের জন্য অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম করলাম তাকে। কয়েক দিন পরে জবাব এল— "শিকাগোর সবচেয়ে বিপজ্জনক কুখ্যাত খুনে ডাকাত, বদমাশ"।

এটার অর্থ বের করতে খবরটা দাঁড়াল ELSIE, RE ARE TO MEET THY GO। P আর D দিয়ে মাঝের শব্দ পূরণ করতেই আঁতকে উঠলাম আমি। বুঝলাম, কাকুতি মিনতি ছেড়ে এখন ভয় দেখাতে শুরু করেছে শয়তানটা। আমেরিকান খুনীদের প্রকৃতি সম্পর্কে যতটুকু জানি, তাতে অহেতুক দেরি করলে ভয়ানক ক্ষতি

হয়ে যাবে। তাই ওয়াটসনকে নিয়ে ভোরের ট্রেনেই নরফোকে চলে এলাম। এখানে পা দিয়েই শুনলাম ক্ষতি যা হবার তা আগেই হয়ে গেছে।'

'অদ্ভুত!' আবেগে গদগদ হয়ে গেল ইন্সপেক্টর মার্টিনের কণ্ঠ। 'সত্যি আপনার সঙ্গে কাজ করতে পেরে ধন্য হলাম। কিন্তু...একটা কথা, মি. হোমস, মানে, আমাকে তো ওপরঅলার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে...' ইতস্তত করতে লাগলেন ইন্সপেক্টর।

'হ্যাঁ, বলুন?' জিজ্ঞেস করল হোমস।

'ওই খুনে অ্যাবে স্লানি সত্যি যদি এলরিজের খামার বাড়িতে লুকিয়ে থাকে, তা হলে আমরা এখানে বসে থাকলে তো পালিয়ে যাবে সে।'

'পালাবে না।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'পালান মানেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয়া।'

'চলুন না, আমরাই গিয়ে ওকে গ্রেফতার করি।'

'আমি যে-কোনও মুহূর্তে ওকে এখানে আশা করছি।'

'ও স্বেচ্ছায় এখানে আসবে?' অবাক হলেন ইন্সপেক্টর। 'হ্যাঁ, আমি ওকে আসতে লিখেছি।

'যেদিন এই খবর পেলাম সেদিনই মি. কিউবিটের কাছ থেকে পেলাম আরেকটি নতুন খবর।'

'আপনি লিখেছেন বলেই ও আসবে? অসম্ভব! বরং আপনার চিঠিতে বিপদের গন্ধ পেয়ে কেটে পড়বে সে।'

'এ ধরনের চিঠির বয়ান কেমন হওয়া উচিত সে জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে আমার, মি. মার্টিন। আর ভুল যে আমি করিনি তা এই মুহূর্তে বাইরে তাকালেই বুঝতে পারবেন।'

ঝট করে সবাই তাকালাম জানালা দিয়ে। লম্বা, সুদর্শন এক ব্যক্তি এগিয়ে আসছে এই বাড়ির দিকেই। পরনে ধূসর রঙের সুট, মাথায় পানামা টুপি। গালভর্তি সুন্দর করে ছাঁটা কালো দাড়ি। হাতের ছড়িটা এমনভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে আসছে, দেখে মনে হচ্ছে এটা যেন ওরই বাড়ি। কলিং বেল বাজতেই দ্রুত উঠে দাঁড়াল হোমস।

'চলুন, দরজার আড়ালে ওত পেতে থাকি। আর, ইন্সপেক্টর, আপনি হাতকড়াটা রেডি রাখুন।'

একটি মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘরটা। আস্তে করে খুলে গেল দরজার কপাট দুটো। ঘরের ভিতর পা দিল লম্বা লোকটি। চোখের পলকে পিস্তল ঠেকাল হোমস লোকটার মাথার পিছনে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার হাতে হাতকড়া এঁটে দিলেন ইন্সপেক্টর। ব্যাপারটা এত দ্রুত আর নিপুণভাবে ঘটে গেল যে, বুঝে উঠতে খানিকটা সময় লাগল তার। বুঝতে পেরেই সে হিংস্র চোখে তাকাল আমাদের দিকে।

'আশ্চর্য তো!' তিক্ত কণ্ঠে বলল লোকটি। 'মিসেস হিলটন কিউবিটের চিঠি পেয়েই এসেছি আমি।'

'তা জানি,' মুচকি হেসে বললেন হোমস।

'তা হলে? তা হলে কী বলতে চান, এই ফাঁদ উনিই পেতেছেন?'

'মিসেস কিউবিট মারাত্মক আহত। বাঁচার আশা নেই।'

'কী পাগলের মত বলছেন,' চেঁচিয়ে উঠল সে। তারপর হাহাকারের ভঙ্গিতে বলল, 'কিন্তু কেমন করে হলো? আঘাত তো ওর লাগেনি, লেগেছে ওর স্বামীর। আমি এলসিকে আঘাত করতে পারি না। ওকে ভয় দেখাতে পারি, কিন্তু ওর একটা চুলও স্পর্শ করার দুঃসাহস আমার নেই। বলুন আপনারা, ওর কোনও ক্ষতি

হর্মনি, প্লীজ, বলুন...' বিলাপ করতে করতে ভেঙে পড়ল লোকটা।

'গতরাতে ওর মৃত স্বামীর পাশে ওকে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাওয়া যায়,' বললেন হোমস।

হাতকড়া লাগান অবস্থায়ই দুহাতে মুখ ঢেকে অস্ফুট স্বরে কাঁদতে লাগল লোকটা। খানিকক্ষণ বাদে মুখ তুলল সে। হতাশায় ভেঙে পড়া শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, 'কিছুই লুকাব না, এলসির স্বামীকে আমি গুলি করেছি। কারণ ওই লোকই আগে ছুঁড়েছিল। খুনোখুনির কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আপনারা যদি ভেবে থাকেন, এলসিকে আমি আহত করেছি, তা হলে বলব, আমার আর ওর সম্পর্কে কিছুই জানেন না আপনারা। ও আমার। এ পৃথিবীতে আমার চেয়ে ওকে আর কেউ বেশি ভালবাসেনি। অনেক আগে থেকেই ও আমার বাগ্‌দত্তা। আমাদের মধ্যে নাক গলানোর কোনও অধিকারই ছিল না ওই ইংরেজটার। আমি এসেছিলাম সেই অধিকারেরই দাবি জানাতে।'

'আপনার স্বরূপ চিনতে পেরেই ভদ্রমহিলা পালিয়ে এলেন আমেরিকা থেকে,' কঠোর স্বরে বললেন হোমস। 'আপনার হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্যেই বিয়ে করলেন তিনি সম্মানীয় এই ইংরেজ ভদ্রলোককে। কিন্তু ওঁর সে সুখ আপনার সহ্য হলো না। কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে বার করলেন ওঁকে। দুর্বিসহ করে তুললেন তাঁর জীবন। যে স্বামীকে তিনি দেবতার মত শ্রদ্ধা করতেন, আপনি চাইলেন, তাঁকে ছেড়ে তিনি আবার আপনার ঘৃণ্য জীবনে চলে আসুক। যেহেতু ভদ্রমহিলা আপনার প্রস্তাবে রাজি হননি, তাই প্রাণ দিতে হলো তাঁর স্বামীকে আপনার হাতে। প্রাণপ্রিয় স্বামীর মৃত্যুতে তিনিও বাধ্য হলেন আত্মহত্যা করতে। মি. অ্যাবে স্লানি, জঘন্য খুনি আপনি। আদালতে আপনাকে

জবাবদিহি করতে হবে।'

'এলসি বেঁচে না থাকলে কোনও কিছুর পরোয়া করি না আমি,' বেপরোয়াভাবে বল সে। 'কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, এলসি যদি ভয়ানক আহতই হয়ে থাকে, তা হলে এই চিঠিটা লিখল কে?' বলে সে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল চিঠিটা।

'আমি লিখেছি,' জবাব দিল হোমস।

'আপনি? অসম্ভব!' অবিশ্বাসে ভ্রু কুঁচকে গেল স্লানির। 'জয়েন্ট ছাড়া এ পৃথিবীর আর কারও পক্ষেই নাচুনে মূর্তিদের রহস্য জানা সম্ভব নয়।'

'কেউ একজন যদি কিছু আবিষ্কার করতে পারে, অন্য একজন তার পুনরাবিষ্কার করতে পারবে না, একথা আপনি কেমন করে ধরে নিলেন, মি. স্লানি? আপনাকে নরউইচে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি এসে গেছে। যাবার আগে আপনাকে—একটা অনুরোধ করছি মি. স্লানি। মারাত্মক আহত হলেও প্রমাণের অভাবে মিসেস কিউবিটকে স্বামী হত্যার অপরাধে অপরাধী করা হবে। জঘন্য এই মিথ্যে অপবাদ যেন তাঁর মাথায় চাপানো না হয়। আপনি তো জানেন ভদ্রমহিলা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।'

'এলসির জন্য এটুকু করতে পারলে তাও নিজেকে কিছুটা ক্ষমা করতে পারব।'

'আগে থেকেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি,' হঠাৎ বলে উঠলেন ইন্সপেক্টর। 'আপনার এই স্বীকারোক্তি প্রয়োজনে ব্যবহার করব আমরা।'

উপেক্ষার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্লানি, 'তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না। এলসিকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। শিকাগোতে আমাদের সাতজনের একটা দল ছিল। এলসির বাবা প্যাট্রিক ছিল সেই জয়েন্ট দলের পাণ্ডা। সেই এই নাচিয়ে মূর্তির

আবিষ্কারক। আমরা ছাড়া কেউ জানত না এর রহস্য। এলসি জানত। বড় হয়ে সে আমাদের কার্যকলাপকে ঘৃণা করা শুরু করল। একদিন সে সবার চোখে ধুলো দিয়ে জমানো কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। বহু খোঁজাখুঁজির পর ওর এই ঠিকানা পেলাম। চিঠি লিখলাম, জবাব পেলাম না। এসে দেখি বিয়ে হয়ে গেছে। পাঠাগার ডট নেট থেকে ডাউনলোডকৃত।

'মাসখানেক হলো এখানে এসেছি। এলরিজের খামার বাড়িতে উঠেছি। রোজ রাতে এলসির জন্যে খবর রেখে আসতে লাগলাম। একদিন আমার লেখার নীচে ওর লেখা দেখে বুঝতে পারলাম, সবই দেখেছে সে। ওর জবাব পেয়ে রেগে গেলাম আমি। তারপরই ভয় দেখাতে শুরু করলাম। একটা চিঠিও পেলাম ওর কাছ থেকে। মিনতি করেছে যেন ওর আশা ত্যাগ করি। ওর স্বামীর নামে কোনও কলঙ্ক রটলে আত্মহত্যা করবে সে, এ-ও জানিয়েছে। সবশেষে লিখেছে, রাত তিনটায় সে পড়ার ঘরের জানালার সামনে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।

'ওর নির্দেশ মতই দেখা করতে এলাম রাতে। টাকা দিয়ে আমাকে সরাতে চাইল সে। ভীষণ রেগে গেলাম আমি। জানালা দিয়েই হ্যাঁচকা টান দিলাম ওকে। সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে রিভলভার হাতে ঘরে ঢুকল ওর স্বামী। মেঝেতে ছিটকে পড়ল এলসি। মুখোমুখি হলাম রিভলভারধারী দু'জন। রিভলভার তুলে ভয় দেখিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু মুহূর্ত দ্বিধা না করে গুলি ছুঁড়ল সে, আমিও ছুঁড়লাম। বাগানের মধ্য দিয়ে পালানোর সময় জানালা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেছি। কসম করে বলছি, এর এক বর্ণও মিথ্যে না। চিঠি পেয়ে এখানে আসার আগে পর্যন্ত কিছুই জানি না আমি।'

'চলুন, ওঠা যাক,' বলে অ্যাবে স্লানির হ্যাণ্ডকাফ ধরে উঠে

দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর মার্টিন।

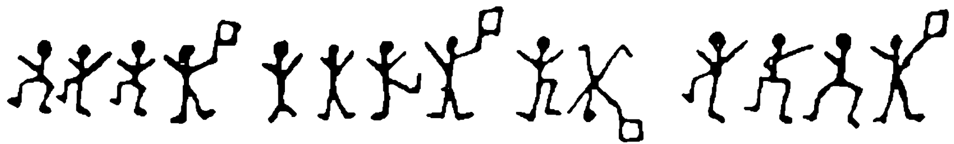
'যাবার আগে একটি বারের জন্য কি এলসিকে দেখতে পারি?' অনুনয় ঝড়ে পড়ল স্লানির কণ্ঠে।'

'না। ওঁর জ্ঞান ফেরেনি এখনও। চলি, মি. হোমস। ভবিষ্যতে এ ধরনের কেসে আপনাকে পাশে পেলে ভাগ্যবান মনে করব নিজেকে।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখলাম দূরে। ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল স্লানির টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলা দোমড়ানো চিরকুটটা। এটা সেই চিঠি যা দিয়ে হোমস খুনিটাকে ফাঁদে ফেলেছিল। কৌতূহল ভরে তুলে নিলাম হাতে।

'দেখ তো, পাঠোদ্ধার করতে পার কিনা?' মুচকি হেসে বলল হোমস।

ওটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরে নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনও অক্ষর নেই। শুধু নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে একসারি আঁকা ছবি।



'এতক্ষণ যে পদ্ধতি বোঝালাম,' হাসতে হাসতে বললেন হোমস। 'তাই দিয়ে বের করলে অর্থ দাঁড়ায়—"এখুনি এখানে চলে এস"। আমি নিশ্চিত ছিলাম, এ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার সাধ্য ওর নেই। কারণ, তার ধারণা এই সঙ্কেত লিপি মিসেস কিউবিট ছাড়া আর কেউ যে জানে না। তা হলে ওয়াটসন, অশুভ বার্তা বহনকারী এই বিচিত্র ছবি এবার শুভ কাজে লাগালাম, কী বল? বলেছিলাম, নতুন লেখার উপকরণ দেব, পেয়েছ নিশ্চয়ই? আর হ্যাঁ, তিনটা

চল্লিশে আমাদের ট্রেন, রাতের খাওয়ার আগেই বোধহয় বেকার স্ট্রীটে পৌঁছাতে পারব।'

উপসংহারে আমার সামান্য ক'টা কথা বলার আছে। নরউইচ আদালত অ্যাবে স্লানিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। মিসেস হিলটন কিউবিট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বামীর সম্পত্তি দেখাশোনা এবং দুস্থের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিয়ে করেননি, করবেনও না ভবিষ্যতে—এটাই জানিয়েছেন।

মূলঃ স্যার আর্থার কোনান ডয়েল
রূপান্তরঃ ফারহানা নাতাশা

স্বপ্নের বসতি যেখানে

মুখভর্তি পাকা দাড়িওয়ালা এক ভিক্ষুক আমাদের সামনে এসে ভিক্ষা চাইল। আমার বন্ধু যোসেফ দাভখশকে পাঁচ ফ্রাঁয়ের নোট ভিক্ষে দিতে দেখে আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। কিছুটা আপনমনেই ও বলতে লাগল, 'এই বুড়ো বদমাশটা এমন একটা স্মৃতি মনে করিয়ে দিল, আজও আমাকে যেটা তাড়া করে ফেরে। যদি...'

একটু থেমে কী ভেবে আবার বলল, 'তোমাকে গল্পটা বলা যায়। বলেই ফেলি।'

'আমরা ছিলাম হাভে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা। গরিব ছিলাম আমরা খুব। দিন আনি দিন খাই–এই রকম অবস্থা। বাবা ছিলেন একটা সদাগরি অফিসের কেরানি। বেদম খাটতেন আর অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু খাটনির তুলনায় আয় ছিল খুব কম। আমার আবার দু'টো বড় বোনও ছিল। আমার মা ছিলেন দারিদ্র্যের অসুখে ভুগে ভুগে ভেঙে পড়া এক বদমেজাজি মহিলা। প্রায়ই বাবাকে যা-তা বলে বকাবকি করতেন আর স্কার্ফে মুখ গুঁজে গজরাতে গজরাতে সমস্ত দুর্দশার জন্য বাবাকে দায়ী করতেন। ওই সময়গুলোতে বাবার চেহারা দেখে আমার ভীষণ মায়া লাগত। ডান হাতটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ঝেড়ে ফেলার

ভঙ্গি করতেন বাবা। যেন ওভাবেই সব হতাশা ঝেড়ে ফেলতে চাইতেন। আমি বাবার দুঃখগুলো বেশ বুঝতে পারতাম।

আমাদের সবকিছু চলত অনেক হিসাবনিকাশ করে। কারও বাড়িতে দাওয়াত খেতেও যেতাম না, নিজেদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর সামর্থ্য নেই বলে। দরকারি জিনিসপত্র কম দামে কেনার জন্যে দোকানের পিছনে ফেলে রাখা প্রায় বাতিল মালগুলো থেকে কেনাকাটা করতাম। বোনেরা নিজেরা নিজেদের জামাকাপড় বানিয়ে নিত। আর দামি দামি রেশমি কাপড় আর হালফ্যাশনের গল্প করত। আমাদের দৈনিক খাবারের মেনুতে ছিল তেলতেলে একরকমের সুপ আর নানারকম সস মাখানো গরুর মাংস। বলা হত, ওগুলো নাকি শরীরের জন্য ভাল। কিন্তু আমার মোটেই ভাল্লাগত না, ভীষণ স্বাদহীন, একঘেয়ে লাগত। ভয়ঙ্কর কিছু দৃশ্যের অবতারণা হত যখন কোনভাবে আমার পাজামা ছিঁড়ে যেত বা জামার বোতাম খুলে পড়ে হারিয়ে যেত। মায়ের পিটুনি খেতে খেতে শুনতে হত কীভাবে বাবার সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে তাঁর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু তবুও প্রতি রোববার আমরা আমাদের সবচেয়ে ভাল জামাকাপড় পরে বন্দর এলাকায় জেটির কাছে ঘুরতে বের হতাম। বাবা পরত ফ্রক-কোট, উঁচু হ্যাট আর দস্তানা। মাও বাবার হাত ধরে ঘুরতে বেরবেন বলে বেশ দাপুটে ভঙ্গিতেই প্রস্তুতি নিতেন। বোনেরা শুধু ইশারার অপেক্ষায় থাকত কখন বেড়াতে বের হবে সবাই। প্রায়ই শেষ মুহূর্তে বাবার কোটের আস্তিনে বা কোথাও বিশ্রী ধরনের কোন দাগ চোখে পড়ত। মোটা কাপড়ে বেনজিন লাগিয়ে সেই দাগ দূর করার চেষ্টা করতেন মা। বাবা হ্যাট আর শার্ট পরে অপেক্ষা করত কোটটা পরিষ্কার আর দাগহীন হওয়ার জন্য। মা হাতের দস্তানা খুলে লেগে পড়তেন

পরিষ্কার করতে।

বেশ আয়োজন করেই বেরতাম আমরা। আমার বোনেরা থাকত সবার সামনে। হাত ধরাধরি করে হাসাহাসি করতে করতে সুখি ভঙ্গিতে হাঁটত ওরা। দু'জনেরই যে বিয়ের বয়স হয়েছে এটা যেন গোটা শহরকে জানানো চাই। মায়ের ডানদিকে বাবা আর বামদিকে থাকতাম আমি। আমার আজও বেশ পরিষ্কার মনে আছে। রোববার বিকেলে আমার গরিব বাপ-মাকে একটু যেন অন্যরকম লাগত। আত্মবিশ্বাসী ভদ্রলোকদের মত মেরুদণ্ড সোজা করে মাপা মাপা পায়ে হাঁটত বাবা। মায়ের চোখেমুখে ফুটে থাকত অন্য একধরনের আভা। ছোট হলেও বুঝতাম সবকিছু কতটা মেকি।

আর প্রতি রোববারেই, জেটিতে দাঁড়িয়ে যখন আমরা দূর দূরান্তের অচেনা দেশ থেকে ভেসে আসা জাহাজগুলোকে ফিরতে দেখতাম, বাবা বারবার বলা সেই একটা কথাই বলে উঠতেন, 'এই জাহাজটায় জুলে ফিরে এলে কী মজাই না হত!' জুলে চাচা আমার বাবার ছোট ভাই। একসময়ে তিনি নাকি ছিলেন পরিবারের বখাটে ছেলে। আর এখন বাবার চোখে তিনি শেষ আশার আলো। চাচাকে কখনও দেখিনি আমি। ছোটবেলা থেকেই বাবার মুখে চাচার কথা এত বেশি শুনে এসেছি যে আমার মনের মধ্যে তাঁর জ্যান্ত ছবিটা যেন ভাসত। বিশ্বাস ছিল প্রথম দেখায়ই আমি তাঁকে চিনতে পারব। আমেরিকা রওনা হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনাই আমার মাথায় এমন ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। যদিও চাচার ওই সময়কার বর্ণনা কেন যেন বেশ রেখেঢেকেই দেওয়া হত। হয়তো পারিবারিক পুঁজি বা টাকাপয়সা নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব ছিল বলে। শুনেছি উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার প্রাপ্য সম্পত্তির খানিকটা অংশ হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন চাচা।

অনেক বছর আগে সদাগরি জাহাজে কাজ নিয়ে হাভে থেকে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে পাড়ি জমিয়েছিলেন চাচা। সেখানে গিয়েই নাকি ব্যবসাপাতি শুরু করেছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন যে, খুব শিগগির তিনি বাবার টাকা ফেরত দেয়ার মতন সঞ্চয় করতে পারবেন। এই চিঠি পড়ে নাকি পুরো পরিবারেই বেশ একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। জুলে চাচা রাতারাতি বখাটে ছোকরা থেকে ভদ্র, সৎ আর কর্মঠ মানুষের মর্যাদা পেয়ে গেলেন। পরিবারের সবাই তাঁর কথা গর্ব করে বলে বেড়াতে লাগল।

পরে একদিন জেটি এলাকায় বাবার চেনা এক জাহাজের ক্যাপ্টেন এসে জানিয়েছিল যে, নিউ ইয়র্কে নাকি চাচা বেশ বড় একটা দোকানের মালিক হয়েছেন আর ব্যবসাও ভালই চলছে।

দু' বছর পর এল বাবাকে লেখা চাচার দ্বিতীয় চিঠিটা।

প্রিয় ফিলিপ,

আমার ভালবাসা নিয়ো। কেমন আছ তোমরা? এই চিঠিটা এই জন্য লিখছি যেন তোমরা আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না কর। আমার শরীর ভাল আছে। ব্যবসার অবস্থাও ভাল। আগামীকাল একটা লম্বা বাণিজ্য সফরে দক্ষিণ আমেরিকা রওনা হব। চিঠি না পেলে দুশ্চিন্তা কোরো না। যথেষ্ট অর্থ সম্পদ হলেই আমি ফিরে আসব। আমার ধারণা, তার আর বেশি দেরি নেই। অচিরেই হয়তো আমরা একত্রে সুখ-শান্তির সচ্ছল জীবন শুরু করতে পারব।

সবাইকে আমার ভালবাসা জানিয়ো।

ইতি

তোমার ছোট ভাই

জুলে দাভখশ

চিঠিটা যেন আমাদের পরিবারের জন্য ঐশীবাণী। বারবার করে পড়া হত আর চেনা পরিচিত সবাইকে ডেকে ডেকে দেখানো হত। সচ্ছল জীবনের স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করত গোটা পরিবার। সুখি ভবিষ্যতের স্বপ্ন। দামি পোশাক আর ভদ্রস্থ একটা ঘরের স্বপ্ন। আমার চোখে চাচা ততদিনে স্বপ্নের নায়ক। দুঃসাহসী এক বীর যেন। আমার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল তাঁর মত একটা মানুষ হওয়া।

পরের দশ বছর জুলে চাচার কোন খবরই পাওয়া গেল না। কিন্তু তাও সময়ের সাথে বাবারও প্রত্যাশা যেন বেড়েই চলছিল। এমনকী মাকেও মাঝে মাঝে বলতে শুনতাম, 'জুলে ফিরলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।' আর প্রতি রোববারে, জেটিতে দাঁড়িয়ে বাবা কয়লার ধোঁয়া উড়িয়ে এগিয়ে আসতে থাকা জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই একই কথা বলতেন, 'এই জাহাজে জুলে ফিরে এলে কী ভালই না হত!' আমরাও আশা করতাম হয়তো একদিন দেখা যাবে, কোন এক জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আমার সুঠামদেহী জুলে চাচা হাতের রুমাল নাড়তে নাড়তে বাবাকে চিৎকার করে ডাকছেন।

আমার বাবা মা জুলে চাচার ফিরে আসার ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, অসংখ্য পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন চাচার জমানো টাকাপয়সার কথা চিন্তা করে। এমনকী চাচার টাকায় তাঁরা ইনগোভিল-এর কাছে একটা বাড়ি কিনে ফেলার পরিকল্পনা পর্যন্ত করে ফেললেন। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না বাবা বাড়ি কেনার ব্যাপারে দালালদের সাথে কথাবার্তা বলাও শুরু করে দিয়েছিলেন কিনা।

আবার দু'বোনের মধ্যে বড়জনের বয়স ততদিনে আটাশ। আর ছোটজনের চব্বিশ। তবু তাদের বিয়ের কোন নামনিশানা

দেখা যাচ্ছিল না। ব্যাপারটা পরিবারের সবার জন্য বেশ দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

শেষ পর্যন্ত ভাগ্যক্রমে ছোটজনের একটা পাণিপ্রার্থী জুটে গেল। বাবার অফিসেরই এক কেরানি। টাকা পয়সা তেমন একটা নেই। দেখতে শুনতেও আহামরি কিছু না। তবু যাচাই বাছাইয়ের পরিস্থিতি ছিল না। আমার মনে হয় জুলে চাচার চিঠিটা ওই কেরানি ব্যাটাকে কায়দা করে দেখানোর পরই হয়তো সে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে বিয়েতে মত দিয়েছিল।

তাকে বেশ ভাল রকম সমাদর করা হলো। ঠিক হলো বিয়েটা হয়ে গেলে পরে সবাই মিলে জার্সিতে বেড়াতে যাব। আমাদের মতন গরিবদের জন্য তখন জার্সিতে বেড়াতে যাওয়া স্বপ্নের মতন। জার্সি যদিও খুব দূরে নয়। স্টিমারে চড়ে সেই দ্বীপে যাওয়া যায়। দ্বীপটা ইংরেজদের অধীনে। অর্থাৎ আমাদের মতন ফরাসিদের জন্য সেটা বিদেশই বটে। এদিকে জার্সিতে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে একটা বদ্ধমূল বাতিকের মতন হয়ে দাঁড়াল। সারাক্ষণই আমরা স্বপ্নে দেখতাম স্টিমারে চড়ে জার্সিতে বেড়াতে যাওয়ার।

অপেক্ষার অজস্র প্রহর শেষে স্বপ্নের সেই দিনটি এল। আমার চোখে এখনও পরিষ্কার ভাসছে; যেন এই তো গতকালকের ঘটনা। বাবা খুব তোড়জোড় করে স্টিমারে মালামাল উঠানো তদারক করছিলেন। বাবার পরনে সেই ফ্রককোটটাই। তাতে হালকা বেনজিনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। মনে করিয়ে দিচ্ছিল সেই রোববার বিকেলগুলোর কথা। মা উদ্বিগ্নমুখে বড় বোনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর সদ্য বিবাহিত আমার ছোট বোনটি আর তার কেরানি বর হাত ধরাধরি করে ধীরে সুস্থে পিছনে পিছনে আসছিল।

স্টিমার ছাড়ল অবশেষে। জেটি থেকে নাক ঘুরিয়ে সবুজ মার্বেল রঙয়ের সমুদ্রের দিকে এগোল। আমরা বেশ গর্বিত আর সুখী ভ্রমণকারীদের মতন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম উপকূলরেখার ফিকে হয়ে আসা। বড় স্টিমার। অনেক যাত্রী। বাবার হঠাৎ চোখে পড়ল দু'টো লোক দু'জন ধোপদুরস্ত পোশাক পরা মহিলার জন্য ঝিনুক কিনছে। এক বুড়োটে নাবিক ঝিনুকের খোলস ছুরি দিয়ে খুলছিল আর লোকদুটোর হাতে তুলে দিচ্ছিল। লোক দু'টো আবার সেগুলো মহিলা দু'জনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল। মহিলা দুইজন আবার বেশ কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে রুমাল দিয়ে ঝিনুকের খোলের কিনারা ধরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে এমন ভাবে খাচ্ছিল যেন পোশাকে না লেগে যায়। খাওয়া শেষে খোলসগুলো আবার সমুদ্রেই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল। আমার বাবা ভাবলেন, সবাই মিলে ঝিনুক খাওয়া যেতে পারে। মহিলা দু'জনের খাওয়ার ভঙ্গি দেখে আমাদেরও খেতে ইচ্ছে করছিল। বাবা উপরের ডেকে গিয়ে মা আর আমার বোনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তারা খেতে চায় কিনা।

অহেতুক খরচের কথা ভেবে মা দ্বিধা করলেও, বোনেরা আগ্রহভরে খেতে চাইল। মা বেশ কায়দা করে বললেন যে পেট খারাপের ভয়ে তিনি খাবেন না। আর মেয়েদেরকে সাবধান করলেন যেন কম কম খায়–নইলে আবার বদহজম হতে পারে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যোসেফ তো আবার ওসব পছন্দই করে না।' আমি পরে মায়ের চড় খাওয়ার ভয়ে কিছু বললাম না। মায়ের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মন খারাপ হয়ে গেল। দেখলাম বাবা তাঁর দুই মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে ওই বুড়ো ঝিনুকওয়ালার দিকে রওনা হলেন। উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল ওদের।

কীভাবে পোশাকে না লাগিয়ে কায়দা করে খেতে হবে দেখাতে গিয়ে প্রথমেই বাবা তাঁর ফ্রককোটের উপরে খানিকটা লাগিয়ে ফেললেন। কারণ মুখে দেয়ার শেষ মুহূর্তে তাঁর হাত কেঁপে উঠেছিল। অত দূর থেকেও পরিষ্কার দেখলাম। স্পষ্ট দেখলাম বাবার চোখের চাহনি বদলাতে। কয়েক পা পিছিয়ে ঝিনুক বিক্রেতা বুড়ো লোকটার দিকে উলটো ঘুরে দ্রুত আমাদের দিকে ছুটে এসে হাঁপাতে লাগলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলেন, 'ঝিনুকওয়ালার চেহারা একদম আমাদের জুলের মতন। হুবহু মিল।'

'কোন জুলে?' মা হঠাৎ করে কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন।

'আরে, আমার ছোট ভাই জুলে। যদি না জানতাম যে ও আমেরিকাতে আছে আর বেশ ভালই ব্যবসাপাতি করছে, তা হলে তো ওই ঝিনুকওয়ালা ব্যাটাকেই জুলে মনে করতাম।' বাবার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'ধ্যাত্তেরি!' মা বেশ জোরেসোরেই যেন বলতে চাইলেন। 'জানোই তো ওটা জুলে না, তবে এই ভাবে হুড়মুড়িয়ে এসে বলার কী আছে?' কিন্তু বাবা তবু বলে চললেন, 'ক্ল্যারিস, তুমি গিয়ে দেখে আসোগে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হবে না, জুলের সাথে এত মিল ওর চেহারায়।'

মা দেখার জন্য এগোলেন। আমিও দেখতে গেলাম লোকটাকে। বয়স্ক, নোংরা, মুখ বলিরেখায় ভরা—এক মনে নীচের দিকে তাকিয়ে ঝিনুকের খোলস খুলছে। আর কোনদিকে তাকাচ্ছে না। ছেঁড়া তালি দেয়া একটা জামা পরা।

দেখলাম মায়েরও চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফিরে এসেই বাবাকে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, 'আমার মনে হয়

এটা জুলেই। যাও স্টীমারের সারেংকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও লোকটার পরিচয়। হতচ্ছাড়াটা আবার আমাদের চিনে না ফেললেই হয়।'

বাবার পিছনে পিছনে আমিও এগোলাম। আমার কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। এ কীভাবে সম্ভব!

সারেং লোকটা বেশ লম্বা, রোগাটে চেহারা। মস্ত বড় গোঁফটা যেন নাকের নীচে ঝুলছে, স্টিমারের ব্রিজে দাঁড়িয়ে ছিল এমন ভঙ্গিতে যেন বিশাল একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন সে। বাবা বেশ সমীহ নিয়ে কথা বলতে গেলেন। প্রথমে 'ক্যাপ্টেন'কে 'জাহাজে'র প্রশংসা করে কিছু কথা বলায় লোকটা বেশ খুঁশিই হয়ে উঠল। বাবা নানান কথা বলতে লাগলেন। জার্সি দ্বীপটার আকার, জনসংখ্যা, দেখার মত জিনিস ইত্যাদি নানান বিষয়ে।

আমাদের স্টিমারটার নাম ছিল 'দ্য এক্সপ্রেস'। তারা এরপর 'দ্য এক্সপ্রেস' নিয়ে গল্প জুড়ে দিল। অনেকক্ষণ একথা সেকথার পর বাবা বেশ ইতস্তত গলায় জিজ্ঞেস করলেন. 'আপনার জাহাজে যে বুড়ো ঝিনুক-বিক্রেতাকে দেখলাম, বেশ আজব চরিত্র বলে মনে হলো তাকে। চেনেন নাকি লোকটাকে?'

সারেঙের মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিল। জবাব দিল, 'ওটা একটা ফরাসি বাউণ্ডুলে। গত বছর আমেরিকায় দেখা হয়েছিল। ফালতু লোক। বলেছিল হাভের বন্দর এলাকায় নাকি তার আত্মীয়স্বজন আছে। কিন্তু সে ফিরতে চায় না, সেখানে নাকি তার অনেক ধার দেনা। নাম বলেছিল জুলে। জুলে দাখমশ বা জুলে দাখভশ এরকম কিছু একটা নাম, বেশ আয় রোজগার নাকি করেছিল সে ওখানে। সব খুইয়েছে। আমার তো মনে হয় সব বাজে কথা। অকর্মার ধাড়ি একটা। তবু মায়া লাগল...'

বাবার চেহারায় রাগ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। লম্বাটে

মুখটায় অবশেষে ক্লান্তির একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। ক্লান্তির নাকি স্বপ্নভঙ্গের—কে জানে! আর আমার কী মনে হচ্ছিল? সে কথা নাই বা শুনলে।

'হুমম, তাই তো দেখা যাচ্ছে।' বিড়বিড় করে বললেন বাবা। 'ক্যাপ্টেন, আপনার সাথে কথা বলে ভাল লাগল'—বলেই হেঁটে চলে এলেন। বাবার সাথে সাথে আমিও। এভাবে হঠাৎ চলে আসায় সারেং আমাদের গমনপথের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল—পিছনে ফিরে দেখেছিলাম।

বাবা মায়ের কাছে ফিরে এসে সব খুলে বললেন। গজগজ করতে করতে বললেন, 'ওটা আর কেউ নয়, আমার গুণধর ভাই। এখন কী করা যায় বল তো?'

'ছেলেমেয়েদেরকে ওই হতচ্ছাড়ার কাছ থেকে সরিয়ে আনো।' মা তাড়াহুড়ো করে বললেন। 'যোসেফ তো জেনেই ফেলল। কিন্তু দেখতে হবে জামাইটা যেন না জানতে পারে বা কিছুতেই যেন কোন সন্দেহ না জাগে।'

বাবার হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটেনি। 'হায় রে কপাল।' বিড়বিড় করছেন তিনি। মা হঠাৎ রেগে উঠলেন, 'আমি জানতাম বদমায়েশটা জীবনে কিছুই করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের ঘাড়ে এসে জুটবে। তোমাদের বংশের কাছ থেকে এর চেয়ে আর কী-ই বা আশা করা যায়?'

বাবা চুপ।

মা বললেন, 'যোসেফের কাছে টাকা দাও। ও দাম মিটিয়ে আসুক। হতভাগাটা এখন আমাদেরকে চিনে ফেললেই ষোলোকলা পূর্ণ হবে। চলো আমরা সবাইকে নিয়ে অন্যদিকে সরে পড়ি।' মা আমার হাতে পাঁচ ফ্রাঁয়ের একটা নোট তুলে দিয়ে জাহাজের অন্যদিকে বাবাকে নিয়ে চলে যেতে লাগলেন। আমার

বোনেরা তখনও বাবার ফিরে আসার জন্য ওখানেই অপেক্ষা করছিল। বাবার বদলে আমাকে দেখে অবাক হলো। আমি বললাম, মায়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ করেছে। জিজ্ঞেস করলাম ঝিনুকওয়ালা কত টাকা পাবে। ঝিনুকওয়ালা লোকটার কাছে গিয়ে আমি প্রায় নিজের অজান্তেই আরেকটু হলে তাকে চাচা বলে ডেকে উঠতে গিয়েছিলাম। আমি তাকে পাঁচ ফ্রাঁয়ের নোটটা দিলাম। খুচরো কিছু টাকা ফেরত পেলাম।

লোকটাকে ভাল করে দেখলাম। হাত দুটো শীর্ণ, চেহারায় পরাজিত বার্ধক্যের ছাপ। মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছি, 'এটা আমার চাচা! আমার বাবার ছোট ভাই, মানে আমার চাচা! আমার কল্পনার দুঃসাহসী নায়ক!' আমার কল্পনার মানুষটার সাথে তুলনা করছি আর অবাক হচ্ছি। ওই তো আমার বাবার মতন লম্বাটে মুখ, মাঝারি গড়ন। রক্তের সম্পর্কের ছায়া? কে জানে!

আমি একটা খুচরো মুদ্রা লোকটাকে বকশিশ দিলাম। সে মৃদু গলায় আমাকে ধন্যবাদ দিল। 'খোদা তোমার রহম করুক, বাবা।' ভিক্ষুকের মত গলায় বলল সে। আমার মনে হতে লাগল আমেরিকাতেও আমার জুলে চাচা হয়তো ভিক্ষে করেই বেড়াতেন। আমার বোনেরা আমার বকশিশ দেয়ার উদারতা দেখে বেশ অবাক হলো। আমি দুই ফ্রাঁ ফেরত দিলাম এসে বাবাকে। মা বললেন, 'তিন ফ্রাঁ খরচ হলো কীভাবে?' বললাম, 'আমি একটা আধুলি বকশিশ দিয়েছি লোকটাকে।'

মা আমার দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তুই পাগল হয়েছিস নাকি? ওই বদমায়েশটাকে দিয়েছিস বকশিশ!' বাবার দিকে চোখ পড়তেই মা চুপ মেরে গেলেন। তাদের জামাই না আবার হঠাৎ এসে শুনে ফেলে এই ভয়ে।

কিছুক্ষণ পরই স্টিমার থেকে জার্সির উপকূলরেখা দেখা

গেল। আমার খুবই ইচ্ছে করছিল জুলে চাচার কাছে ছুটে যেতে। আমার শৈশবের কল্পনার নায়ক ছিল যে লোকটা, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলে আসতে মন চাইছিল। কিন্তু-ততক্ষণে তাকে আর দেখা গেল না। আর ক্রেতা না পেয়ে হয়তো সরে পড়েছে।

জাহাজ থেকে নামার আগ পর্যন্ত বাবা মা খুব ভয়ে ভয়ে ছিল আবার না দেখা হয়ে যায়। কিন্তু...কিন্তু আমি আমার বাবার সেই ভাইকে জীবনে আর কোনদিন দেখিনি।

অবশেষে আমার বন্ধু যোসেফ দাভখশ ধীরকণ্ঠে বলল, 'এ জন্যেই দেখবে, আমি প্রায়ই ফকির দেখলে পাঁচ ফ্রাঁ ভিক্ষে দেই।'

মূলঃ গী দ্য মোপাসাঁ

অনুবাদঃ আহসানুল করিম

সমব্যথী

চোরটা টপ করে জানলা গলে ঘরে ঢুকে পড়ল, তারপর সেখানে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল। দক্ষ চোরেরা কখনও তাড়াহুড়া করে না। বাড়িটার অবস্থান ভদ্র এলাকায়। পুরো বাড়িটা সুনসান নীরব দেখে চোরটা ভাবল বাড়ির গৃহিণী হয়তো বা এই মুহূর্তে কোনও সমুদ্রের ধারের বাড়ির গাড়িবারান্দায় বসে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছেন। ভদ্রলোকটি অমায়িক, আর তাঁর টেকো মাথায় রয়েছে একটা দামী সৌখিন ক্যাপ। মহিলাটি হয়তো তাঁকে বলছে যে তার নমনীয় নিঃসঙ্গ মনের কথা কেউ কখনও বুঝল না।

দোতলার সামনের জানালাগুলোর আলো দেখে আর সময়টা বিবেচনা করে চোর অনুমান করল বাড়ির মালিক হয়তো এতক্ষণে তার শোবার ঘরে এসেছে এবং একটু পরেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বে।

পুলিশের খাতায় চোরদের যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে সেভাবে চোরটির শ্রেণী বিশ্লেষণ করতে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে। তার চেহারা বড়লোকের মতও নয়, আবার একেবারে খুব গরীবের মতও নয়। ভদ্র, সাদাসিধে চেহারা। সে মুখোশ পরেনি, তার হাতে কোনও টর্চ নেই। এমনকী তার পায়ে রাবারের জুতোও নেই। কেবল একটা আটত্রিশ ক্যালিবারের

রিভলবার রয়েছে পকেটে। একমনে পিপারমেন্ট লজেন্স চিবোতে চিবোতে সে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

চোরটা খুব বড় কিছু চুরি করার আশায় আসেনি। খুচরো টাকাকড়ি, একটা রুচিসম্মত ঘড়ি, কিংবা পাথর বসানো একটা স্টিকপিন–এই সব নেবে সে, তারচেয়ে বেশি কিছু চাহিদা আপাতত নেই। অর্থাৎ পছন্দ এবং চাহিদার বাইরে কোনও কিছু নেওয়ার লোভ তার নেই, তা যতই মূল্যবান হোক না কেন।

চোরটা নিঃশব্দে প্রায় অন্ধকার শোবার ঘরটিতে ঢুকল। ভদ্রলোক বিছানায় ঘুমিয়ে। ড্রেসিং টেবিলের উপর অনেক জিনিসপত্র এলোপাথাড়ি ছড়ানো। এক তাড়া নোট, একটা ঘড়ি, চাবির গোছা, এক প্যাকেট চুরুট–এসব। চোরটা ড্রেসিং টেবিলের দিকে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় ভদ্রলোক একটা গোঙানির মত শব্দ করে চোখ খুললেন। পরিস্থিতি দ্রুত বুঝে নিয়ে তিনি তাঁর ডান হাতটা বালিশের তলায় ঢোকালেন, কিন্তু বের করার সময় পেলেন না।

চোরটা তার দিকে পিস্তল তাক করে বলল, 'নড়বেন না।'

বিছানায় শোয়া ভদ্রলোকটি চোরের পিস্তলটির গোল মাথার দিকে তাকিয়ে যেমন ছিলেন তেমনিই স্থির হয়ে রইলেন।

এবার চোরটা হুকুম করল, 'দুটো হাত মাথার ওপরে তোলেন।'

যেসব দাঁতের ডাক্তাররা দাঁত তোলার সময় যন্ত্রণা হবে না বলে বিজ্ঞাপন দেন তাঁদের এক রকম ছোট কাঁচাপাকা ছুঁচলো দাড়ি থাকে। ভদ্রলোকটিরও সেরকম দাড়ি ছিল। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি সম্ভ্রান্ত, এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। একটু যেন বিরক্ত হয়েছেন বলে মনে হলো। বিছানায় উঠে বসে ডান হাতটা মাথার উপর তুললেন।

'আমি আপনাকে দুটো হাতই মাথার উপর তুলতে বলেছি। আপনি নিশ্চয় দুই পর্যন্ত গুনতে পারেন,' চোরটা বলল। 'এমনও হতে পারে যে আপনি বাঁহাতি লোক। কাজেই আপনাকে দুটো হাতই তুলতে হবে। তাড়াতাড়ি হাত তোলেন।'

ভাদ্রলোক মুখটা বিকৃত করে বললেন, 'ও হাতটা তুলতে পারি না।'

'কেন, ও হাতে কী হয়েছে?' চোর প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক বললেন, 'কাঁধে বাতের মত হয়েছে।'

'ফুলেছে নাকি?' চোরটা সহানুভূতি প্রকাশের স্বরে প্রশ্ন করল।

'ফুলেছিল, কিন্তু এখন ফোলাটা কমেছে,' ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

চোর দু'এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে একবার ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা জিনিসপত্রের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বিছানার উপর বসা ভদ্রলোকটির দিকে তাকাল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে হাসল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন। বললেন, 'ওরকম করে আমার দিকে চেয়ে ঠাট্টার হাসি হেসো না। চুরি করতে এসেছ, চুরি করো। ওই তো কতগুলো জিনিস পড়ে রয়েছে।'

চোর বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমারও একটু বাতের ব্যথা উঠল এক্ষুনি। আপনার জন্যে ভালই হয়েছে যে আমারও বাতের অসুখ আছে। আমারও আপনার মত বাম হাতে। আমি ছাড়া অন্য কোনও চোর হলে যখন আপনি বাম হাতটা তুলতে পারলেন না, তখনই আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলত।'

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'কতদিন হলো তোমার?'

'তা বছর চারেক হবে,' চোরটা বলল। 'আমার তো মনে হয় একবার যদি বাতে ধরে তা হলে সারাজীবন আর ছাড়ে না।'

ভদ্রলোক একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, কখনও ঝুমঝুমির তেল ব্যবহার করেছ?'

'পিপে পিপে ব্যবহার করেছি,' চোরটা বলল। 'আমি যত সাপের তেল ব্যবহার করেছি, সেগুলো যদি যোগ করা হয় তা হলে এখান থেকে ইন্ডিয়ানার ভ্যালপ্যারিসো যতদূর তার চেয়েও বেশি লম্বা হবে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কেউ কেউ চিজেলাম'স পিল ব্যবহার করে।'

চোর বলল, 'একেবারে বাজে জিনিস। আমি তিন মাস খেয়েছি, কোনও কাজ হয়নি। একবছর পটস পেন পালভাইজার আর কিংকেলহ্যামস ব্যবহার করে একটু আরাম পেয়েছিলাম। তবে আমার মনে হয় আমি পকেটে যে কাজু বাদাম রেখে দিতাম সেটা খেয়েই আসলে উপকার হয়েছিল।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যথাটা তোমার কখন বাড়ে, রাতে না সকালের দিকে।'

চোর বলল, 'রাতে; আর ঠিক ওই সময়টাতে কাজের চাপ সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা, এবার আপনার হাতটা নামিয়ে নেন। আপনি কি কখনও ব্লিকারস্টাকস ব্লাড বিল্ডার ব্যবহার করে দেখেছেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না, আমি কখনও ব্যবহার করিনি। তোমার ব্যথাটা কি মাঝে মাঝে হয়, নাকি সারাক্ষণ লেগে থাকে?'

চোর এবার বিছানায় এসে বসল। তারপর তার পিস্তলটা নিজের জোড়া হাঁটুর পাশে রাখল। বলল, 'মাঝে মাঝে হয়। আর এ-জন্যে আমি দোতলা বাড়িতে চুরি করা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ কয়েকবার মাঝখানেই আটকে গিয়েছিলাম। তবে আমার বিশ্বাস, এমনকী ডাক্তাররাও বলতে পারে না কীসে এ রোগ ভাল হয়।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি প্রায় হাজার ডলার খরচ করেছি, কিন্তু উপকার পাইনি,' ভদ্রলোক বললেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ফোলে?'

'হ্যাঁ ফোলে, বিশেষ করে সকালের দিকে,' চোর বলল। 'আর যখন বৃষ্টি হয়, তখন যে কী কষ্ট পাই!'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমিও। সামান্য এক ঝাপটা ভেজা হাওয়াও কখন ফ্লোরিডা থেকে এদিকে রওয়ানা দিল তা আমি এখান থেকেই বলে দিতে পারি।'

চোর এবার পিস্তলটা পকেটে রেখে আরাম করে বসল। বলল, 'আচ্ছা, আপনি কখনও অপোডেলভক ব্যবহার করেছেন?'

'একেবারে বাজে জিনিস,' ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন। 'তার চেয়ে রেস্টুরেন্টের মাখন মাখা ভাল।'

চোরও একমত পোষণ করল, 'ঠিকই বলেছেন। বাচ্চা ছেলেদের বেড়াল আঁচড়ে দিলে সেখানে লাগালে কাজ হলেও হতে পারে, কিন্তু ও-সব জিনিসে আমাদের কোনও উপকার হবে না। তবে একটা জিনিসে আরাম হয়, সেটা হলো ওয়াইন। ছোট্ট ওষুধ বটে, তবে বেশ আরামদায়ক। আচ্ছা, ওয়াইনের কথা যখন উঠলই, আজ না হয় চুরি করা বাদ যাক। চলেন, একসঙ্গে বেরিয়ে দুজনে কিছু পানাহার করা যাক, জামাকাপড় পরে নেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মাঝে মাঝে আমার এমন হয়, কারুর সাহায্য ছাড়া আমি জামাকাপড় পর্যন্ত পরতে পারি না। আমার চাকর টমাস বোধ হয় এখন ঘুমাচ্ছে...'

চোর বলল, 'আপনি ওঠেন, আমি আপনাকে জামা পরিয়ে দিচ্ছি।'

ভদ্রলোক তাঁর কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বোলালেন। ভদ্রতায় যেন বাধতে লাগল, বললেন, 'না, না, এটা খারাপ দেখায়।'

'আরে ওঠেন তো, এই নিন আপনার শার্ট,' শার্ট পরিয়ে দিতে দিতে চোর মন্তব্য করল। 'আমি একটা লোককে জানি, মাত্র দুই সপ্তাহ অম্বেরি'স অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করে এমন ভাল হয়ে গেল যে দু'হাত দিয়ে নিজের পোশাক পরতে তার আর অসুবিধা হত না।'

ঘর থেকে দুজনে একত্রে বেরিয়ে যাবার পথে ভদ্রলোক হঠাৎ পেছনে ফিরলেন। বললেন, 'সঙ্গে টাকা নিতে ভুলে গেছি, কাল রাতে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখেছিলাম।'

চোর তার ডান হাত ধরে থামিয়ে দিল। বলল, 'আসেন, আসেন, আমি আপনাকে আসতে বলেছি। টাকার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, আমার কাছে টাকা আছে। আচ্ছা, আপনি কখনও উইচ হ্যাজেল তেল মালিশ করে দেখেছেন?'

মূলঃ ও হেনরী

অনুবাদঃ শাহনেওয়াজ খান

বেড়াল বিভীষণ

আগস্টের শেষাশেষি, বৃষ্টিস্নাত, ঠাণ্ডা এক বিকেল। লেডি ব্লেমলি অতিথিদের নিয়ে বসে রয়েছেন চায়ের টেবিলে। হাঁ করে সবাই মি. কর্নেলিয়াস অ্যাপিনের কথা গিলছেন।

ভদ্রলোক লেডি ব্লেমলির মেহমান হওয়া সত্ত্বেও, ভাল মত তাঁকে চেনেন না তিনি। ব্লেমলি হাউজে তাঁকে থাকতে আমন্ত্রণ জানানোর একটাই কারণ, লোক মুখে জেনেছেন ভদ্রলোক নাকি বেশ চালাক-চতুর। কিন্তু বিকেলে চায়ের সময় এসে গেছে, এখন অবধি বুদ্ধিমত্তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাননি লেডি ব্লেমলি। ভদ্রলোক টেনিস খেলেন না, গান গাইতে জানেন না, এমনকী তাঁর বাকচাতুরিরও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এ মুহূর্তে মি. অ্যাপিন এমনই অত্যাশ্চর্য এক আবিষ্কারের কাহিনি ফেঁদেছেন, অতিথিরা পরম আগ্রহে শুনছেন।

'আপনি জন্তু-জানোয়ারকে দিয়ে কথা বলাতে পারেন বলতে চাইছেন?' স্যর উইলফ্রিড প্রশ্ন করলেন। 'আর আমাদের পোষা বেড়াল টবারমোরি আপনার প্রথম সাফল্য?'

'সতেরো বছর ধরে এ বিষয়ে গবেষণা করছি আমি,' বললেন মি. অ্যাপিন। 'কিন্তু সাফল্য পেয়েছি এই অল্প কিছুদিন হলো। হ্যাঁ, হাজারো জন্তু-জানোয়ার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি বটে, কিন্তু ইদানীং কাজ করছি শুধুমাত্র বেড়ালদের নিয়ে। বেড়াল

নিঃসন্দেহে বুনো জানোয়ার, যদিও সহজেই পোষ মানে। সব বেড়ালই বুদ্ধিমান, কিন্তু কিছু কিছু আছে অসম্ভব মেধাবী। এক সপ্তা আগে টবারমোরিকে প্রথম যখন দেখি, সাথে সাথে বুঝে যাই এ কোনও সাধারণ বেড়াল নয়। ও সত্যিই আমার ছাত্র হওয়ার উপযুক্ত। এবং ও সেটা প্রমাণও করে দিয়েছে।'

কেউ হেসে উঠলেন না, কেউ বললেন না 'ফালতু কথা,' ক্লভিসের ঠোঁট যদিও নড়ে উঠল নিঃশব্দে...

'টবারমোরি সহজ সহজ কথা বলতে আর বুঝতে পারবে দাবি করছেন?' জানতে চান মিস রেসকার।

'আমরা, মিস রেসকার,' ধৈর্য সহকারে বললেন মি. অ্যাপিন, 'ছোট বাচ্চাদের আর নির্বোধ বয়স্কদের ওভাবে শেখাতে চেষ্টা করি। কিন্তু টবারমোরির কথা আলাদা, ও অসম্ভব বুদ্ধিমান এক বেড়াল। ও আপনার আমার মতই সাবলীল ইংরেজি বলতে পারে।'

'ফালতু কথা!' জোর গলায় এবার বলে উঠল ক্লভিস।

স্যর উইলফ্রিড ভদ্রতা বজায় রাখলেও, স্পষ্ট বোঝা গেল গল্পটা তিনিও বিশ্বাস করেননি।

'বেড়ালটাকে এখানে ডেকে এনে দেখলেই তো হয়,' প্রস্তাব করলেন লেডি ব্লেমলি।

টবারমোরির খোঁজে গেলেন স্যর উইলফ্রিড।

'মি. অ্যাপিন আমাদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করবেন,' সহাস্যে বললেন মিস রেসকার। 'কিন্তু তাঁর দিকে নজর রাখলে দেখা যাবে, ঠোঁট নড়ছে।'

এক মিনিট বাদে ফিরে এলেন স্যর উইলফ্রিড, ভয়ানক উত্তেজিত।

'উনি ঠিকই বলেছেন!' বলে উঠলেন। 'স্মোকিং-রূমে

ঘুমাচ্ছিল টবারমোরি, ওকে চা খেতে ডাকলাম। মাথা তুলে একটা চোখ খুলল। "আয়, টবি, তোর জন্যে সবাই বসে আছে," বললাম আমি। ও ঠাণ্ডা গলায় বলে কী, "যখন সময় হবে নিজেই আসব!" আমি তো থ।'

অতিথিরা মুহূর্তে তর্কাতর্কি বাধিয়ে দিলেন, আর মি. অ্যাপিন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

এবার স্বয়ং টবারমোরি কামরায় প্রবেশ করে, চায়ের টেবিলের কাছে শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এল। থেমে গেল আলোচনা। কথা বলিয়ে বেড়ালের উদ্দেশে কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না কেউ। অবশেষে মুখ খুললেন লেডি ব্লেমলি: 'দুধ খাবি, টবারমোরি?' চড়া আর অস্বাভাবিক শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর।

'মন্দ হয় না,' জবাব দেয় টবারমোরি। লেডি ব্লেমলির হাতে এমনই কাঁপুনি উঠল, খানিকটা দুধ চলকে পড়ে গেল কার্পেটে।

'ওহ হো! আমি দুঃখিত,' বললেন তিনি।

'অসুবিধা নেই। কার্পেটটা কী আমার নাকি?' বলে টবারমোরি।

আবার নিস্তব্ধতা ঘনাল কামরার ভিতর। শেষমেশ মিস রেসকার বিনীত সুরে জানতে চাইলেন, 'ইংরেজি শিখতে তোমার কষ্ট হয়নি তো, টবারমোরি?'

বেড়ালটার উজ্জ্বল সবুজ চোখজোড়া বিদ্ধ করল মহিলাকে। আগ্রহ জাগায় না, এমন প্রশ্নের জবাব দেয় না সে।

'মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?' এবার মেভিস পেলিংটন জানতে চান।

'কার বুদ্ধিবৃত্তি?' শীতল কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করে টবারমোরি।

'এই ধরো, আমারই,' অল্প হেসে বললেন মেভিস।

'বিপদে ফেলে দিলেন,' গম্ভীর চালে বলল টবারমোরি, যদিও

তাকে এতটুকু বিব্রত মনে হলো না। 'লেডি ব্লেমলি আপনাকে দাওয়াত দিতে চাওয়ায়, স্যর উইলফ্রিড মোটেও খুশি হননি। "মেভিস পেলিংটন একটা বোকার হদ্দ," বলেন তিনি। "আরে সেজন্যেই তো ডাকতে চাইছি," জবাব দেন লেডি ব্লেমলি। "আমার পুরানো গাড়িটা গছাতে হবে না?" '

'মিথ্যে কথা।' চেঁচিয়ে ওঠেন লেডি ব্লেমলি। 'এই, মেভিস, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না, ভাই।'

'মিথ্যেই যদি হবে,' হিম কণ্ঠে বলেন মেভিস, 'তা হলে আজ সকালে গাড়িটার অত প্রশংসা করছিলে কেন?'

নিমন্ত্রণকর্ত্রী জবাব খুঁজে পান না। মেজর বারফিল্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন প্রসঙ্গ পাল্টাতে। 'তোমার সাদা-কালো বান্ধবীটার কথা বলো, টবারমোরি। কেমন চলছে ওর সাথে?'

সবাই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করলেন, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন মেজর।

বরফশীতল চাহনি হানল ওঁর উদ্দেশে টবারমোরি। 'ভদ্র সমাজে আমরা সাধারণত এসব বিষয়ে আলোচনা করি না,' বলল। 'অবশ্য আপনি এ বাড়িতে আসার পর থেকে কিছু কিছু ব্যাপার আমার চোখে পড়েছে। কী, বলব আপনার বান্ধবীদের কথা?'

মেজরের মুখের চেহারা মুহূর্তে গনগনে লাল, অন্যান্য মেহমানদের চোখে-মুখেও উদ্বেগ আর অস্বস্তি দেখা গেল। টবারমোরি এরপর কোন্ প্রসঙ্গ টেনে আনবে কে জানে।

'টবারমোরি, তুই না হয় এখন রান্নাঘরে যা,' মধু ঝরালেন লেডি ব্লেমলি। 'দেখগে, বাবুর্চি তোর ডিনার রেডি করল কিনা।'

'ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না,' বলল টবারমোরি। 'এইমাত্র চা খেয়েছি। বেশি খেয়ে শেষে মরব নাকি?'

'বেড়ালের নয়টা জান, জানিস না?' হেসে বললেন স্যার উইলফ্রিড।

'হয়তো,' উন্নাসিক কণ্ঠে বলে টবারমোরি। 'কিন্তু পেট একটা।'

'লেডি ব্লেমলি!' চেঁচিয়ে ওঠেন মিসেস করনেট, 'নচ্ছাড় বেড়ালটাকে রান্নাঘরে যেতে দেবেন না। ও বাবুর্চিকে আমাদের সব কথা বলে দেবে!'

ভয়ে বুক দুরুদুরু করতে লাগল সবার। সবাই ঢোক গিলে ভাবছেন, বেড়ালটা দিন-রাত বাড়ির ভিতর আর বাগানে স্বাধীনভাবে ঘুরঘুর করে বেড়িয়েছে, মন চাইলেই এর-ওর বেডরুমে উঁকিঝুঁকি মেরেছে। কী দেখতে কী দেখে ফেলেছে কে জানে বাবা। কী শুনেছে তাই বা কে বলতে পারে। এখন আর কারও কোনও গোপনীয়তা রইল না।

'ওহ, কেন যে মরতে এসেছিলাম এখানে?' হাহাকার করে ওঠেন মিস অ্যাগনেস রেসকার, দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকা তাঁর ধাতে নেই।

'কেন এসেছেন ভাল করেই জানেন,' ফট করে জবাব দেয় টবারমোরি। 'খাওয়ার লোভে। বাগানে যখন মিসেস করনেটের সাথে গল্প করছিলেন আমি সব শুনে ফেলেছি। আপনি বলছিলেন, ব্লেমলিরা স্বামী-স্ত্রী ভয়ানক বিরক্তিকর মানুষ, কিন্তু তাদের বাবুর্চিটা খাসা।'

'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না!' চেঁচিয়ে ওঠেন অ্যাগনেস। 'আমি কক্ষনো ও কথা বলিনি, কী, বলেছি, মিসেস করনেট?'

'পরে, মিসেস করনেট আপনার কথাগুলো বার্টি ফন তাহনের কাছে পুনরাবৃত্তি করেন,' বলে টবারমোরি। 'তিনি বলেন, "চার বেলা মজার মজার খেতে পেলে ওই রেসকার মেয়েলোকটার

নরকে যেতেও আপত্তি নেই।" আর বার্টি বলেন–' ৮

ঠিক এমনি সময় জানালা পথে বাগানে দৃষ্টি প্রসারিত হয় টবারমোরির। ডাক্তারের হলদে হুলোটা বাগান পার হচ্ছে। মুহূর্তে খোলা জানালা গলে বেরিয়ে পড়ে ও।

আর এই সুযোগে অতিথিরা একযোগে মুখ খোলেন। সবার ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলেন মি. অ্যাপিন। ঝাঁঝাল প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হলো তাঁকে।

'এক্ষুণি সব বন্ধ করুন,' সবার এক কথা। 'টবারমোরি অন্যান্য বেড়ালদের কথা বলতে শেখালে কী অবস্থাটা হবে ভেবে দেখেছেন? এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি পাব কেউ?'

'মালির সাদা-কালো বেড়ালটাকে সম্ভবত শেখানো হয়েও গেছে,' চিন্তামগ্ন হন মি. অ্যাপিন। 'কিন্তু অন্যগুলোকে শেখানোর মত সময় পেয়েছে বলে মনে হয় না।'

'সেক্ষেত্রে,' বললেন মিসেস করনেট, 'যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, টবারমোরি আর ওর বান্ধবীকে মরতে হবে। আপনি কী বলেন, লেডি ব্লেমলি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই তো,' সায় দিয়ে বললেন লেডি ব্লেমলি। 'টবারমোরিকে আমরা ভীষণ ভালবাসি—মানে, বিকেলের আগ পর্যন্ত বাসতাম আর কি—কিন্তু এখন, যত শীঘ্রি সম্ভব ওটাকে নিকেশ করতে হবে।'

'ওর খাবারে বিষ মিশিয়ে দেব,' বললেন স্যার উইলফ্রিড, 'আর মালির বেড়ালটাকে আমি নিজের হাতে খুন করব। মালি অবশ্য ঘ্যান ঘ্যান করবে, কিন্তু বুঝিয়ে বলতে হবে ওটার মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ আছে—'

'কিন্তু আমার আবিষ্কারের কী হবে?' হায় হায় করে ওঠেন মি. অ্যাপিন। 'আমার এত বছরের সাধনা! আমার একমাত্র সফল

ছাত্রটাও আপনাদের কারণে প্রাণ হারাবে?'

'গরুর খামারে গিয়ে ওদেকে শেখান না, কে মানা করেছে,' ঠাণ্ডা সুরে বলেন মিসেস করনেট। 'কিংবা চিড়িয়াখানার হাতিদের। আমি শুনেছি, হাতি খুবই চালাক প্রাণী, আর তারা চেয়ারের পিছনে, খাটের নীচে লুকিয়ে থেকে লোকের কথাও শুনতে আসে না।'

মি.অ্যাপিন হাড়ে হাড়ে টের পেলেন, তিনি কোথায় মার খেয়ে গেছেন।

সে রাতে আর ডিনার-পর্ব জমল না। মালির বেড়াল এবং পরে মালিকে সামলাতে রীতিমত বেগ পেতে হলো স্যর উইলফ্রিডকে। অ্যাগনেস রেসকার, হাজার সাধাসাধির পরও, কিছুই মুখে দিলেন না। আর মেভিস পেলিংটন নীরবে খাওয়া সারলেন। সবাই টবারমোরির জন্যে অপেক্ষা করছেন। ডাইনিংরুমে থালা ভর্তি বিষ মিশানো মাছ তৈরি আছে, ও এলেই পরিবেশন করা হবে। কিন্তু পরম আকাঙ্ক্ষিত অতিথিটির আসার নাম নেই। মেহমানদের মুখে কথা নেই, হাসি নেই। দম বন্ধ পরিবেশ।

ডিনারের পর, অতিথিদের নিয়ে ব্লেমলি দম্পতি স্মোকিং-রুমে এসে বসলেন। সবাই চুপচাপ আর উৎকণ্ঠিত, কেউ তাস পেটাতে আগ্রহী নন। এগারোটার দিকে বাবুর্চি ও হাউজকীপার শুতে গেল। টবারমোরির জন্যে যথারীতি খোলা রাখা হয়েছে জানালা, কিন্তু তার দেখা নেই।

দুটোর দিকে ক্লভিস নীরবতা ভঙ্গ করল।

'ও আজ রাতে আর ফিরবে না। দেখুনগে, খবরের কাগজে ওর স্টোরি ফেরি করে বেড়াচ্ছে। সাংবাদিকরা লুফে নেবে। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা লাখে একটা মেলে না।'

এরপর সবাই শুতে গেলেন, কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই।

সকাল হলো, তবু টবারমোরি এল না। নাস্তা-পর্বও নীরবে, অস্বস্তির সঙ্গে সারা হলো। অবশেষে কফি পান চলছে, এমনিসময় টবারমোরির রক্তাক্ত দেহটা নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল মালি।

'থাবাগুলো দেখেছেন!' বলে ওঠে ক্লভিস। 'মারামারি করছিল!' টবারমোরির নখরে, ডাক্তারের হুলোটার হলদে লোম লেগে রয়েছে।

লাঞ্চ নাগাদ অতিথিদের বেশিরভাগ ব্লেমলি হাউজ ত্যাগ করলেন। লেডি ব্লেমলির মনে শান্তি ফিরে এল। কাগজ-কলম টেনে নিলেন তিনি। তাঁর মহামূল্যবান বেড়ালটির মৃত্যুতে, কড়া করে এক চিঠি লিখে ফেললেন ডাক্তারের উদ্দেশে।

টবারমোরি ছিল মি. অ্যাপিনের একমাত্র সফল শিষ্য। ওর মৃত্যুর কয়েক হপ্তা পর, ড্রেসডেন চিড়িয়াখানা থেকে এক হাতি পালাল। তার আক্রমণে মারা পড়লেন এক ইংরেজ দর্শনার্থী।

চিড়িয়াখানা-রক্ষকের ভাষা থেকে জানা গেল, আগে অতি শান্ত-শিষ্ট, নিরীহ ছিল জানোয়ারটা। কিন্তু ইংরেজ দর্শকটির ওপর হঠাৎই খেপে ওঠে, ভদ্রলোক কী সব কথা যেন বলছিলেন হাতিটার সাথে।

খবরের কাগজে দর্শকটির নাম বেরিয়েছে। মি. কর্নেলিয়াস অ্যাপিন।

'হাতি বেচারীকে কঠিন কঠিন জার্মান ক্রিয়াপদ শেখাতে গেলে,' মন্তব্য করল ক্লভিস, 'এমন তো হবেই।'

মূল: সাকি

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

আবিষ্কারের বিড়ম্বনা

গম্ভীর মুখে নিজের ছোট্ট, অপরিসর ল্যাবরেটরিতে বসে আছেন প্রফেসর ওয়াল্টার সিলস। বেশিরভাগ সময় মুখ গোমড়া করেই থাকেন তিনি। কারণ জীবন তাঁর কাছে নিরানন্দ এবং কঠিন। খুব কষ্টে সৃষ্টে দিন চলছে ওয়াল্টার সিলসের। মাঝে মাঝে আকরিক বিশ্লেষণ করে আর কয় পয়সাই বা মেলে? অথচ অন্যেরা, যারা বাইরের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কাজ করছে, তারা সিলসের কয়েকগুণ বেশি অর্থ উপার্জন করে।

জানালা দিয়ে হাডসন নদীর দিকে তাকালেন ওয়াল্টার সিলস। পড়ন্ত সূর্যের আবিরে লাল টকটকে নদীর জল। সিলস ভাবছেন তাঁর এবারের গবেষণা ফলপ্রসূ হবে কিনা। যদি হয় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবেন তিনি। আর না হলে? থাক, সে কথা না বলাই ভাল।

ভেজানো দরজাটা ক্যাঁঅ্যাঅ্যাচ শব্দে খুলে গেল। উঁকি দিল প্রফেসরের সদা হাস্যময় সহকারী ইউজেনি টেলর। ওকে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন সিলস। ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ইউজেনি।

'হ্যাল্লো, প্রফেসর,' হাসি হাসি মুখে বলল সে। 'চলছে কেমন?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'তোমার মত জীবনটাকে সহজভাবে দেখতে পারলেই ভাল হত, জেনি।

তোমার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি কিছুই ভাল চলছে না। আমার টাকার দরকার। আর যত টাকা আমি চাই ততই কম পাই।'

'আমার পকেটও ফাঁকা,' বলল ইউজেনি। 'তাতে কি? পকেটে পয়সা নেই বলে কি আমি মুখ গোমড়া করে থাকি? আপনার পঞ্চাশ চলছে। বিয়েও করেননি। মাথায় দ্রুত টাক পড়ে যাবার দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কোন বিষয় নিয়ে আপনার ভাববার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না আমার। আমি ত্রিশে পা দিয়েছি। খামোকা দুশ্চিন্তা করে এই বয়সেই আমার সুন্দর, বাদামী চুলগুলো হারাতে চাই না। সে যাক। নতুন আইডিয়ার কি খবর বলুন তো?'

'দেখবে? বেশ চলো।'

সিলসের পেছন পেছন একটা ছোট টেবিলের ধারে চলে এল টেলর। টেবিলের ওপর সারি সারি টেস্ট টিউব। এর একটার মধ্যে আধ ইঞ্চির মত চকচকে ধাতব কি একটা পদার্থ রাখা। 'এটাকে সোডিয়াম-মার্কারী মিকশ্চার বা সোডিয়াম অ্যামালগামও বলতে পারো,' জিনিসটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন সিলস।

'অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সল্যুশন' লেখা একটা বোতল তুলে নিলেন তিনি শেলফ থেকে। খানিকটা ঢাললেন টিউবে। সাথে সাথে সোডিয়াম অ্যামালগামের চেহারা বদলাতে শুরু করল, রূপান্তর ঘটল স্পঞ্জের মত একটা জিনিসে।

'ওটা,' ওদিকে চোখ রেখে বললেন প্রফেসর, 'অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম। অ্যামোনিয়াম র‍্যাডিকাল (NH4) এখানে ধাতব হিসেবে কাজ করছে, মিশছে পারদের সঙ্গে।' মিশ্রণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি। তারপর ঢাললেন লিকুইড।

'অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম খুব বেশি টেকসই নয়,' জানালেন টেলরকে। 'কাজেই দ্রুত কাজ করতে হবে।' ফেকাসে হলুদ রঙের, সুগন্ধযুক্ত একটা লিকুইডের ফ্লাস্ক হাতে নিলেন প্রফেসর,

তারপর ওটা ঢাললেন টিউবে। কিছুক্ষণ টিউবটা ঝাঁকানোর পরে অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম অদৃশ্য হয়ে গেল, তলায় পড়ে রইল ছোট্ট, ধাতব এক টুকরো লিকুইড।

হাঁ করে টেস্ট-টিউবের দিকে তাকিয়ে রইল টেলর, 'কি হলো?'

'এই লিকুইড হলো হাইড্রাজিন থেকে প্রাপ্ত বস্তু। এ জিনিসটিই আমার আবিষ্কার। এর নাম দিয়েছি অ্যামোনালিন। এটার ফর্মুলা নিয়ে এখনও কাজ করিনি তবে তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হলো এটা অ্যামালগাম থেকে অ্যামোনিয়াম গলিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে। টিউবের তলার ওই ড্রপগুলো খাঁটি পারদ। অ্যামোনিয়াম এখন দ্রবীভূত।'

টেলর চুপ করে রইল। সিলস উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছেন, 'এর মানে বুঝতে পারছ না? খাঁটি অ্যামোনিয়াম বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে গেছি আমি। আমার আগে এ কাজ আর কেউ করেনি। কাজটার সফল সমাপ্তি মানে খ্যাতি, সাফল্য, নোবেল প্রাইজ আরও কত কি!'

'ওয়াও!' এতক্ষণে বুলি ফুটল টেলরের মুখে, 'দেখি তো জিনিসটা।' টিউবের দিকে হাত বাড়াল সে। তাকে বাধা দিলেন সিলস।

'কাজ এখনও শেষ হয়নি, জেনি। এটার ফ্রি মেটালিক পর্যায়ে আমাকে যেতে হবে। যখনই অ্যামোনালিনকে অদৃশ্য করে ফেলতে যাই, ভেঙে পড়ে অ্যামোনিয়াম...তবে এ সমস্যার সমাধান আমি করবই!'

হপ্তা দুয়েক পরের ঘটনা। ঘটনাস্থল ওয়াল্টার সিলসের গবেষণাগার। রসায়নবিদ বন্ধু এবং গুরুর কাছ থেকে জরুরী

ফোন পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে টেলর। ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই জানতে চাইল, 'সমস্যার সমাধান হয়েছে?'

'হয়েছে। যা ভেবেছি তারচে' অনেক বেশি পেয়ে গেছি।' বললেন প্রফেসর। 'আসলে আমার শুরুটাই ছিল ভুল পদ্ধতিতে। দ্রাবকটাকে গরম করে নিতাম আমি। ফলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়াম সব সময় ভেঙে যেত। এবার ফ্রিজিং পদ্ধতিতে ওটাকে আলাদা করে নিয়েছি। লবণ জারণ করার মত ঘটনাটা ঘটেছে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে ওটা বরফে পরিণত হয়েছে। ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেই ফ্রিজ হয়েছে অ্যামোনালিন।'

ছোট একটি বীকারের (রাসায়নিক কাজে ব্যবহৃত কাঁচের পাত্র) দিকে আঙুল তুলে দেখালেন তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে। একটা কাঁচের কেসের মধ্যে বীকারটা। বীকারের মধ্যে ম্লান, হলদে রঙের, ছুঁচের মত ক্রিস্টাল। ক্রিস্টালের ডগায় হলুদ রঙের পাতলা একটা আস্তরণ।

'কেস কেন?' জিজ্ঞেস করল টেলর।

'অ্যামোনিয়াম ঠিক রাখতে আর্গন (বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস) ভরতে হয়েছে আমাকে। গ্যাসটা খুবই কাজের।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে তাকাল টেলর, খুশি মনে পিঠ চাপড়ে দিল।

'দাঁড়াও, জেনি। আরও আছে।'

টেলরকে ঘরের আরেক প্রান্তে নিয়ে গেলেন সিলস। কাঁপা আঙুল তুলে আরেকটি এয়ার টাইট কেস দেখালেন। ওতে এক খণ্ড হলুদ রঙের ধাতু তীব্র আলোকছটা নিয়ে ঝলসাচ্ছে। 'বন্ধু, ওটা হলো অ্যামোনিয়াম অক্সাইড (NH4O2) ওটা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয়। ওটা দিয়ে সহজে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা যায়। তবে জিনিসটাকে সোনার মত দেখাচ্ছে, তাই না? এটার সম্ভাব্যতা

দেখতে পাচ্ছ তুমি?'

'আমি দেখতে পাচ্ছি?' লাফিয়ে উঠল টেলর। 'আরে এ জিনিসে সারা দেশ ভরে যাচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছি আমি। আপনি এ দিয়ে অ্যামোনিয়াম গহনা, অ্যামোনিয়াম প্লেটের টেব্ল্-অয়্যার সহ আরও কত শত জিনিস যে বানাতে পারবেন। তাছাড়া এ দিয়ে শিল্প কারখানায় আরও কত কাজে যে লাগবে তা কে জানে? আপনি বড় লোক হয়ে গেছেন, ওয়াল্ট, বড় লোক!'

'আমরা বড়লোক হয়ে গেছি,' তাকে শুধরে দিলেন প্রফেসর। পা বাড়ালেন টেলিফোনের দিকে। 'সংবাদপত্রগুলোকে আমার যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্পর্কে জানানো দরকার।'

'কিন্তু ব্যাপারটা আরও ক'টা দিন গোপন রাখলে ভাল হত, প্রফেসর,' কপালে ভাঁজ পড়েছে টেলরের।

'আরে, আমি ওদেরকে স্রেফ সাধারণ একটা আইডিয়ার কথা জানাব। তাছাড়া আমাদের কোন সমস্যা হবে না। কারণ প্যাটেন্ট অ্যাপ্লিকেশনটা এ মুহূর্তে ওয়াশিংটনে।'

প্রফেসর সিলস ভেবেছিলেন কোন ঝামেলা হবে না। কিন্তু বড় ধরনের ঝামেলা হয়ে গেল। পরবর্তী দুটো দিন ওদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল।

অ্যাকমে ক্রোমিয়াম অ্যান্ড সিলভার প্লেটিং কর্পোরেশনের অত্যন্ত বদমেজাজী মালিক শিল্পপতি জে থ্রগমর্টন ব্যাঙ্কহেড সকালে নাস্তার টেবিলে বসে রুটিতে মাখন লাগাচ্ছিলেন আর খবরের কাগজে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক শিল্পপতির খবর পড়ে তার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছিলেন। রেগে গেলে তাঁর মুখ লাল হয়ে ওঠে, বেড়ে যায় প্রেশার। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পপতির চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে গিয়ে নয়, তাঁর প্রেশার মাথায় উঠে গেল আরেকটি

খবর পড়ে। খবরটির শিরোনাম এরকম: 'পণ্ডিত রসায়নবিদের সোনার বিকল্প আবিষ্কার,' ব্রেড গিলে মাত্র ধূমায়িত কফির কাপ হাতে নিয়েছেন থ্রগমর্টন, খবরটা দেখে কাপটা তাঁর হাতেই রয়ে গেল, মুখে তোলা হলো না। দ্রুত পড়ে ফেললেন খবরটি: 'এই নতুন ধাতুটি,' লেখা হয়েছে, 'সম্পর্কে এর আবিষ্কর্তা বলছেন এটি ক্রোমিয়াম, নিকেল বা সিলভারের চেয়েও উন্নত এবং এই ধাতু দিয়ে তৈরি গহনার মূল্যও পড়বে অনেক কম।'

এ পর্যন্ত পড়েই থেমে গেলেন জে. থ্রগমর্টন। কল্পনায় দেখতে পেলেন নতুন ধাতুর কাছে মার খেয়েছে তাঁর ক্রোমিয়াম এবং সিলভার, ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য। সাথে সাথে প্রেশার উঠে গেল থ্রগমর্টনের। হাত কাঁপতে শুরু করল। কাঁপা হাতে ধরা কফির কাপ থেকে গরম কফি ছলকে পড়ল উরুতে। 'আউ!' করে উঠলেন থ্রগমর্টন। একই সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কফির কাপ। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙল ওটা। তার স্ত্রী ভয়ানক আঁতকে উঠল।

'কি হয়েছে, জোসেফ? কি হয়েছে?' বলতে বলতে এগিয়ে এল সে।

'কিছু হয়নি,' খেঁকিয়ে উঠল থ্রগমর্টন। 'এখান থেকে যাও তুমি।'

বলে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন, ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। আর তার স্ত্রী ভাঙা কফির কাপের দিকে নজর না দিয়ে পত্রিকায় চোখ বুলাতে লাগল। হন্যে হয়ে খুঁজছে সেই খবর যা তার বদরাগী স্বামীকে ভয়ানক রাগিয়ে দিয়েছে।

ফিফটিনথ স্ট্রীট-এ 'বব'স ট্যাভার্ন'-এ প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান পিটার কিউ হর্নসওগল বরাবরের মত উজির-নাজির মারছিল।

কংগ্রেসে থাকাকালীন সে কি কি মহা কাণ্ড ঘটিয়েছে তারই বানানো গপপো। কয়েকজন আগ্রহ নিয়ে শুনছে তার গল্প। বার টেন্ডারের হাতে খবরের কাগজ। তবে পড়ছে না সে। হাঁ করে গল্প শুনছে। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ কাগজের বিশেষ একটা খবরের দিকে নজর আটকে গেল হর্নস্‌ওগলের। এ খবরটাই উত্তেজিত করে তুলেছিল শিল্পপতি জে. গ্রগমর্টনকে। পিটারও খবরটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে তার শ্রোতাদের দিকে ফিরে বলল, 'বন্ধুগণ, সিটি হল-এ খুব জরুরী একটা কাজ আছে আমার। এক্ষুণি যেতে হবে সেখানে।' সে বার-কীপারের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল, 'তোমার কাছে পঁচিশ সেন্ট হবে, ভায়া? আমার মানি ব্যাগটা আবার মেয়রের অফিসে ফেলে এসেছি ভুলে। কাল টাকাটা দিয়ে দেব।'

শত হলেও প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান! মানি ব্যাগ ভুল করে কোথাও ফেলে আসতেই পারে। বারম্যান পঁচিশ সেন্ট দিল পিটারকে। টাকাটা চট করে পকেটে পুরে বার থেকে বেরিয়ে এল পিটার কিউ হর্নসওগল্।

ফার্স্ট অ্যাভিন্যুর ঘিঞ্জি কোন এক এলাকার ছোট, স্বল্পালোকিত একটি ঘর। মাইকেল ম্যাগুয়ের, পুলিশের খাতায় যার নাম লেখা আছে মাইক দ্য স্লাগ, সে তার রিভলভার পরিষ্কার করতে করতে একটি গানের সুর ভাঁজছিল। হঠাৎ দরজায় শব্দ হতে মুখ তুলে তাকাল মাইকেল।

'স্ল্যাপি?'

'হ, বস্।' ভেতরে ঢুকল বেঁটেখাটো, হাড়গিলে চেহারার রোগাপাতলা এক লোক। 'আপনের লাইগ্যা খবরের কাগজ আনছি। পুলিশ অহনো ভাবতাছে হেইদিনকার কামডা ব্রাগোনিই

ঘটাইছে।'

'তাই নাকি? বেশ বেশ।' নিজের রিভলভারের ওপর আবার ঝুঁকে পড়ল মাইকেল। 'আর কিছু?'

'না। এক মহিলা আত্মহত্যা করছে। এই নেন। পড়েন।'

মাইককে খবরের কাগজটা দিয়ে চলে গেল স্ন্যাপি। মাইক কাগজের পাতা ওল্টাতে লাগল।

একটি খবরের হেডলাইনে তার দৃষ্টি আটকে গেল। ছোট্ট খবর। আগ্রহ নিয়ে পড়ল মাইক। পড়া শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল কাগজ। সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করল। তারপর দরজা খুলে ডাকল, 'অ্যাই, স্ন্যাপি। শুনে যাও। তোমার জন্যে একটা কাজ আছে।'

বেশ খুশি খুশি লাগছে প্রফেসর ওয়াল্টার সিলসকে। ল্যাবরেটরিতে দৃপ্ত পায়ে পায়চারী করছেন। নিজেকে রাজা মনে হচ্ছে। ইউজেনি টেলর বসে আছে। দেখছে ওকে। তাকে তেমন উৎফুল্ল মনে হচ্ছে না।

'বিখ্যাত হতে কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল টেলর সিলসকে।

'মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে পারলে যেমন লাগবে তেমন লাগছে। মিলিয়ন ডলারেই অ্যামোনিয়াম মেটাল-এর রহস্য বিক্রি করে দেব স্থির করেছি। ঈগল স্টিল-এর স্ট্যাপলস-এর সঙ্গে কথা হবে আজ। ভাল দাম দেবে বলেছে।'

বেজে উঠল ডোর বেল। বেলের শব্দে লাফিয়ে উঠল সিলস, দৌড়ে গিয়ে খুলল দরজা।

'এটা কি ওয়াল্টার সিলস-এর বাড়ি?' ঘোঁৎ ঘোৎ করে জানতে চাইলেন লম্বা, চওড়া এক লোক। অবজ্ঞার দৃষ্টি চোখে।

'জ্বী। আমিই সিলস। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার নাম জে. থ্রগমর্টন ব্যাঙ্কহেড। আমি অ্যাকমে ক্রোমিয়াম অ্যান্ড সিলভার প্লেটিং কর্পোরেশনের মালিক। আপনার সাথে কথা আছে।'

'ভেতরে আসুন! ভেতরে আসুন! ইনি ইউজেনি টেলর, আমার সহকারী। ওঁর সামনেই যা বলার স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।'

'বেশ,' বিশাল শরীর নিয়ে ধপ করে একটা চেয়ারে বসলেন থ্রগমর্টন। 'আমার আগমনের কারণ বোধহয় অনুমান করতে পারছেন।'

'আমার নতুন অ্যামোনিয়াম মেটালের খবরটা শুনেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি দেখতে এসেছি ব্যাপারটা সত্যি কিনা। সত্যি হলে আপনার আবিষ্কার আমি কিনে নিতে চাই।'

'সত্যি না মিথ্যা নিজেই যাচাই করে দেখুন, স্যার,' সিলস বিজনেস ম্যাগনেটকে নিয়ে আর্গন ভর্তি কন্টেনারের সামনে নিয়ে গেলেন। ওতে খাঁটি অ্যামোনিয়াম ধাতুর কয়েক গ্রাম পড়ে আছে।

'ওই যে ধাতুটা। ডান দিকে তাকান। ওটা অক্সাইড। এমন অক্সাইড যা নিজের বৈশিষ্ট্যকে ছাড়িয়ে গিয়ে অনেক বেশি ধাতব হয়ে উঠেছে। এই অক্সাইডকেই কাগজঅলারা নাম দিয়েছে বিকল্প সোনা।'

বিতৃষ্ণা নিয়ে অক্সাইড দেখলেন থ্রগমর্টন ব্যাঙ্কহেড। বললেন, 'ওটা বাইরে আনুন। ভাল করে দেখি।'

ডানে-বামে মাথা নাড়লেন সিলস। 'তা সম্ভব নয়, মি. ব্যাঙ্কহেড়, ওগুলো প্রথম অ্যামোনিয়ামের স্যাম্পল। ওগুলো মিউজিয়াম পিস। সংরক্ষণের জন্যে। চাইলে আপনার জন্যে কিছু বানিয়ে দিতে পারি।'

'এ থেকে টাকা পেতে চাইলে কাজটা তো করতেই হবে,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন ব্যাঙ্কহেড। 'আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আপনার পেটেন্ট আমি এক হাজার ডলারে কিনে নিতে রাজি।'

'এক হাজার ডলার?' এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সিলস এবং টেলর।

'যথেষ্ট ভাল দাম বলা হয়েছে, ভদ্রমহোদয়গণ।'

'ওর দাম মিলিয়ন ডলারেরও বেশি,' রাগে গরগর করে উঠল টেলর। 'এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। একটা সোনার খনি।'

'এক মিলিয়ন! আপনারা আসলে স্বপ্ন দেখছেন, ভদ্রমহোদয়গণ। সত্যি বলতে কি আমার কোম্পানি অ্যামোনিয়ামের ওপর কয়েক বছর ধরে গবেষণা করে আসছে। সমস্যাটার সমাধান প্রায় করে এনেছি আমরা। তার আগেই, দুর্ভাগ্যবশত এ জিনিস আপনারা আবিষ্কার করে বসলেন। এ কারণেই আপনাদের প্যাটেন্ট আমি কিনে নিতে চাই। আপনারা বিক্রি করতে না চাইলে আমরা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ধাতুটা বাজারজাত করব।'

'করেই দেখুন। স্রেফ মামলা ঠুকে দেব,' হুমকি দিল টেলর।

'দীর্ঘদিন মামলা চালানোর মত ক্ষমতা পকেটের আছে তো?' খ্যাকখ্যাক হাসলেন ব্যাঙ্কহেড। 'আমার আছে। তবে আমি একেবারে অবিবেচক নই। দামটা আরও এক হাজার বাড়িয়ে দিতে পারি।'

'আমাদের দামের কথা তো শুনেছেনই,' পাথর গলায় বলল টেলর, 'এর বেশি কিছু আমাদের বলার নেই।'

'ঠিক আছে, ভদ্রমহোদয়গণ,' দরজার দিকে পা বাড়ালেন ব্যাঙ্কহেড।

'বিষয়টি নিয়ে আবার ভেবে দেখতে বলছি। আপনারা আমার কথাই শেষে মেনে নেবেন এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

দরজা খুললেন ব্যাঙ্কহেড। মুখোমুখি হয়ে গেলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য পিটার কিউ হর্নসওগলের। সে দরজার কী হোলে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফট করে দরজা খুলে যেতে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ব্যাঙ্কহেড তার দিকে তাকিয়ে নাক সিটকালেন, তারপর গটগট করে চলে গেলেন। সাথে সাথে ভেতরে ঢুকে পড়ল হর্নসওগল। বন্ধ করে দিল দরজা। তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সিলস এবং টেলর।

ব্যাঙ্কহেডের গমন পথের দিকে আঙুল তুলে দেখাল হর্নসওগল। 'ওই লোকটা, ডিয়ার স্যার, প্রচণ্ড ধনী একজন মানুষ। তবে এ দেশের অর্থনীতিরও বারোটা বাজাচ্ছে লোকটা। ওই লোকের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন আপনারা।' বুকে হাত বেঁধে মিষ্টি করে হাসল সে ওদের দিকে তাকিয়ে।

'আপনি কে?' বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল টেলর।

'আমি?' ওদের চেয়েও বেশি অবাক হয়েছে হর্নসওগল। 'কেন আমি–ইয়ে–পিটার কুইনটাস হর্নসওগল, আমাকে চিনতে পারলেন না! আমি গত বছরও হাউজ অভ রিপ্রেজেনটেটিভস-এ ছিলাম।'

'আপনার নাম কখনও শুনিনি। কি চান?'

'খবরের কাগজে আপনাদের আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শুনে ছুটে এসেছি সাহায্যের জন্যে।'

'কিসের সাহায্য?'

'আপনাদেরকে সাহায্য করতে চাই, স্যার। আপনারা তো আর বাইরের জগৎটাকে ভাল চেনেন না। নতুন আবিষ্কার

আপনাদের অনেক বিপদ ডেকে আনতে পারে! ব্যাঙ্কহেডের মত বহু ধুরন্ধর মানুষ ওঁৎ পেতে আছে আপনাদের আবিষ্কার হাতিয়ে নেয়ার জন্যে। আমি এসব মানুষ ভাল চিনি। এদের নিয়ে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতাও প্রচুর। কাজেই আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব। যেমন–'

'কোন প্রয়োজন নেই,' এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন প্রফেসর, উঠে দাঁড়ালেন। 'বেরিয়ে যান! আমার কথা কানে যাচ্ছে? পুলিশ ডাকার আগেই এখান থেকে কেটে পড়ুন।'

'প্রফেসর সিলস, দয়া করে উত্তেজিত হবেন না,' সিলসের রাগী চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য। দরজার দিকে পা বাড়াল। টেলর খুলে দিল দরজা। হর্নসওগল চৌকাঠের বাইরে পা রাখা মাত্র দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

একটা চেয়ারে বসে পড়লেন সিলস। 'এখন কি করব, জেনি? লোকটা মাত্র দু'হাজার ডলার সাধল! অথচ এক হপ্তা আগেও আমি কত স্বপ্ন দেখেছি...'

'ভুলে যান। ব্যাটা ব্লাফ দিয়েছে। আমি স্ট্যাপলসকে খবর দিচ্ছি। আমাদের প্রত্যাশিত দামেই পেটেন্টটা বিক্রি করে দিতে পারব বলে আশা করি। আর ব্যাঙ্কহেড যদি কোন ঝামেলা করে তো–যাক, সেটা স্ট্যাপলসের মাথা ব্যথা।' সিলসের কাঁধ চাপড়ে দিল সে। 'আমাদের ঝামেলা কিন্তু মিটে গেছে।'

ভুল। টেলর জানে না তাদের ঝামেলা মাত্র শুরু হয়েছে।

ওয়াল্টার সিলস-এর বাড়ির রাস্তার ওপাশে রোগা-পাতলা, বেঁটে একটা লোক বাড়িটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ হলো মাইক দ্য স্লাগের সাগরেদ স্ল্যাপি। বাড়িতে ঢোকার রাস্তা

খুঁজছে সে। কিভাবে ঢোকা যায় তার প্ল্যান করছে।

ও বাড়িতে ঢোকার চিন্তা করছে আরও দু'জন—ব্যাঙ্কহেড এবং হর্নসওগল। সিলস-এর আবিষ্কারের ফর্মুলা চুরি করার বদ মতলব তাদেরও। তবে ব্যাঙ্কহেড ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে তার এক সোর্সের সাথে কথা বলেছেন। এখন শুধু ঘটনা ঘটার অপেক্ষা।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন ওয়াল্টার সিলস। নিচে কিসের যেন শব্দ হলো? কনুই দিয়ে গুঁতো মারলেন টেলরকে।

'জেনি! জেনি! ওঠো!'

'অ্যাঁ,' গুঁতো খেয়ে জেগে গেল ইউজেনি টেলর। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। জড়ানো গলায় বলল, 'কি হয়েছে? কেন রাত দুপুরে খোঁচাখুঁচি...

'চুপ করো। কান পেতে শোনো। কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

'কি শুনব? খামোকা কেন যে বিরক্ত করেন!'

সিলস ঠোঁটে আঙুল চাপা দিলেন। চুপ হয়ে গেল অপরজন। নিচে, ল্যাবরেটরি থেকে খচমচ শব্দ আসছে।

টেলরের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, ঘুম মুহূর্তে উধাও। 'চোর!' ফিসফিস করে বলল সে।

চুপিসারে বিছানা থেকে নেমে পড়ল দু'জনে, গায়ে বাথরোব পেঁচিয়ে, পায়ে স্লিপার গলিয়ে পা টিপেটিপে এগোল দরজার দিকে। টেলরের ডেস্কে একটি রিভলভার ছিল। ওটা বের করে আগে আগে চলল সে। নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

মাত্র অর্ধেক সিঁড়ি বেয়েছে, হঠাৎ কে যেন বিকট আর্তনাদ করে উঠল নিচে। পরক্ষণে ধুপধাপ, দুড়ুম দাড়ুম শব্দ। কয়েক সেকেন্ড এরকম চলল। তারপর কাঁচ ভাঙার শব্দ শোনা গেল।

'আমার অ্যামোনিয়াম!' আঁতকে উঠলেন সিলস। টেলর বাধা

দেয়ার আগেই তীর বেগে ছুটলেন তিনি।

ঝড়ের বেগে ল্যাবে ঢুকে পড়লেন প্রফেসর। পেছন পেছন তাঁর সহকারী। আলো জ্বাললেন। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ ঝলসে গেল ঘরের দুই আগন্তুকের। তারা মেঝেতে শুয়ে কুস্তি লড়ছিল। আলো জ্বলে উঠতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পরস্পরের কাছ থেকে।

টেলর তাদের দিকে বন্দুক তাক করে বলল, 'কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না।'

একজন সিধে হলো মেঝে থেকে। বীকার আর ফ্লাস্কের ভাঙা কাঁচের গুঁড়ো গড়িয়ে পড়ল গা থেকে। লোকটার কব্জি কেটে গেছে। হাত চেপে ধরে আছে। এ পিটার কিউ হর্নসওগল।

রিভলভারের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'পরিবেশ খুবই রহস্যময় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে পুরো ব্যাপারটার সহজ ব্যাখ্যা দিতে পারি আমি। আপনারা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা সত্ত্বেও এখানে কেন এসেছি জানেন? আপনাদের প্রতি একটা মায়া পড়ে গেছে আমার।

'জানতাম আপনাদের ওপর কারও কারও বদ নজর আছে। তাই আজ রাতে এই বাড়ির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিই আমি। কারণ আপনারা আমার সাবধান বাণী কানে তোলেননি। তবে এই কাপুরুষ ব্যাটাকে দেখে অবাক হয়ে যাই,' নাক ভোঁতা, নোংরা চেহারার লোকটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে। হতভম্ব হয়ে বসে আছে এখনও মেঝেতে। 'জানালা দিয়ে চোরের মত ভেতরে ঢুকছিল ব্যাটা।

'সাথে সাথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্রিমিনালটার পিছু নিতে শুরু করি আমি। উদ্দেশ্য আপনাদের মহা মূল্যবান আবিষ্কার রক্ষা করা। চোরটার বদ মতলব বুঝতে পেরে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

কাজেই বুঝতেই পারছেন আপনাদের ব্যাপারে আমি কত আন্তরিক?'

বিদ্রুপের হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের গল্প শুনছিল টেলর। বলল, 'আপনি দেখছি বেশ গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারেন, পি. কিউ।'

মেঝেতে শুয়ে থাকা লোকটা এবার জোর গলায় বলে উঠল, 'ঠিকই কইছেন, সার। ওই ভোটকুটা হুদাহুদি আমার ওপর হামলা চালাইছে। আমার কোন দোষ নাই, সার। আমি খালি আরেক সারের হুকুম তামিল করতে ছিলাম। সেই সারে ভাড়া করছে আমারে। কারও ওপর হামলা করার নিয়ত আমার নাই, সার...এই ভোমাডায় খালি খালি...'

'চোপ, মিথ্যাবাদী!' গর্জে উঠল হর্নসওগল। 'চোরের মা'র বড় গলা।'

'আপনারা দু'জনেই চুপ করুন!' ভীতিকর ভঙ্গিতে হাতের অস্ত্রটা নাচাল টেলর। 'আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি। তাদেরকে আপনাদের গল্প শোনান গে। ভাল কথা, প্রফেসর, সব ঠিক আছে তো?'

'মনে হয়,' গবেষণাগারের ওপর চোখ বোলানো শেষ সিলসের। 'খালি কাঁচের বাক্স ভেঙেছে ওরা। এ ছাড়া সব ঠিক আছে।'

'বেশ,' বলল টেলর। তারপর কি যেন দেখে ঢোক গিলল ভয়ে ভয়ে।

হলওয়ে থেকে ভেতরে ঢুকেছে রিভলভার হাতে এক লোক। মাথার হ্যাট চোখের ওপর ফেলা। সে টেলরের দিকে অস্ত্রটা তাগ করে খেঁকিয়ে উঠল, 'ফেলে দাও ওটা!'

যন্ত্রচালিতের মত অস্ত্রটা হাত থেকে পড়ে গেল টেলরের।

আগন্তুক ঘরের চার মূর্তির দিকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, 'বেশ, আরও দু'জন আমার ওপর বাটপাড়ি করতে চেয়েছে, অ্যাঁ? আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি মজা।'

সিলস এবং টেলর হাঁ করে তাকিয়ে আছে আগন্তুকের দিকে, হর্নসওগলের দাঁত কপাটি লেগে গেছে। চোরটা ভীত ভঙ্গিতে পিছু হঠতে হঠতে বলল, 'খাইছে। এইডা দেহি মাইক দা স্লাগ।'

'হ্যাঁ,' ধমকের সুরে বলল মাইক। 'আমিই মাইক দা স্লাগ। অনেকেই আমাকে চেনে। এবং তারা জানে রিভলভারের ট্রিগার টেপার জন্যে আমার হাতের আঙুল সব সময় নিশপিশ করতে থাকে। এই যে টাকু প্রফেসর, এদিকে আসুন। কি সব নকল সোনা-টোনা বানিয়েছেন। আমি পাঁচ গোনার আগেই ওটা দিয়ে দিন।'

ঘরের কোনার দিকে আস্তে আস্তে এগোলেন সিলস। মাইক তাঁকে যাবার রাস্তা করে দিতে পেছনে সরতেই ধাক্কা খেল একটা শেলফের সঙ্গে।

সোডিয়াম সালপ্লেট সল্যুশনের ছোট একটা কাঁচের বোতল নিচে পড়ে ভেঙে চূর চূর হয়ে গেল।

আঁতকে উঠলেন সিলস। 'মাই গড। সাবধান! ওটা নাইট্রোগ্লিসারিন।'

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র লাফ দিল মাইক। আর এ সুযোগটা কাজে লাগাল টেলর। ফ্লাইং কিক মেরে বসল মাইককে। একই সময়ে সিলস এগোলেন টেলরের অস্ত্র দিয়ে বাকি দু'জনকে কভার করতে। তবে তার দরকার ছিল না। মাইক দ্য স্লাগকে দেখে ইতিমধ্যে দু'জনেই খোলা জানালা দিয়ে কেটে পড়েছে।

ওদিকে টেলর এবং মাইক দ্য স্লাগ পরস্পরকে কুস্তির প্যাঁচে

আটকে জড়াজড়ি করে চলেছে ল্যাবের মেঝেতে। আর পিস্তল হাতে লাফাচ্ছেন প্রফেসর। তাগ করার চেষ্টা করছেন। সুযোগ পেলেই গ্যাংস্টারটার কপাল ফুটো করে দেবেন।

কিন্তু সে সুযোগ এল না। মাইক হঠাৎ টেলরের থুতনিতে দড়াম করে এক ঘুসি মেরে মুক্ত করে নিল নিজেকে। তারপর দৌড় দিল। ভয়ঙ্কর চিৎকার করে সিলস তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। কিন্তু লাগল না গুলি। অক্ষত শরীরে পালিয়ে গেল মাইক। সিলস গুণ্ডা সর্দারের পিছু নেয়া সমীচীন মনে করলেন না। নজর দিলেন ঘুসি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সহকারীর দিকে।

ঠাণ্ডা পানির ছিটা মেরে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন টেলরের। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে বসল টেলর। চারপাশের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'উহ্, শালার রাত একটা!'

গুঙিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'এখন কি করব, জেনি? এখন দেখছি আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। স্বপ্নেও ভাবিনি চোরের হামলা হবে আমার বাড়িতে। আসলে খবরের কাগজে আবিষ্কার সম্পর্কে কথা বলাই উচিত হয়নি।'

'যা হয়েছে হয়েছে। এখন এ নিয়ে কান্নাকাটি করে লাভ নেই। এখন আমাদের দরকার চমৎকার একটা ঘুম। চোরগুলো আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। কাল আপনি ব্যাঙ্কে গিয়ে কাগজ পত্রগুলো ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে আসবেন। স্ট্যাপলস বিকেল তিনটায় আসবে। তখনি ওর সঙ্গে কথা বলব। তারপর এ নিয়ে আর ঘুম নষ্ট করতে হবে না।'

চেহারা করুণ করে বললেন সিলস, 'অ্যামোনিয়াম বড় ঝামেলার বিষয়, এটা নিয়ে গবেষণা করাই উচিত হয়নি আমার। এরচে' আকরিক নিয়ে থাকতাম তাই ভাল ছিল।'

ব্যাঙ্কে এসেছেন ওয়াল্টার সিলস। রাস্তার পাশেই ব্যাঙ্ক। রিভলভিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছেন, দু'জন লোক ওঁর রাস্তা আটকে দাঁড়াল। একজন শক্ত কি একটা ঠেসে ধরল বুকে, পাঁজরে লাগল খুব। 'আঁক' করে উঠলেন প্রফেসর। হিম শীতল একটা কণ্ঠ ফিসফিস করল কানের পাশে, 'আস্তে, টাকু। কাল রাতে আমার সঙ্গে যে বেয়াদবি করেছেন চিৎকার করলে তা এখন কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেব।'

ভয়ে কেঁপে উঠলেন সিলস। স্থির হয়ে গেলেন। চিনতে পেরেছেন মাইক দ্য স্লাগের গলা।

'ফর্মুলাটা কই?' জিজ্ঞেস করল মাইক। 'জলদি বের করুন।'

'জ্যাকেটের পকেটে,' কাঁপা গলায় বললেন সিলস।

মাইকের সঙ্গী হাত ঢুকিয়ে দিল সিলসের জ্যাকেটে। বের করে আনল এক তাড়া ফুল স্কেপ কাগজ।

'এইডা, মাইক?'

মাথা ঝাঁকাল গুণ্ডা সর্দার। 'হ্যাঁ। যে জিনিসের খোঁজে এসেছি তা পেয়ে গেছি। ঠিক আছে, টাকু। আপনি এখন যেতে পারেন।'

সিলসকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দিল দুই গুণ্ডা। তারপর ঝটপট তাদের গাড়িতে উঠে পড়ল। উধাও হয়ে গেল চোখের পলকে। ফুটপাথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন সিলস। কয়েকটি সদয় হাত এগিয়ে এল তাঁকে উঠতে সাহায্য করতে।

'ঠিক আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সিলস। 'আমি একাই উঠতে পারব।'

সিধে হলেন প্রফেসর। টলতে টলতে ব্যাঙ্কে ঢুকলেন। এবারের মত জানে বেঁচে গেছেন বলে সৃষ্টিকর্তার কাছে শোকর গুজার করলেন। মনে মনে নিজেকে গালিও দিলেন। আরও

সাবধান হওয়া উচিত ছিল তাঁর। কারণ টেলর আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল তাঁকে।

'যাক যা হবার হয়ে গেছে' এরকম একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকালেন সিলস। খুললেন মাথার টুপি। টাকের সাথে বাঁধা স্যুইট ব্যান্ডের নিচ থেকে কতগুলো কাগজ বের করলেন। পাঁচ মিনিট লাগল কাগজগুলো ভল্টে জমা দিতে। ইস্পাতের দরজাটা বন্ধ হতে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন তিনি।

বাড়ি ফেরার পথে গুণ্ডাদের কথা ভাবছিলেন সিলস। ওরা ওই ফর্মুলা অনুসারে কাজ করতে গেলেই সেরেছে। ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের শিকার হবে গুণ্ডাগুলো।

বাড়ি এসে দেখলেন গেটের সামনে জনাতিনেক পুলিশ অলস ভঙ্গিতে পায়চারি করছে।

'পুলিশ প্রহরা,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল টেলর। 'গত রাতের মত আবার ঝামেলা পোহাতে চাই না।'

সিলস রাস্তার ঘটনাটা জানালেন তার সহকারীকে। মুখ অন্ধকার করে গল্পটা শুনল টেলর। তারপর বলল, 'তবে ওরা আর কিছুই করতে পারবে না। স্ট্যাপলস ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে চলে আসছে। ততক্ষণ পুলিশ তো থাকছেই। তারপর,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'সমস্ত দায়দায়িত্ব স্ট্যাপলসের।'

'শোনো, জেনি,' বললেন রসায়নবিদ, 'অ্যামোনিয়াম নিয়ে আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছি। এখনও ওটার গিলটি করার ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। আর এটাই সবচে' জরুরী বিষয়। স্ট্যাপলস এল আর ওদিকে দেখলাম জিনিসটা থেকে কিছুই পাইনি আমরা। তখন খুবই বিশ্রী হবে ব্যাপারটা।'

'হুমম,' থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বলল টেলর। 'ঠিকই বলেছেন। তবে স্ট্যাপলস আসার আগে কিছু একটা গিলটি করে

ফেলি আমরা। যেমন ধরুন চামচ বা এরকম কিছু একটা।'

দুপুরের খাওয়া সেরে কাজে লেগে গেল ওরা। বেশ কিছু জিনিস জোগাড় করতে হয়েছে। একটি আয়তাকার টবের মধ্যে অ্যামোনালিনের সল্যুশন ঢালা হয়েছে। ক্যাথোড (না-ধর্মী বৈদ্যুতিক তার) হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পুরানো একটা চামচ আর অ্যানোড (বিদ্যুৎ প্রবাহের ধন-তড়িৎ প্রান্তর) হচ্ছে অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম। তিনটি ব্যাটারি বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।

উৎসাহের সাথে ব্যাখ্যা করছেন প্রফেসর, 'সাধারণ তামার গিলটির মত একই নিয়মে এটা কাজ করবে। অ্যামোনিয়াম আইডন বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হলে ক্যাথডের প্রতি আকর্ষিত হবে, আর ক্যাথোড হলো চামচ। সাধারণ অবস্থায় হলে এটা ভেঙে যেত। কিন্তু অ্যামোনালিনে দ্রবীভূত হবার সময় এটার ক্ষেত্রে তা ঘটবে না। অ্যামোনালিন খুবই সামান্য আয়নাইজড করা হয়েছে আর অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে অ্যানোডকে।

'তবে এটা হলো থিওরী। প্রাকটিস কি বলে সেটাই এখন দেখার বিষয়।'

চাবি বন্ধ করলেন সিলস। নিশ্বাস বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল টেলর। কিন্তু এক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। হতাশ দেখাল টেলরকে। এমন সময় তার কনুই খামচে ধরলেন সিলস। 'দ্যাখো!' হিসিয়ে উঠলেন তিনি, 'অ্যানোডের দিকে তাকাও।'

অ্যামোনিয়াম অ্যামালগাম থেকে বাবল গ্যাস বেরুতে শুরু করেছে। চামচটার দিকে তাকালেন ওঁরা। ওটার রং বদলাচ্ছে। রূপোলি রংটা ধীরে ধীরে তার ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে। আস্তে আস্তে হলুদ একটা আস্তরণ ফুটে উঠছে চামচের গায়ে। মিনিট পনেরো

প্রবাহিত হলো বিদ্যুৎ, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সার্কিট খুলে ফেললেন সিলস।

'দারুণভাবে গিলটি হয়েছে,' বললেন তিনি।

'বেশ! জিনিসটা বের করে আনুন। দেখি একবার।'

'কি?' অবাক হলেন সিলস। 'বের করে আনব? ওটা খাঁটি অ্যামোনিয়াম। বাইরে আনলে বাতাসের সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প শুকিয়ে যাবে। তা করা যাবে না।'

তিনি টেবিলে মোটাসোটা একটা যন্ত্র রাখলেন। 'এটা,' বললেন সিলস। 'একটা কমপ্রেসড এয়ার কন্টেনার। এটা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ড্রায়ার্সের মধ্যে চালিয়ে দেব। তখন শুকনো অক্সিজেন বাবল-এ পরিণত হবে এবং দ্রবীভূত হয়ে পড়বে।

তিনি কন্টেনারের নাক চামচের নিচে, সল্যুশনে ঢুকিয়ে দিলেন। চালু হয়ে গেল মেশিন। বইতে লাগল বাতাস। যাদুর মত কাজ হলো। বিদ্যুৎগতিতে হলদে গিলটি আরও চকচকে এবং ঝলমলে হয়ে উঠল।

দুরুদুরু বুকে দৃশ্যটা দেখছেন ওঁরা, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছেন। বাতাসের প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন সিলস। আশ্চর্য চামচটার দিকে তাকিয়ে রইলেন দু'জনে। মুখে রা নেই। ফিসফিস করল টেলর, 'ওটা বের করুন! বের করে আনুন! মাই গড!—অ্যাতো সুন্দর!'

প্রফেসর হাত বাড়ালেন চামচের দিকে, ফরসেপ দিয়ে ধরলেন, বের করে আনলেন তরল পদার্থটা থেকে।

তারপর যা ঘটল তা বক্তব্য নয়। পরে পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে টেলর বা প্রফেসর কেউই আসলে কি ঘটেছিল তার আসল ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

যা ঘটল তা হলো, চামচটাকে মুক্ত বাতাসে নিয়ে আসা মাত্র বিকট একটা গন্ধে দূষিত হয়ে উঠল ঘর। এমন বিশ্রী, পচা এবং

বীভৎস সেই গন্ধ যার কাছে নরকের ভয়ঙ্করতম দুর্গন্ধও কিছু না।

গন্ধের ধাক্কায় শ্বাস বন্ধ হয়ে এল প্রফেসরের। আঁতকে উঠে চামচটা ফেলে দিলেন তিনি। দু'জনেই বেদম কাশতে শুরু করলেন, চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল পড়তে লাগল। সেই সাথে একটানা চলছে হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো।

তীর বেগে চামচটার দিকে ছুটে গেল টেলর। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ওদিকে প্রতি সেকেন্ডে দুঃস্বপ্নের মত গন্ধটা বেড়েই চলেছে। প্রফেসর এবং তার সাগরেদের লাফালাফির চোটে ইতিমধ্যে কয়েকটা কাঁচের টিউব মেঝেতে পড়ে ভেঙে একসা। এ মুহূর্তে করণীয় একটাই ছিল। সে কাজটাই করলেন সিলস। চামচটাকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জানালা দিয়ে। টুয়েলভথ অ্যাভিন্যুর মাঝখানে, এক পুলিশের গায়ে পড়ল চামচটা। গ্রাহ্য করলেন না প্রফেসর।

'জামা-কাপড় খুলে ফেলো,' কাশতে কাশতে সহকারীকে বললেন তিনি। 'পুড়িয়ে ফেলো। তারপর শক্তিশালী একটা কিছু স্প্রে করে দাও ল্যাবে। সালফার পোড়াও। কিংবা লিকুইড ব্রোমাইন নিয়ে এসো। যা খুশি করো। জলদি!'

ওরা পাগলের মত জামা কাপড় খুলছেন, এমন সময় টের পেলেন খোলা দরজা দিয়ে কেউ ঢুকে পড়েছে ভেতরে। এ স্ট্যাপলস। ইস্পাতের রাজা বলা হয় তাকে। দরজা খোলা পেয়ে বেশ ভারিক্কী ভাব নিয়ে ঘরে ঢুকল সে।

কিন্তু ঘরে পা দেয়া মাত্র গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্যের কথা বেমালুম ভুলে গেল স্ট্যাপলস। বোটকা গন্ধটার প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দিশাহারা বোধ করল সে। পরের মুহূর্তে পড়িমরি করে দৌড় দিল রাস্তায়। টুয়েলভথ অ্যাভিন্যুর পথচারীরা অবাক হয়ে দেখল

সুবেশী, ছয়ফুট লম্বা, দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে রাস্তা দিয়ে। সেই সাথে পাগলের মত গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলছে।

ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত চামচটার ভয়ানক কার্যকলাপ তখনও শেষ হয়নি। যে পুলিশটার গায়ে আছড়ে পড়েছে চামচ সে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। সাথে তার দুই সঙ্গীও। আর আশপাশের বাড়িঘরে বিকট গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ার কারণে লোকজন পাগলের মত চেঁচামেচি করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগল ঘর ছেড়ে। দমকল বাহিনী টুয়েলভথ অ্যাভিন্যুতে ম্যাসাকার হচ্ছে এমন খবর পেয়ে ছুটে এল। দেখা গেল গাড়ি ফেলে রেখে তারা চোঁ চা দৌড়। এক স্কোয়াড্রন পুলিশ এসেছিল। বদ গন্ধে তারাও ছুটে পালাল যে যেদিকে পারে। সব মিলে যেন নরক ভেঙে পড়ল টুয়েলভথ অ্যাভিন্যুতে।

সিলস এবং টেলর ওদিকে শুধু ট্রাউজার পরে দৌড়াতে দৌড়াতে হাডসন নদীতে চলে এসেছেন। এক লাফে পানিতে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, মুখ হাঁ করে তাজা বাতাস নিতে লাগলেন দু'জনে।

টেলর সিলসের কানে কানে বলল, 'ওরকম বীভৎস গন্ধ হবার কারণ কি? আপনি বলেছিলেন জিনিসটা টেকসই। টেকসই জিনিসের তো গন্ধ থাকার কথা নয়। ওই বাষ্পের কারণে এমন হয়েছে, না?'

'কস্তুরীর গন্ধ শুঁকেছ কখনও?' গুঙিয়ে উঠলেন সিলস। 'একটি অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, কোন ওজন না হারিয়ে ওটা গন্ধ ছড়িয়ে যায়। আমরা মনে হয় ওরকম কিছু একটার মুখোমুখি হয়েছি।'

চুপচাপ পানিতে বসে রইলেন দু'জন। ভয়ে আছেন অ্যামোনিয়াম ভেপারটা আবার বাতাসের ধাক্কায় না জানি চলে

আসে এদিকে। নিচু গলায় বলল টেলর, 'চামচ রহস্য যখন ওরা বের করে ফেলবে, জানবে কারা বানিয়েছে এ জিনিস তখন আমরা ধরা খেয়ে যাব। জেল ঠেকাতে পারবে না কেউ।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল সিলসের। 'ওই হারামজাদাটাকে কেন যে আবিষ্কার করতে গেলাম! ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই জুটল না ওটা থেকে।' ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন তিনি।

তাঁর টাক মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে টেলর বলল, 'কাঁদবেন না, প্লীজ। আমার বিশ্বাস এ আবিষ্কার আপনাকে বিখ্যাত করে তুলবে। দেশের যে কোন ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে লুফে নেবে। ভাল দামও পাবেন। তাছাড়া নোবেল প্রাইজও পেয়ে যেতে পারেন।'

'তা পারি,' হাসি ফুটল সিলসের মুখে, 'তবে ওই বিকট গন্ধটা দূর করার একটা উপায় বের করতে হবে। আশা করি পেয়ে যাব।'

'আমারও তাই আশা,' বলল টেলর, 'চলুন যাওয়া যাক। এতক্ষণে নিশ্চয়ই চামচটাকে সরিয়ে ফেলেছে ওরা।'

মূল: আইজাক আসিমভ
রূপান্তর: অনীশ দাস অপু

হাবা গিম্পেল

এক

আমি হাবা গিম্পেল। যদিও লোকজন আমাকে এ নামেই ডাকে, কিন্তু নিজেকে আমি হাবা মনে করি না। স্কুলে থাকার সময়ই আমার এ নাম দেয়া হয়। আমার সব মিলিয়ে সাতটি নাম ছিল। হাঁদা, গাধা, ভোঁতা বুদ্ধি, ভ্যানদা, বেকুব, মূর্খ আর হাবা। এর মধ্যে এই শেষ নামটা হিট করে ফেলল। শুনতে চান আমার বোকামির ধরন? আমাকে ধোঁকা দেয়া খুব সহজ। একদিন সবাই এসে আমাকে ঘিরে ধরে বলল, 'গিম্পেল, যাজক সাহেবের বউ-এর বাচ্চা হবে, তুই জানিস না? ছি ছি!' কাজেই আমি স্কুল বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে দেখতে গেলাম। আসলে সব ছিল মিথ্যে কথা। কিন্তু আমি কেমন করে জানব সে-কথা? না হয় তার পেট উঁচু হয়নি। কিন্তু আমি কখনও কোন মহিলার পেটের দিকে তাকাই না। এটা কি এমন কোন বোকামি? আমার পেছনে তখন সারা শহরের সব লোক। কেউ গাধার ডাক দিচ্ছে, কেউ জোরে জোরে নেচে হাততালি দিয়ে গান গাইছে। একজন আমার হাত কালো একটা কী দিয়ে ভর্তি করে দিল। প্রথমে ভাবলাম কিশমিশ। ভাল করে তাকিয়ে দেখি আসলে ছাগলের নাদি। আমি দুর্বল নই। আমার গায়ে অনেক জোর। এদের কাউকে একটা চড় দিলে সে কোন জায়গায় চলে যেত, তার ঠিক নেই। কিন্তু আমার সমস্যা হচ্ছে, আমি কারও উপর রাগ করতে পারি না।

আরেকদিন আমি স্কুল থেকে ফিরছি। এমন সময় শুনি কুকুরের ডাক। কুকুর আমি ভয় পাই না ঠিকই, কিন্তু সেধে তো আর কুকুরের সামনে গিয়ে পড়তে পারি না। তা ছাড়া, কুকুরটা পাগলাও তো হতে পারে? আর ওটা যদি আমাকে কামড়ায়, তবে আমি খুব ভাল করেই জানি, এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে আমার মত একটা বোকার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। সুতরাং গিম্পেল, তুমি জান নিয়ে পালাও! পালানোর চেষ্টা করতেই দেখি পুরো বাজার হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। আদতে কোন কুকুরই ছিল না। এই এলাকার ছিঁচকে চোর উলফ-লিবের নকল ডাক দিয়েছিল। কিন্তু আমি কী করে তা জানব! অবিকল একটা মাদী কুকুরের মতই ছিল সেই ঘেউ-ঘেউ।

এই ধোঁকাবাজের দল বুঝে গেল আমাকে বোকা বানানো কত সহজ। প্রত্যেকেই আমার মাধ্যমে তার ভাগ্যটা একবার যাচাই করে দেখত, যদি আমাকে বোকা বানানো যায়। তাদের কথাবার্তার উদাহরণ দিই–

'গিম্পেল, শোনো। আজ বিকেলে জার ফ্রাম্পোলে আসবেন।'

'এই যে গিম্পেল, টারবিনে না আজ চাঁদ আকাশ থেকে একেবারে মাটিতে নেমে এসেছে।'

'গিম্পেল, দাঁড়া, শুনে যা একটু, আজকে হয়েছে কী, ওই যে হোদেলকে চিনিস না, সে বাড়ির পেছনে গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে।'

আমাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, এ পৃথিবীতে সবই সম্ভব। প্রথম প্রথম তাই আমি তাদের সব কথা বিশ্বাস করতাম, আর মনে বারবার প্রশ্ন জাগত, এ-ও সম্ভব তা হলে? আসলে সবাই যখন এক হয়ে একই কথা বলতে শুরু করে, তাদের অবিশ্বাস করি কীভাবে? কখনও যদি বলতাম, না, তোমরা আমার সাথে

ফাজলামো করছ, তখন তারা ভীষণ ক্ষেপে উঠত। 'তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস, আমরা মিথ্যুক?'

এরপর আমি আর কী করতে পারি? আমি তাদের প্রতিটি কথায় বিশ্বাস করা শুরু করলাম, তবু যদি একটু সদয় আচরণ পাওয়া যায়!

আমার বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। ছোটবেলায় দাদার কাছে বড় হয়েছি। অনেকদিন হলো তিনিও কবরে সেঁধিয়েছেন। ফলে আমাকে একটা বেকারিতে কাজ নিতে হলো। এখানেও লোকজন আমাকে নিয়ে কী না করেছে। যে-ই আসত, আমাকে নিয়ে মস্করা না করে পারত না।

'গিম্পেল, যাজক সাহেব সাত মাসের মাথায় একটা বাদুড়ের বাবা হয়েছে।'

'ও, তুমিই গিম্পেল; তোমার নাম অনেক শুনেছি। জানো নাকি, এইমাত্র একটা গরু উড়ে উড়ে ছাদে এসে ওখানে পিতলের ডিম পাড়ছে, গিয়ে দেখে আসো একবার।'

একবার এক ছাত্র রোল কিনতে এসে আমাকে বলে, 'গিম্পেল, তোমার খুচুনি পরিষ্কার করার শব্দে মেসিয়াহ (ইহুদিদের ত্রাণকর্তা) চলে এসেছে। সব মড়া কবর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে আবার। শুনতে পাচ্ছ না ওদের শব্দ?'

'কী যা তা বলছ, কই, আমি তো কিছু শুনছি না।'

আমার এ কথা শুনেই সে বলে, 'তুই কি কানে শুনিস না?'

আশপাশের সবাই এ কথায় মজা পেয়ে নাকি সুরে কাঁদা শুরু করল। এদের মধ্যে একজন কান্না থামিয়ে বলে, 'গিম্পেল, তোর বাবা-মাকে কবরস্থানে দেখলাম। তারা হন্যে হয়ে তোকে খুঁজছে।'

সত্যি বলতে কী, আমি খুব ভাল করেই জানি আসলে কী

ঘটছে, কিন্তু ওই যে বললাম, আমার লোকজনকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না? সত্যি কিছু হলেও তো হতে পারে, এই ভেবে গায়ের জ্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে আমি বাইরে দৌড়ে গেলাম। শুধু একটা বিড়াল, আর তার ডাক সেখানে। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোনদিন কোনকিছু বিশ্বাস করব না। কিন্তু এ-শপথ বেশি দিন টিকল না, তারা সবাই মিলে এমনভাবে আমাকে ধোঁকা দিতে থাকল যে, আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো এমন সব সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে কেউ এরকম ঠাট্টা-তামাশা করতে পারে।

আমি পুরোহিত সাহেবের কাছে গেলাম কিছু পরামর্শ যদি পাওয়া যায়, এই আশাতে। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার সারাদিনের বোকামিও ওদের একঘণ্টার শয়তানির চেয়ে ভাল। আসলে তারাই সত্যিকারের বুদ্ধিহীন। যে তোমার মত একজনকে লজ্জায় ফেলে, সে খোদ বেহেশতটাকেই হাত থেকে ফেলে দেয়।'

আমার মন ভাল হয়ে গেল, তাঁর বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় তাঁর মেয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলল, 'গিম্পেল, তুমি কি বাড়ির দেয়ালে এখনও চুমু খাওনি?'

আমি বিব্রত গলায় বললাম, 'না তো! কেন?'

'জানো না, এটাই নিয়ম, রাব্বির বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় দেয়ালে ঠোঁট ছোঁয়াতে হয়।'

আমি দেয়ালে চুমু খেতেই সে খিঁক-খিঁক করে হাসতে শুরু করল। আবার একজন আমাকে একহাত দেখে নিল। কী আর করা!

বাধ্য হয়ে আমি অন্য শহরে চলে যেতে চাইলাম, কিন্তু তখনই হঠাৎ সবাই আমাকে বিয়ে করানোর ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠল। যতক্ষণ তাদের কথায় রাজি না হলাম, তারা আমার পিছু

ছাড়ল না। যার সাথে তারা আমার বিয়ে ঠিক করল, বাজারে তাকে নিয়ে অনেক রটনা ছিল। কিন্তু তারা তাকে সতী-সাধ্বী বলে দাবী করল। আমি জানতাম, সেই মহিলার একটা জারজ সন্তান আছে, কিন্তু সবাই বলল আসলে নাকি সেই ছেলেটা তার ছোট ভাই। আমি এদের সবাইকে বোঝানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে বললাম, 'কেন মিছেমিছি সময় নষ্ট করছ। মরে গেলেও আমি এই বেশ্যাকে বিয়ে করতে পারব না।'

আমার এই সত্যভাষণ শুনে তারা যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। তারা রুষ্ট স্বরে বলল, 'এ কী ধরনের কথা? আয়নায় নিজেকে দেখেছিস কখনও? নিজেকে দেখে তোর লজ্জা করে না? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। একটা ভাল মেয়ের নামে এসব কথা বলছিস! রাব্বি সাহেবকে বলছি সব।'

জরিমানার ভয় দেখিয়ে তারা আবার আমাকে কৌতুকের পাত্রে পরিণত করল। আমি অনেক কষ্টে আবার নিজেকে বোঝালাম, বিয়ের পর তুমি যখন ওই মেয়ের স্বামী হবে, তখন নিশ্চয়ই সে তোমার কথা শুনবে। আর, কারও জীবনই তো পরিপূর্ণ প্রাপ্তিময় নয়, কারও তেমনটা আশা করাও উচিত নয়।

সুতরাং আমি একদিন পায়ে পায়ে তার বাড়িতে হাজির হলাম। পেছনে আবার সেই অসংখ্য লোকজন। এই মেয়ের নাম এলকা। সে বাড়িতে এমনই এক উগ্র পোশাকে বসে ছিল যে, আশপাশের সবার চোখ চকচক করে উঠল। কিন্তু কেউ তার সাথে কথা বলবার সাহস পেল না। কারণ একবার এলকার মুখ ছুটলে কী বলে বসে কে জানে! আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

এলকাও এই হাবা গিম্পেলকে চিনত। সে ব্যস্ত হবার ভান করে বলল, 'দেখো দেখো কে এসেছে। কী সৌভাগ্য আমার। ওকে বসতে দাও।'

আমি তাকে সব খুলে বললাম। 'দেখো, আমাকে মিথ্যা বোলো না। আসলেই কি তুমি এর আগে কারও সাথে শোওনি? এই ছেলেটি কি সত্যি তোমার ছোট ভাই? দয়া করে আমাকে ধোঁকা দিয়ো না। আমার বাবা-মা কেউ নেই যে আমাকে পরামর্শ দেবে।'

এলকা আস্তে আস্তে বলে, 'দেখো, আমারও বাবা-মা কেউ নেই...'

সুতরাং বিয়ে হয়ে গেল। রাব্বি অবাক হয়ে বলল, 'আরে, এই মেয়ে? এ কি বিধবা, না একে তালাক দেয়া হয়েছে?'

হাসতে হাসতে একজন মহিলা বলে, 'দুটোই।'

দুঃখে আমার চোখে পানি এসে পড়ল। অথচ আমি কী করতে পারতাম? দৌড়ে পালিয়ে চলে এলে খুব ভাল হত?

চারদিকে নাচ-গান চলছে। ছোট ছোট উপহার জমা হতে থাকল টেবিলে, হঠাৎ দেখি দু'জন দারুণ সুন্দর লোক বাচ্চাদের একটা দোলনা টেবিলে রাখছে। আমার বুক ধক করে উঠল। এগুলো আমাদের কী দরকার? আমি প্রশ্ন করলাম। লোক দু'জন বাঁকা হাসি দিয়ে বলল, 'গিম্পেল, তোমার এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। সব এলকা বুঝবে।'

আমার মনে হতে থাকল, আবার আমি প্রতারিত হচ্ছি। কিন্তু আমার আর হারাবার কী-ই বা আছে? দেখাই যাক না, ভাগ্য কতটা খারাপ হতে পারে।

দুই

রাতের বেলা আমি তার বিছানায় যেতেই সে বলল, 'উঁহু, আজ না। আমার মাসিক চলছে।'

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'গতকাল না তোমাকে বিয়ে উপলক্ষ্যে গোসল করতে হলো!'

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সে খনেখনে গলায় বলল, 'গতকাল আর আজ এক হলো নাকি? তোমার যদি ভাল না লাগে, তা হলে চুপচাপ বসে থাক।'

অতএব, আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম তো করতেই থাকলাম।

বিয়ের চারমাসও যায়নি, এমন সময় এলকার প্রসব বেদনা উঠল। সারা শহরের লোক মুখ টিপে হাসি চালাচালি করতে থাকল। কিন্তু আমি কী করব? এদিকে আবার আমার স্ত্রী অসহ্য ব্যথায় নীল হয়ে গিয়েছে। চাপা গোঙানির মত স্বরে সে বলল, 'গিম্পেল! আমি মরে যাচ্ছি, গিম্পেল, আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।'

সারা বাড়িতে এলাকার মহিলাদের আনাগোনা পড়ে গেল। কেউ পানি গরম করছে, কেউ চিৎকার করছে।

আমার এ-অবস্থায় করার মত একটাই কাজ ছিল, আমি তা-ই শুরু করলাম, প্রাণপণে প্রার্থনা করতে থাকলাম।

এক কোনায় দাঁড়িয়ে আমি প্রার্থনা করছি, আর আশপাশের লোকজন সমানে টিপ্পনি কাটছে। 'দোয়া করো, গিম্পেল, দোয়া

করো। তবে মনে রেখো, দোয়া করে কাউকে তুমি গর্ভবতী করতে পারবে না কখনও।'

এদের একজন আমার মুখে একটা খড় ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'গরুর জন্য সামান্য খড় দিলাম।'

ঈশ্বর! এমন নিষ্ঠুর লোকও পৃথিবীতে আছে তা হলে?

এলকা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। গির্জার খাদেম সমবেত সকলের উদ্দেশে বলল, 'এ উপলক্ষ্যে গিম্পেল সবার জন্য একটা ভোজের আয়োজন করবে।'

হাসতে হাসতে তখন একেকজনের পেটে খিল ধরে যায় আর কী! যেহেতু আমার অন্য কোন উপায় নেই, তাই সবাইকে খাওয়াতে হলো, তারপর এ শিশুর নাম আমার স্বর্গত পিতার নামে রাখলাম। আমার বাবা স্বর্গে শান্তিতে বাস করুন।

রাতে আমার স্ত্রী আমাকে বলল, 'গিম্পেল, চুপচাপ বসে আছ যে, কী হয়েছে তোমার?'

আমি কী বলব? তবু বললাম, 'খুব দারুণ একটা কাজ তুমি আমার জন্য করেছ, আমার মা ব্যাপারটা জানলে আবার মারা পড়তেন। এবার লজ্জায়।'

এলকা দৃঢ় স্বরে বলল, 'কী পাগলের মত যা তা বলছ? তুমি কী ভাবছ, বলো তো?'

আমি দেখলাম আমার সরাসরি কথা বলাই উচিত। বললাম, 'আমার মত অনাথকে তুমি এভাবে ব্যবহার করতে পারলে? তুমি আগাগোড়া এক জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছ।'

সে তীব্র স্বরে বলল, 'এসব পাগলামি মাথা থেকে সরাও। সে অবশ্যই তোমার ছেলে।'

'সে কীভাবে আমার হবে?' আমি যুক্তি দেবার চেষ্টা করলাম। 'আমাদের বিয়ের সতেরো সপ্তাহ পরেই সে জন্ম নিয়েছে।'

আমার স্ত্রী শিশুটিকে সময়ের আগেই অপরিপক্ব অবস্থায় জন্ম নিয়েছে বলে দাবী করল। বলল, তার কোন এক দাদীমারও নাকি এরকম ঘটেছিল। সে এমন জোর গলায় কথা বলল, যে-কেউ তাতে বিশ্বাস করবে। কিন্তু আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করলাম না।

পরদিন স্কুলের এক শিক্ষককে ব্যাপারটা বলাতে তিনি বললেন, ধর্মগ্রন্থে নাকি এরকম উদাহরণ আছে। হায়, সারা পৃথিবীতে কে আমার কষ্ট বুঝবে?

কাজেই আমি আমার দুঃখ ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম শিশুটিকে আমি পাগলের মত ভালবেসে। শিশুটিও আমাকে একইরকম ভালবাসা ফিরিয়ে দিল। আমাকে দেখামাত্রই সে কোলে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়ে দিত, যখন সে কান্নাকাটি শুরু করত, তখন আমি ছাড়া কেউ তাকে শান্ত করতে পারত না। বাচ্চার উপর শয়তানের নজর কাটানোর জন্য আমি আব্রাক্যাড্যাব্রাও যোগাড় করি, যেন অশুভ সবসময় আমার সোনামণির কাছ থেকে দূরে থাকে। আমি তখন সারাদিন গরুর মত খাটতে শুরু করলাম। বাড়িতে একটা শিশু এলে কী পরিমাণ খরচ বাড়ে, তা তো আপনাদের জানাই আছে। আরেকটা সত্যি কথা বলি, এতকিছুর পরও আমি এলকাকে ভালবাসতাম। আর এলকা এদিকে সারাদিন আমাকে অভিশাপ দিত। তার চিৎকার, গালাগালি সহ্য করে, এমন ক্ষমতা কার আছে?

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি তার জন্য বেকারি থেকে চুরি করে কিছু না কিছু এনে দিতাম। কোনদিন রুটি, কখনও পনির, মুরগির মাংস–এসব। আমার মনে হত, এই চুরির জন্য আমার ক্ষমা পাওয়া উচিত। এলকা এগুলো খেয়ে খেয়ে মোটা হতে লাগল, তার চেহারাও ফিরে আসতে শুরু করল।

রাতে আমাকে বেকারিতে থাকতে হতো। কেবল শুক্রবার

রাত আমি বাড়িতে কাটানোর অনুমতি পেতাম। এই একরাতও সে আমাকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। সবসময় তার একটা না একটা সমস্যা। কোনদিন বুক জ্বালাপোড়া, শরীরে কোনও সময় চিনচিনে ব্যথা, আবার কখনও মাথাব্যথা। আপনারা তো জানেনই, এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের কতরকম অজুহাত থাকতে পারে। ফলে এই একটা দিনেও তিক্ত সময় কাটাতে হতো আমাকে। এদিকে তার ভাই, সেই জারজটা, দিনে দিনে তাগড়া হলো। মাঝে মাঝেই সে আমাকে ঢিল ছুঁড়ত, আমি পাল্টা ঢিল ছুঁড়তে গেলেই এলকার মুখের তুবড়ি শুরু হয়ে যেত। চোখের সামনে আমি সারাক্ষণ অন্ধকার দেখতে লাগলাম। দিনে দশবার সে আমাকে তালাকের হুমকি দিতে শুরু করল। আমার জায়গায় অন্য যে-কোন পুরুষ সব কিছু চুকিয়ে অনেক আগেই বিদায় নিত। কিন্তু আমার জন্মই হয়েছে চুপচাপ সব কিছু মেনে নেয়ার জন্যে। ঈশ্বর অনেক সমস্যা দিয়েছেন, আবার তা সহ্য করবার জন্য শক্তিও দিয়েছেন।

একদিন রাতে বেকারিতে আগুন ধরে গেল। বাড়িতে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, কাজেই আমি বাড়ি রওনা হলাম। তা ছাড়া, সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে নিজের ঘরে ঘুমানোর একটা সুযোগও হয়ে গেল এতে। আমি কাউকে না জানিয়ে আস্তে দরজা খুললাম। কিন্তু আমার মনে হলো বিছানায় দু'জন মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ। একটা মৃদু ধরনের, আরেকটা বুনো ষাঁড়ের মতন। আমি সম্মোহিতের মত বিছানার পাশে যেতেই সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। এলকার পাশে আরেকটা লোক শুয়ে আছে। আমার বদলে অন্য কেউ হলে এক চিৎকার দিয়ে সারা শহর জাগিয়ে তুলত। কিন্তু সাথে সাথে আমার মাথায় আরেকটা চিন্তা এল। বিছানার পাশে আমাদের ছোট বাচ্চাটা ঘুমিয়ে আছে।

সারা শহর জেগে উঠলে সে-ও জেগে উঠবে। তার তো কোন দোষ নেই, শুধু শুধু সে ঘুম থেকে উঠে ভয় পাবে। ফলে আবার আমি ফিরে গেলাম। সকাল পর্যন্ত আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। ম্যালেরিয়া রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে আমার মনে হলো, মানুষজন আমাকে আর কত চুষে চুষে খাবে। গাধামির তো একটা সীমা থাকা উচিত, নাকি?

সকালে আমি গির্জার পুরোহিতের কাছে গিয়ে সব খুলে বললাম। সারা শহরে একটা হৈ-চৈ লেগে গেল, লোক পাঠিয়ে এলকাকে নিয়ে আসা হলো। এসেই সবকিছু অস্বীকার করল সে, চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এই হাবাটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সব মিথ্যা, সব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।'

এলকা চলে যেতে আমি পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলাম আমার কী করা উচিত। তিনি কালবিলম্ব না করে আমাকে বললেন বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য।

'তা হলে এই শিশুটির কী হবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আগে ওই বেশ্যাকে বের করে দাও। তা হলে এই জারজটাও তার সাথেই চলে যাবে।'

এই রায়ে আমার মাথায় ঝিম ধরে গেল, এলকার অসহ্য চেঁচামেচি, অভিশাপও মনে হয় অনেক ভাল ছিল। আমি ভাবার জন্য খানিকটা সময় নিয়ে চলে এলাম।

দিনের বেলা আমার কোন সমস্যা হয় না। আমার মনে হয়, যা হবার তা তো হবেই। কোনও ব্যাপার না। কিন্তু রাত নামতেই আমার নিজস্ব পৃথিবী এলোমেলো হয়ে যায়। শিশুটার জন্য আর তার মা'র জন্য আমার অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এলকার উপর আমার ভীষণ রাগ করা উচিত। কিন্তু ওই যে আমার দুর্ভাগ্য, আমি কারও উপর ক্রুদ্ধ হতে পারি না।

সারাক্ষণই একা একা ভাবতে থাকলাম, ভুল তো মানুষেরই হয়। নিজেকে বোঝালাম, সম্ভবত যে-লোকটা এলকার সাথে শুয়েছিল, সে-ই এলকাকে এর জন্য প্রলুব্ধ করেছে। আর এটা তো জানা কথাই, যেহেতু মেয়েদের চুল লম্বা, সেহেতু তাদের বুদ্ধি খাটো। ফলে ওই লোক এলকাকে ভুং-ভাং দিয়ে এলকার পাশে শুয়েছে। আবার কখনও বা ভাবলাম, এলকা তো পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করেছে, তা হলে মনে হয় আমিই ভুল দেখেছি। হ্যালুসিনেশন তো ঘটতেই পারে। দূর থেকে একটা মূর্তি দেখা যেতে পারে ঠিকই, কিন্তু কাছে গেলেই তো সে মিলিয়ে যেতে পারে। যদি তা-ই হয়? এলকার প্রতি আমি অবিচার করছি। এটা ভাবতেই আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। আমি যে ময়দার বস্তার উপর ঘুমাতাম, তা আমার চোখের জলে ভিজে গেল। সকালে আমি পুরোহিতের কাছে গিয়ে জানালাম, আমার তথ্যে ভুল ছিল। সম্ভাবনাগুলো আমি তাঁকে খুলে বললাম, তিনি বিষয়টা বিবেচনার আশ্বাস দিলেন। যতদিন কোন সিদ্ধান্ত না হয়, ততদিন আমি আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারব না, কিন্তু লোক মারফত তার কাছে খাবার-দাবার ও টাকা-পয়সা পাঠানোর সুযোগ পেলাম আমি।

তিন

নয় মাস চলে গেল, অথচ গির্জা কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না আমার বিষয়ে। আমি বুঝি না এত কী ঝামেলা আছে এই ছোট্ট ব্যাপারে।

এর মাঝে এলকার আবার একটা বাচ্চা হলো। সাবাথের

দিনে আমি সিনাগগ গিয়ে তার জন্য দোয়া করে এলাম। মেয়ের নাম রাখলাম আমার শাশুড়ির নামে। ঈশ্বর আমার শাশুড়িকে শান্তিতে রাখুন। এদিকে আমার দুঃখে সারা ফ্রাম্পোল খুশিতে আটখানা। কিন্তু এলকা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস থেকে আমি একচুল নড়লাম না। আজকে যদি আমি আমার স্ত্রীকে অবিশ্বাস করি, তা হলে দেখা যাবে আগামীকাল থেকে ঈশ্বরকেই আমি অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

এলকার বাড়ির পাশেই থাকে, এমন একজন লোক দিয়ে প্রতিদিনই আমার সাধ্যমত খাবার-দাবার পাঠাই এলকাকে। রুটি, কেক, রোল, সুযোগ পেলে পুডিং, পিঠা এ-ধরনের জিনিসপত্র। লোকটা নিজেও খুব বড় হৃদয়ের ছিল, সে-ও মাঝে মাঝেই এসবের সাথে নিজে থেকে কিছু খাবার-দাবার যোগ করত। অবশ্য এই লোক আগে আমাকে নানাভাবে জ্বালাতন করত। কখনও নাক মলে দিত, কখনও পেটে খোঁচা দিয়ে বসত। অবশ্য আমাদের বাসায় যাওয়ার পর থেকে সে আমার ওপর যথেষ্ট সদয়। একদিন সে আন্তরিক গলায় বলল, 'গিম্পেল, তোমার ঘরে এক অসাধারণ স্ত্রী আর দু'টো ছোট বাচ্চা। তুমি তো না চাইতেই অনেক কিছু পেয়ে গেছ, তুমি এতসবের যোগ্য নও।'

আমি দারুণ খুশি হয়ে বললাম, 'অথচ দেখো, শহরের লোকজন এলকাকেই বরং এসব কথা বলে।'

'যতসব বড় বড় কথা। এত আগড়ম-বাগড়ম শোনা অর্থহীন। ওদের কথায় কান না দিলেই হলো।'

একদিন পুরোহিত আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি কি নিশ্চিত, তুমি তোমার স্ত্রী সম্পর্কে ভুল করেছিলে?'

'আমি নিশ্চিত,' শান্ত স্বরে বললাম।

'কিন্তু তুমি তো একটা কিছু দেখেছ সেখানে, তা-ই না? তা

হলে সেটা কী?'

'মনে হয় একটা ছায়া।'

'কীসের ছায়া?'

আমি বললাম, 'ছাদের কড়িকাঠের ছায়া, বিছানার উপর পড়েছিল।'

এরপর তিনি ধর্মগ্রন্থ ঘেঁটে আমাকে আমার স্ত্রীর সাথে থাকার অনুমতি দিলেন। আবার আমার সবকিছু ভাল লাগতে শুরু করল। স্ত্রী আর শিশুদের ছেড়ে দূরে থাকা খুব কঠিন ব্যাপার। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যার পর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। কিছু রুটি আর কেক নিলাম সাথে করে। আকাশে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, অসংখ্য তারায় ঝকঝক করছে আকাশ। তখন হালকা শীতের সময়, পেঁজা তুলোর মত তুষার পড়ছে এখন-তখন। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল গান গাইতে, কিন্তু রাত বেশি হওয়ায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে গান গাইলাম না। অন্তত আপনমনে শিস বাজাতে মন চাইছিল আমার, কিন্তু শিসের শব্দে আবার রাতের বেলা প্রেতাত্মারা হাজির হয়, কাজেই তা-ও বাদ।

বাড়িতে ঢুকতে আমার বুক আনন্দে নাচতে শুরু করল। ঘরের ভেতর সবাই ঘুমুচ্ছে। আমার চোখ পড়ল দোলনার দিকে। চাঁদের আলো জানালার ফাঁক গলে এসে পড়েছে ছোট শিশুটির মুখে। প্রথমবার তার মুখ দেখেই আমি তাকে ভালবেসে ফেললাম।

আমার বিছানার পাশে যেতেই আবার আমার সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল। সেই লোকটা, যে আমার কাছ থেকে খাবার-দাবার নিয়ে বাড়িতে আসত, সে এলকার পাশে শুয়ে। চারদিকে এত চাঁদের আলো। কিন্তু আমি অন্ধকার একটা ছায়া ছাড়া কিছু দেখছি না। আমার সারা শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল। আমার হাত

থেকে রুটি মাটিতে পড়ে যাবার শব্দে এলকা ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল, 'কে ওখানে, কে?'

'আমি, গিম্পেল।'

'তুমি এখানে কেন! লোকে কী বলবে?'

আমি চাপা স্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, 'পুরোহিতই আসতে বলেছে।'

এলকা বলল, 'গিম্পেল, শোনো। একটু খোঁয়াড়ে যাও। আমাদের ছাগলটা অসুস্থ।'

আগে বলা হয়নি, আমাদের একটা ছাগল আছে। একটা ছোট্ট প্রাণী, কিন্তু এই জীবটাকে আমি প্রায় মানুষের মতই ভালবাসি। দ্রুত খোঁয়াড়ে গিয়ে ছাগলটাকে ভাল ভাবে দেখলাম। কোনও অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেলাম না। মনে হলো ও ঠিকই আছে। আমি ওকে বললাম; 'ভাল থাকিসরে, বাছা।'

এই ছোট্ট জীবটা শুভেচ্ছার প্রতিউত্তরে মনে হয় আমার মঙ্গল কামনা করেই বলল, 'ব্যা...

আমি ঘরে ফিরে এলাম। ততক্ষণে সেই লোকটা উধাও। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই লোকটা কোথায়?'

'কোথায় কোন্ লোকটা?'

'যে তোমার পাশে শুয়েছিল।'

এলকা আকাশ থেকে পড়ার ভান করল। তারপর শুরু হলো তার চিৎকার। শয়তান, ইতর, বাঁদর, শুয়োর এমন কোনও শব্দ নেই যা সে উচ্চারণ করল না। সারা শহর বিছানা থেকে উঠে এল সেই শব্দে।

আমি নড়ার আগেই তার সেই ভাইটা আমার মাথার পেছন দিকে ভয়ানক এক ঘুসি চালাল। আমার মনে হলো সারা মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে সে আঘাতে। এদিকে মনে হচ্ছে সারা

শহর আমাকে পিশাচ ভাবা শুরু করে দিয়েছে। অনেক কষ্টে আমি এলকার চিৎকার থামালাম।

পরদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম সেই লোককে, সে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমি অন্য গ্রহের জীব। সে বলল, 'আপনার মাথা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি দ্রুত ডাক্তার বা কবিরাজ দেখান।'

পাঠক, একটা বিশাল গল্পকে খুব সংক্ষেপে বলে ফেলি। বিশ বছর আমি আমার 'স্ত্রী'র সাথে কাটাই, আমাদের ছয়টি সন্তান হয়। চারটি মেয়ে, দুটি ছেলে। বলতে গেলে সব ধরনের ঘটনাই ঘটল, কিন্তু আমি দেখেও না দেখার, শুনেও না শোনার ভান করে থাকলাম। আমার কেবলই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হত সবাইকে। সেদিন পুরোহিত বললেন, জীবনে বিশ্বাসই আসল। একজন সৎ লোক সবসময় নিজের বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকে।

হঠাৎ একদিন আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার বুকে ছোট একটা টিউমারের মত হলো। একের পর এক বৈদ্য, চিকিৎসক এলো। বলার মত কিছু নয়, তাই বলা হয়নি, এখন আমার নিজের একটি বেকারি আছে, এবং আমাকে এখন মোটামুটি বিত্তশালী বলা চলে। ডাক্তার-কবিরাজের যা সাধ্যে ছিল, তার সবই তারা করল। এমনকী লাবলিন থেকে একজন বড় ডাক্তারও এলেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মারা যাবার আগে আমাকে বিছানার কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে এলকা বলল, 'আমাকে মাফ করে দিয়ো, গিম্পেল।'

আমার মন দারুণ খারাপ হয়ে গেল, আমি ভারাক্রান্ত গলায় বললাম, 'ক্ষমা করার কী আছে। তোমার মত ভাল আর বিশ্বস্ত স্ত্রী তো খুব বেশি নেই।'

'না, গিম্পেল, না। এতগুলো বছর ধরে আমি তোমার সাথে

প্রতারণা করে আসছি। ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছি পাক-পবিত্র হতে। তোমাকে বলছি, শোনো, এই বাচ্চাদের কোনটাই তোমার নয়।'

সত্যি বলছি, কেউ একজন যদি একটা বড় কাঠের টুকরো দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি বসাত, তবুও আমি এত দুঃখ পেতাম না, এই কথাটায় যত দুঃখ পেলাম। আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'ওরা তা হলে কাদের?'

'আমি জানি না। এত লোক আমার সাথে... কিন্তু ওরা তোমার নয়।' বলতে বলতেই এলকার মাথা একদিকে হেলে পড়ল, চোখ ঘোলা হয়ে এলো। একসময় সব শেষ হয়ে গেল, তার সাদা হয়ে আসা ঠোঁটে ম্লান একটা হাসি লেগে থাকল শুধু।

মরে যাওয়ায় কথা শেষ করতে পারেনি, কিন্তু আমার মনে হলো, সে বলছে, আমি গিম্পেলকে ঠকিয়েছি। সারা জীবন ধরেই ঠকিয়েছি।

চার

এক রাতে, আমি ময়দার বস্তার উপর ঘুমিয়ে আছি, এমন সময় স্বপ্নে শয়তানের ছায়ামূর্তি এসে হাজির। সে বলল, 'গিম্পেল, তুই ঘুমিয়ে আছিস কেন?'

আমি বললাম, 'তা হলে কী করব? ঘোড়ার ঘাস কাটব?'

'সারা পৃথিবী তোকে ঠকিয়েছে, এখন তোর প্রতিশোধ নেবার পালা।'

'আমি একা কীভাবে সারা পৃথিবীর উপর প্রতিশোধ নেব?'

'সারাদিন তুই মানুষের প্রস্রাব যোগাড় করে একটা বালতি

ভর্তি করে রাতে ময়দার সাথে ওটা মিশিয়ে দিবি। সারা ফ্রাম্পোলকে তা হলে পেশাব খাওয়ানো হয়ে গেল।'

এরপর শয়তান উধাও হয়ে গেল। শয়তান চলে যেতেই প্রকৃতির ডাকে আমার ঘুম ভাঙল। পাশেই দেখি ময়দার তাল রাখা আছে। মনে হচ্ছে যেন ময়দার স্তূপ আমাকে বলছে, 'সেরে ফেল্। এখনই কাজটা সেরে ফেল্।'

আমি কাজ সারলাম।

সকালে আমার দোকানের কর্মচারী আসবার পর আমরা ওই ময়দা সেঁকে রুটি বানালাম। সে চলে যেতেই চুল্লীর পাশে বসে আমার বেশ ভাল বোধ হলো। তা হলে গিম্পেল, এতদিনের শোধ আজ তোলা হচ্ছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা থাকলেও চুল্লীর কারণে ঘরের ভেতরটা গরম। এরকম আরামদায়ক উষ্ণতায় আমার কেন যেন ঝিমুনি চলে এলো।

ঘুমের মাঝে এবার চলে এলো আমার মৃত স্ত্রী এলকা, সে রাগত স্বরে বলে। 'এসব কী করেছ, গিম্পেল।'

কতদিন পর দেখলাম ওকে, আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, 'সব তোমার দোষ, এলকা। সব দোষ তোমার।'

'তুমি বোকা,' সে বলল। 'এমন বেকুব কেন তুমি? আমি খারাপ ছিলাম বলে তোমাকেও তা হতে হবে? আমি নিজেকে ছাড়া কাউকে ঠকাইনি, এর জন্য আমাকে মূল্যও দিতে হচ্ছে।'

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। কালো হয়ে আসা একটা অবয়ব। আমি কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠলাম। অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলাম না। মনে হলো সবকিছু শূন্যে ভাসছে। একটা ভুল পদক্ষেপ ফেললে আমি সারা জীবন হোঁচট খাব। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে কৃপা করলেন। বড় কড়াইতে করে সব রুটি নিয়ে আমি উঠোনে গেলাম। ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে যাওয়া মাটি

খুঁড়ে বড় একটা গর্ত তৈরি করলাম।

আমার কাজ দেখে কর্মচারীটি দৌড়ে এসে বলল, 'এসব কী করছেন, সার।'

আমি দেখতে পেলাম তার মুখ মৃতদের মত ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে।

'আমি জানি আমি কী করছি।' তার চোখের সামনে সব রুটি মাটি চাপা দিলাম আমি।

বাড়ি ফিরে আমার সব টাকা-পয়সা বাচ্চাদের মাঝে ভাগ করে দিয়ে বললাম, 'গত রাতে তোমাদের মাকে দেখেছি। সে খুব কষ্টে আছে।'

বাচ্চারা এত অবাক হলো যে কেউ কিছু বলতে পারল না।

আমি ধীরে ধীরে বললাম, 'ভাল থেকো, আর ভুলে যেয়ো গিম্পেল বলে কেউ একজন এখানে ছিল।' তারপর আমি ধর্মগ্রন্থে চুমু খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। লোকজন আমাকে দেখে দারুণ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় চললেন আপনি?'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'পৃথিবীর পথে।' কাজেই আমি ফ্রাম্পোল থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

সারা পৃথিবীতে হাঁটতে থাকলাম আমি। ভাল লোকজন কখনোই আমাকে অবহেলা করল না। অনেক বছর পথ পরিক্রমণ করে বৃদ্ধ হয়ে পড়লাম। আমার সারা শরীর সাদা হয়ে এল। কত আজগুবি মিথ্যা গল্প শুনলাম, তার কোন ঠিক নেই। কিন্তু যতই আমি বেঁচে থেকে বুঝতে শিখি, ততই মনে হয় পৃথিবীতে মিথ্যা বলে কিছু নেই। স্বপ্নে মানুষ যা দেখে, তা তার জীবনে না ঘটলেও অন্য কারও জীবনে ঘটতেই পারে, আজকে কোনও কিছু না হলেও এ জিনিস কাল হতে পারে। পরের বছর যা হবার কথা, তা ও-সময় না হলে একশো বছর পর ঠিকই হবে। তা হলে কী

এমন পার্থক্য থাকল?

একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলতে চলতে, নানা নতুন পরিবেশে নতুন লোকজনের সাথে খেতে বসে কত শত গল্প শোনাই আমি তাদের–দৈত্য, যাদুকর, বাতাস, ফল, কিংবা এমন কিছুর, যেটা কোনদিন ঘটেওনি। আমার পেছনে বাচ্চারা ছুটতে ছুটতে বলে, 'দাদু, আমাদের একটা গল্প শোনাও না।' অনেক সময় তারা নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ে গল্পের আব্দার করে। আমি সবসময় তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। একদিন এক নাদুস-নুদুস ছেলে বলে, 'দাদু, এ গল্প তো আমাকে আগেও শুনিয়েছ।'

দাদুমণি, এক অর্থে তুমি ঠিকই বলেছ।

এমনও হতে পারে, আমার জীবনের সমস্তই আসলে স্বপ্নে ঘটেছে।

অনেক বছর হলো আমি ফ্রাম্পোল শহর ছেড়ে এসেছি, কিন্তু যখনই চোখ বুজি, নিমেষেই চলে যাই সেখানে। সেখানে গিয়ে কাকে দেখি, জানেন? এলকা–সে যেন আমাদের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, যেমনটি সে দাঁড়িয়েছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময়। কিন্তু এখন তার মুখ অপার্থিব দ্যুতিতে উজ্জ্বল। জেগে থাকলে আমি সব ভুলে যাই, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেই সমস্তটা পরিষ্কার হয়ে আসে। এলকা একজন সাধু-সন্তের মতই আমার যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেয়। আমি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলি, 'এলকা, আমাকে সাথে নিয়ে নাও।' এলকা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আরেকটু ধৈর্য ধারণ করতে। মাঝে মাঝে সে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। জেগে উঠে আমি তার ঠোঁটের ছোঁয়া এবং কান্নার লবণাক্ত স্বাদ অনুভব করতে পারি।

যে জীর্ণ কুঁড়েঘরে আমি ঘুমাই, তার মেঝেতে কিছু তক্তা আছে মৃতদের বহন করে নেবার জন্য। কবর খোঁড়ার জন্য গোর

খোদকও তৈরি হয়েই আছে। কবর অপেক্ষা করছে, পোকা-মাকড়গুলো ক্ষুধার্ত হয়ে বসে আছে। কফিন তৈরি হচ্ছে বহন করতে। আরেকজন মুসাফির অপেক্ষা করে আছেন আমার রেখে যাওয়া বিছানায় উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ্রাম নিতে। সময় এলে তাই আমি খুশি মনেই যাত্রা শুরু করব। ওই জায়গাতে যা-ই থাকুক না কেন, তা-ই সত্য। কোনও কুটিলতা, বঞ্চনা, উপহাসের স্থান নেই সেখানে। ঈশ্বর নিজেই সেখানে অভ্যর্থনা জানাবেন। সেখানে এমনকী এই হাবা গিম্পেলও কখনও প্রতারিত হবে না।

মূলঃ আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার
রূপান্তরঃ হাসান শিবলী

ক্ষুধাশিল্পী

[অনুবাদকের কথা: ফ্রানজ্ কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) ছিলেন অস্ট্রিয়ান লেখক এবং ওইসব হতভাগ্য ব্যক্তির একজন, যাঁরা সাহিত্যের জন্য আজীবন ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন, বিনিময়ে কিছু পাননি এবং জীবদ্দশায় পৃথিবী তাঁদের কোনও মূল্যায়ন করেনি। মৃত্যুর আগে তিনি অভিমান করে তাঁর বন্ধু প্রকাশক ম্যাক্স ব্রডকে বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যেন তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্ম পুড়িয়ে ফেলা হয়। ম্যাক্স ব্রড মুমূর্ষু বন্ধুর অনুরোধ রাখেননি। ভাগ্যিস রাখেননি, নইলে আজ পৃথিবী কাফকার সাহিত্য প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হত এবং সাহিত্যে 'কাফকীয়' শব্দটিরও প্রচলন হত না। তাঁর মৃত্যুর পর যখন ম্যাক্স ব্রড বন্ধুর লেখাগুলো প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন, ফ্রানজ্ কাফকাকে আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা হিসেবে মেনে নিতে দ্বিধা করল না উত্তর প্রজন্ম। *দ্য মেটামরফোসিস, দ্য ট্রায়াল, দ্য ক্যাসল*—এই উপন্যাসগুলো বাদ দিয়ে আধুনিক সাহিত্য চিন্তাই করা যায় না। আমরা অবাক হই না, যখন নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক আলবেয়্যর কামু কাফকাকে তাঁর আদর্শ হিসেবে ঘোষণা দেন; বিস্মিত হই না, আরেক নোবেল লরেট গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ যখন বলেন তাঁর সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার প্রেরণা হলেন ফ্রানজ্ কাফকা।

কাফকার গল্পে রহস্য আছে, আছে রোমাঞ্চ, আছে ভয়-বীভৎসতা আর জাদুবাস্তবতা। তবে তিনি অন্য কোনও জগতে বা নির্জন কোনও স্থানে ভীতির সন্ধান করেননি, ভীতি আর রোমাঞ্চকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর আশপাশেই, জনতার মাঝেই, এই সমাজে। মানুষই ভীতির উৎস, এই সমাজই এক বীভৎস ডিসটোপিয়া। ফ্রানজ্ কাফকার এ গল্পটি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর একটি। উনবিংশ শতকে অস্ট্রিয়াতে ক্ষুধাশিল্প বলে একধরনের খেলা চালু ছিল। পেশাদারভাবে কিছু লোক না খেয়ে থাকত এবং লোকে টিকিট কেটে তাদের দেখতে আসত। এই ব্যাপারটিকে প্রতীক হিসেবে নিয়ে কাফকা লিখলেন তাঁর মডার্ন ক্লাসিক–*আ হাঙ্গার আর্টিস্ট*। একজন শিল্পী যে একাকীত্বে ভোগেন, যে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হন, এবং এই বস্তুকেন্দ্রিক-আত্মিকভাবে শূন্য সমাজ যেভাবে একজন শিল্পীকে দূরে ছুঁড়ে দেয়, শিল্পীর যে ট্র্যাজেডি, সেটাই উঠে এসেছে এই গল্পে। সমাজ বস্তুগত্-মোটাদাগের আনন্দ চায়, শিল্পের মত আত্মিক উন্নতির চর্চা সমাজে গৃহীত হয় খুব কম। এই গল্পের ভেতর আমরা খুঁজে পাব শুধু কাফকাকে নয়–জীবনানন্দকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, বিভূতিভূষণকে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে– এঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখব, এঁরা প্রত্যেকেই একেকজন ক্ষুধাশিল্পী ছিলেন।

আজীবন আত্মিক দ্বন্দ্বে ভুগেছেন কাফকা, অফিসের যান্ত্রিকতা আর সাহিত্য জগতের সৃষ্টিশীলতা–এই দ্বৈত জীবনের টানাপোড়েন আর শিল্পীর একাকীত্ব তাঁকে ভেতরে ভেতরে ক্ষয় করে। সারাদিন ইনস্যুরেন্স অফিসে হাড়ভাঙা চাকরি আর রাত জেগে লেখালেখি তাঁর আয়ু কমিয়ে দেয়। চল্লিশ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে তিনি মারা যান।]

বিগত দশকে পেশাদার ক্ষুধাশিল্প নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে সময় ক্ষুধাশিল্পীরা পেশাদারভাবে না খেয়ে থেকে ভালই উপার্জন করত, এখন আর সে সুযোগ নেই। এখন আমরা একটি পরিবর্তিত পৃথিবীতে বাস করি। এক সময় পুরো শহর ক্ষুধাশিল্পীদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়েছে; তার অভুক্ত দিনের সংখ্যা যত বাড়ত, মানুষের উত্তেজনাও বাড়ত সমান তালে; প্রত্যেকেই দিনে অন্তত একবার এই ক্ষুধাশিল্পীকে দেখতে উন্মুখ ছিল; কেউ কেউ তো সারাদিনের জন্য টিকেট কেটে শিল্পীর খাঁচার সামনে বসে থাকত; এমনকী রাতেও ভিজিটিং আওয়ার চলত, যখন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু শিল্পীকে আলো ফেলে ফোকাস করে রাখা হত; বৃষ্টিহীন দিনগুলোতে খাঁচাটা খোলা আকাশের নীচে রাখা হত, তখন ক্ষুধাশিল্পী হয়ে উঠত শিশুদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু; আর তাদের অভিভাবকদের জন্য সে ছিল এক কৌতুককর বিষয়–একধরনের ফ্যাশন মনে করতেন তাঁরা এটাকে, কিন্তু শিশুরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখত, একে অন্যের হাত ধরে রাখত যেন তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, বিস্মিত হয়ে দেখত খাঁচার ভেতর হেলান দিয়ে বসে থাকা দুর্বল ক্ষুধাশিল্পীকে–যার পাঁজরের হাড়গুলো এতদূরে থেকেও তারা গুণে নিতে পারত; তার বসে থাকার জন্য কোনও গদিও ছিল না–সে বসে থাকত খড়কুটোর গাদায়; কেউ কেউ কৌতূহলবশত দু'একটা প্রশ্ন করত তাকে, সে শুধু মাথাটা ঈষৎ নেড়ে উত্তর দিত, কদাচিৎ অল্প হাসতও, কখনও বা খাঁচার ফাঁক দিয়ে একটি হাত এগিয়ে দিত যেন কৌতূহলী দর্শক অনুভব করতে পারে সে কতটা শীর্ণ, আর তারপর আবার সে মাথা নিচু করে নিজের মধ্যে ডুবে যেত, কোনওদিকেই আর কোনও মনোযোগ দিত না সে, এমনকী তার খাঁচার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসবাব টিকটিক করতে থাকা ঘড়িটাকেও সে ভুলে যেত, শুধু চোখটা অর্ধেক বুজে শূন্য চোখে

চেয়ে থাকত, মাঝে মধ্যে শুধু গেলাস থেকে দু'এক ঢোক পানি চুমুক দিয়ে টেনে নিত।

টিকেট কেটে ঢোকা যাত্রীদের পাশাপাশি নির্বাচিত কিছু স্থায়ী দর্শকও থাকত, অদ্ভুত হলেও সত্য, সচরাচর কসাইরাই এই পদে নিয়োগ পেত, এবং তাদের কাজ ছিল দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা ক্ষুধাশিল্পীর উপর নজর রাখা যাতে লুকিয়ে কোনও খাবারের বন্দোবস্ত সে করতে না পারে। এটা শুধু একটা ফরমালিটি ছাড়া আর কিছু ছিল না, দর্শকদের সন্তুষ্ট রাখা শুধু, কারণ কর্তৃপক্ষ জানত, ক্ষুধাশিল্পী কোনও অবস্থাতেই–এমনকী জোর করলেও এক গ্রাস খাবারও মুখে তুলবে না; তার নিজের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাই তাকে বিরত রাখবে। দর্শকরা সবাই তা বুঝত না, তাই তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পর্যবেক্ষকের ব্যবস্থা করতে হত। কিছু দর্শক তার খাঁচার পাশেই আড্ডা জমিয়ে বসত, তাস পেটাত; তারা ভাবত, এতে বোধহয় ক্ষুধাশিল্পীকে একটু রিল্যাক্স দেয়া হচ্ছে; কিন্তু সত্য হচ্ছে এই, এই দর্শকদেরই সে সবচেয়ে অপছন্দ করত, এই ধরনের দর্শকরা তাকে ক্লান্ত করত, তার অভুক্ততার সময়কে হ্রাস করে দিত: মাঝে মাঝে সে দুর্বল কণ্ঠে গান গাইত যতক্ষণ পারা যায় যাতে করে ওই দর্শকরা বুঝতে পারে সে ক্লান্ত নয়, সে রিল্যাক্স চায় না, সে চায় মানুষ তাকে দেখুক, এজন্যই তো সে না খেয়ে আছে। কিন্তু তার এই চেষ্টা খুব একটা কাজে আসত না; তারা অবাক হয়ে ভাবত, সে বোধহয় গোপন কোনও উৎস থেকে খাবার জোগাড় করেছে এবং এ জন্যই এই গান বেরোচ্ছে; নইলে এতদিন কেউ না খেয়ে থাকতে পারে? কিছু দর্শক শুধু কর্তৃপক্ষের দেয়া আলোতে সন্তুষ্ট থাকত না, পকেট থেকে বৈদ্যুতিক টর্চ বের করে আলো ফেলে তাকে দেখত। এই রুক্ষ আলো ক্ষুধাশিল্পীকে একেবারেই বিরক্ত করত

না, সে কখনোই ভাল করে ঘুমোতে পারত না কিন্তু ঝিমোতে পারত সবসময়, তা সে আলোর তীব্রতা যতই হোক, এমনকী দিনের বেলা যখন হাজার মানুষ তাকে দেখতে আসত তখনও। এই ধরনের দর্শকদের সাথে নির্ঘুম রাত কাটাতে তার ভালই লাগত; সে তাদের সাথে হাসি-তামাশা করতেও প্রস্তুত ছিল, চাইত তাদেরকে তার যাযাবর জীবনের কাহিনি শোনাতে, সে যে আসলেই না খেয়ে আছে এবং তার যে গোপন কোনও খাদ্যের উৎস নেই, সেটা তাদের বোঝানোর জন্য সে সবকিছুই করতে প্রস্তুত ছিল। সকালবেলা এই দর্শকদের জন্য নিজ খরচে সে খাবার আনাত–সেটা ছিল তার সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত, দর্শকরা ঝাঁপিয়ে পড়ত খাবারের উপর, তবু তাদের সন্দেহ সহজে যেত না।

এ ধরনের সন্দেহ অবশ্য একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ক্ষুধাশিল্পের। কেউই একা দিনরাত ক্ষুধাশিল্পীকে একটানা চোখে চোখে রাখতে পারত না, ফলে কেউই দাবি করতে পারত না, শিল্পী সত্যি একটানা না খেয়ে আছে; একমাত্র শিল্পীই সেটা জানত, কাজেই সে একাই ছিল নিজের অভুক্ত থাকার প্রমাণ, একমাত্র সন্তুষ্ট দর্শক। অন্যদিকে আবার সে কখনোই সন্তুষ্ট ছিল না; সে ছাড়া আর কেউ জানল না, না খেয়ে থাকা কতই না সহজ! এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ। সে কিছুই গোপন করত না, তবু মানুষ তাকে অবিশ্বাস করত। না খেয়ে থাকার জন্য চল্লিশ দিনের সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল, এরপর কর্তৃপক্ষ আর অনুমতি দিত না। এর স্বপক্ষে কারণ ছিল, চল্লিশ দিন পর আর দর্শকের উৎসাহ থাকে না, দিনের পর দিন একজন ক্ষুধার্ত মানুষ তারা দেখতে চায় না। কাজেই চল্লিশ দিন পর খাঁচা খোলা হত, কৌতূহলী দর্শকরা জড়ো হত সেখানে, ব্যাণ্ডপার্টি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে

হাজির হত, দু'জন ডাক্তার খাঁচায় ঢুকে পরীক্ষা করত ক্ষুধাশিল্পীর শারীরিক অবস্থা, তারপর তারা মাইক্রোফোনে সেটা ঘোষণা করত, দু'জন নির্বাচিত তরুণী উপস্থিত হত, তারা তাকে নিয়ে যেত একটি টেবিলে যেখানে খাবার রাখা থাকত, কিন্তু ক্ষুধাশিল্পী প্রায়শই খেতে অস্বীকার করত, কেন খাবে সে? কেন চল্লিশ দিন পরই খাওয়া শুরু করতে হবে? অনেকক্ষণ গোঁ ধরে বসে থাকত সে, কেন এখন অভুক্ত থাকা বন্ধ করে দিতে হবে যখন সে তার অভুক্ততার শিখরে আছে? আরও না খেয়ে থাকলে যে রেকর্ডটা তার হবে, তা থেকে তাকে কেন বঞ্চিত করা হবে? যদিও রেকর্ড সে করেই ফেলেছে, তবু নিজের রেকর্ড নিজে ভাঙার চেয়ে আনন্দের আর কী আছে—বিশেষ করে সে যখন উপলব্ধি করছে সে অগুনতি দিন না খেয়ে থাকতে পারে? দর্শকরা যে এত বাহবা দিচ্ছে তাকে, চল্লিশ দিনের বেশি না খেয়ে থাকলে এই বাহবা তারা দেয় না কেন? কেন তারা উৎসাহ হারিয়ে বসে থাকে? কত চমৎকার সে বসে ছিল খাঁচায় অলস ভাবে, আর এখন কি না তাকে খেতে হবে, আবার নামতে হবে জীবন যুদ্ধে? এতদিন খায়নি বলেই তো খাবারের সন্ধানে তাকে ছুটতে হয়নি—এই চিন্তা তাঁর মধ্যে এক আদিম অবসাদ জাগিয়ে তুলত। সে চোখ তুলে তরুণী দু'জনের দিকে তাকাত, যারা দেখতে কত দয়ালু অথচ আসলে কত নিষ্ঠুর! শক্তিহীন ঘাড়ের উপর মাথাটা ঈষৎ নাড়ত সে। কিন্তু তখনই আবার তাই ঘটত যা সবসময় ঘটে এসেছে। আয়োজকদের প্রধান নিঃশব্দে এগিয়ে আসতেন—কারণ ব্যাণ্ডের আওয়াজ কথা বলা অসম্ভব করে দিয়েছে—ক্ষুধাশিল্পীর মাথার উপর বাতাসে হাতটা তুলতেন তিনি, যেন ঈশ্বরকে আহ্বান জানাচ্ছেন খড়কুটোয় পড়ে থাকা তাঁর সৃষ্টিকে, এই যন্ত্রণাকাতর শহীদকে দেখার জন্যে যে আসলেই তার ছিল, যদিও অন্য অর্থে; তারপর

তিনি শিল্পীকে তার দুর্বল কোমর ধরে তুলতেন, একটু বেশি সতর্কতার সাথে; এবং তাকে নির্বাচিত সেবিকাদের হাতে সমর্পণ করতেন। শিল্পী তখন পুরোপুরি সমর্পিত; মাথাটা বিমান অবতরণ করার মত পড়ে আছে বুকের উপর; তার শরীর বিপর্যস্ত, দু'হাঁটু একত্রিত হয়ে গিয়ে যেন নিজেদেরই সামাল দিতে ব্যস্ত, পায়ের পাতা দুটো মাটিতে এমন ভাবে পড়ে আছে যেন কোনও শক্ত ভিত্তি পাচ্ছে না দাঁড়ানোর; পাখির পালকের মত ওজন নিয়ে সে ভর দিয়ে থাকত সেবিকাদের শরীরে যারা আশপাশে তাকাতে তাকাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। তারপর খাবার আসত, আয়োজক অনেক কষ্টে শিল্পীর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েক ফোঁটা নির্গত করতে সক্ষম হতেন, শিল্পী বসে থাকতেন অর্ধচেতনের মত; পূর্ণদ্যোমে ব্যাণ্ড বাজত, দর্শকেরা একে একে চলে যেত– প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট, একমাত্র শিল্পীই যথারীতি অসন্তুষ্ট।

এমনই এক ক্ষুধাশিল্পীর কথা বলব। অনেকদিন বেঁচেছিল সে, তার স্বাস্থ্যের তেমন উন্নতি হয়নি, পৃথিবী তাকে সম্মান দিয়েছে, ভুলেও গেছে, কেউই তার এই ক্ষুধাশিল্পকে একটি বিনোদন ছাড়া কিছু ভাবেনি, এর পেছনে কত ত্যাগ, কত রাত জাগা যন্ত্রণা, এসব ভাবেনি কেউ। মাঝেমাঝে সে ভাবে, সে আসলে কী চায়? কী সম্মান সে চায়? যদি কখনও কোনও সহৃদয় মানুষ তার অসন্তুষ্টি দেখে এই বলে সান্ত্বনা দিত যে একটানা না খেয়ে থাকার কারণেই তার এমন হয়েছে, সে হিংস্রতায় ফেটে পড়ত, খাঁচার শিক ধরে ঝাঁকাত পশুর মত। আয়োজক তখন এগিয়ে আসতেন, জনতার কাছে এই বলে ক্ষমা চাইতেন যে, ক্ষুধা সইতে না পেরে শিল্পী অমন করেছে; পেটভর্তি খাবার নিয়ে যেসব লোকেরা প্রদর্শনীতে আসত, তারা এসব বুঝত না; আরও বেশিদিন সে না খেয়ে থাকতে পারবে বলে যে দাবি সে করে

আসছিল, সেটাকে অহংকার ধরে নিয়ে সবাই সমালোচনা করত; আয়োজক একটি ছবি বের করতেন–যেটাও অবশ্যই ছিল বিক্রির জন্য–যেখানে না খেয়ে থাকার চল্লিশ দিনে একটি বিছানায় শিল্পী শুয়ে আছে প্রায় মৃত অবস্থায়। সত্যের এই বিকৃতি যদিও শিল্পীর জন্য নতুন নয়, তবু প্রত্যেকটি বিকৃতি নতুন করে করে তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিত। তার ক্ষুধার্ত দিনের দ্রুত পরিসমাপ্তির ফলাফলকে এরা কারণ বলে দেখাতে চাচ্ছে! অবুঝ-নির্বোধ-অন্ধ এই মানুষগুলো, শুধু এরা নয়, পুরো পৃথিবীই অন্ধ–একা কী করে লড়বে এদের সাথে! খাঁচার ভেতরে দাঁড়িয়ে সে এদের কথা শুনত, কিন্তু যখনই আয়োজক ছবিটি বের করতেন, সে একটা গর্জন করে তার খড়কুটোর মধ্যে ফিরে যেত।

কয়েক বছর পরেই, যখন এই ক্ষুধাশিল্পের দর্শকেরা এসব ঘটনা স্মরণ করতে চাইলেন, তাঁরা নিজেদেরকেই বুঝতে পারলেন না। কারণ, ততদিনে দর্শকদের আগ্রহ পরিবর্তিত হয়েছে; যেন রাতারাতি পরিবর্তন; হয়তো এর পেছনে কোনও কারণ আছে, কিন্তু কে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে? একদিন ক্ষুধাশিল্পী নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় আবিষ্কার করল, আনন্দে উত্তাল জনতা তার খাঁচাকে পাশ কাটিয়ে আরও বেশি আকর্ষণীয় কোনও বিনোদনের দিকে ছুটে গেল। গতবার আয়োজক ক্ষুধাশিল্পীকে নিয়ে ইউরোপের অর্ধেক ঘুরে এসেছিলেন এখনও লোকে ক্ষুধাশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট কিনা দেখার জন্য, ব্যর্থ। সবার মধ্যেই যেন একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে ক্ষুধাশিল্পের প্রতি। আয়োজন এবং ক্ষুধাশিল্পী–উভয়েই বিস্মিত হলেন, রাতারাতি নিশ্চয় দর্শকের মন বদলে যেতে পারে না; কোনও কারণ অবশ্যই আছে, কিন্তু এখন আর সে কারণ খোঁজারও আগ্রহ নেই কারও। না খেয়ে থাকাটা হয়তো ভবিষ্যতে আবারও কোনও ফ্যাশন

হিসেবে আবির্ভূত হবে, কিন্তু বর্তমানে যারা বেঁচে আছে তাদের কী হবে? ক্ষুধাশিল্পী এখন কী করবে? এক সময় হাজার মানুষের করতালিতে তার খাঁচার চারপাশ মুখরিত হয়েছে, আজ সে নিঃসঙ্গ নেমে এল একটি গ্রামের মেলায় অন্য পেশার খোঁজে। সে আজ শুধু বৃদ্ধই হয়ে যায়নি, মানসিক ভাবেও প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছে। সে তার আয়োজকের কাছ থেকে বিদায় নিল, তার ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘোষণা করল এবং একটি সার্কাস দলে নিজেকে ভাড়া দিল।

পশুপাখি, মানুষ আর নানান জিনিসপত্রে ভরপুর একটি সার্কাস দল সবসময়ই একজন চাকরিপ্রার্থীর জন্য উপকারে আসতে পারে, এমনকী একজন ক্ষুধাশিল্পীর জন্যও, যদি না সে খুব বেশি আশা করে, আর এই ক্ষুধাশিল্পীকে খুব সাদরেই গ্রহণ করা হলো কারণ তার আগে থেকেই সুনাম ছিল, আর তার কাজের বিশেষত্বের জন্যও, যেটা ক্রমশ অগ্রসরমান বিনোদনের ক্ষেত্রে অতুলনীয়, আর তার মত আর কেউ সার্কাস দলে নাম লেখায়নি বলে তার একটা বিশেষ চাহিদাও ছিল; সার্কাস দলের কাছে ক্ষুধাশিল্পী দাবি করল যে সে আগের মতই না খেয়ে থাকার খেলা দেখাতে পারে যেটা ছিল তাকে নেয়ার মূল কারণ, সে আরও দাবি করল যদি তাকে তার ইচ্ছে মত অভুক্ত থাকতে দেয়া হয়, তবে সে এমন রেকর্ড করতে পারবে যেটা আগে কেউ কখনও করেনি।

সে তার প্রকৃত অবস্থা ভুলে যায়নি, কাজেই সে আবেদন করল তাকে এবং তার খাঁচাকে যেন সার্কাস রিং-এর মধ্যমণি করে না রেখে বাইরে রাখা হয়, অন্যান্য প্রাণীর খাঁচার সাথে, যাতে করে সবাই তাকে দেখতে পায়। তার আবেদন গৃহীত হলো এবং একটি লেবেলে তার বিবরণ লিখে তাকে খাঁচার বাইরে রাখা

হলো। যখন দর্শকরা খাঁচাবন্দী পশুগুলোকে দেখতে আসত, ক্ষুধাশিল্পীর খাঁচার সামনে একটু না দাঁড়িয়ে পারত না, হয়তো তারা আরও বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াত যদি না লাইনে থাকা লোকগুলো পেছন থেকে ধাক্কা দিত। ক্ষুধাশিল্পী এই ভিজিটিং আওয়ারকেই তার দিনের শ্রেষ্ঠ সময় মনে করত। প্রথমদিকে সে জনতার জন্য অস্থির হয়ে অপেক্ষা করত, তার খাঁচার সামনে স্রোতের মত জনসমুদ্র তাকে প্রেরণা দিত, কিন্তু খুব দ্রুতই সে আবিষ্কার করল, দর্শকরা তাকে অন্যান্য খাঁচাবন্দী প্রাণীর চেয়ে খুব একটা আলাদা করে দেখছে না; দূর থেকে যখন তারা তাকে দেখত, সেটাই তার ভাল লাগত, কাছে এলে তাদের সম্মিলিত চিৎকার তাকে পাগলপ্রায় করে দিত। যখন কোনও পিতা তাঁর সন্তানদের নিয়ে তাকে দেখতে আসতেন, তাঁর দিকে আঙুল তুলে শিশুদেরকে বর্ণনা দিতেন যে এখানে আসলে কী হচ্ছে, কতটা রোমাঞ্চকর ক্ষুধাশিল্পীর সাধনা, কতটা ত্যাগ তাকে স্বীকার করতে হয়, তখন ক্ষুধাশিল্পীর খুব ভাল লাগত। কিন্তু এই শিশুরা অবোধের মতই চেয়ে থাকত, স্কুলের ভেতরে কিংবা বাইরে কোথাওই তারা কিছু শেখার জন্য আসে না, তারা ক্ষুধাশিল্পের কী বুঝবে? মাঝে মাঝে সে নিজেকে বলত, তার খাঁচাটা যদি পশু রাখার খাঁচাগুলোর এত কাছে না রাখা হত বোধহয় ভাল হত। দর্শকেরা খুব সহজেই শিল্পী আর মাংসাশী পশুকে গুলিয়ে ফেলে; পশুগুলোর খাঁচায় পড়ে থাকা কাঁচা মাংসের তালগুলোকে ঘিরে গর্জনরত মাংসাশী জানোয়ার তাকে হতাশায় ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু সে ম্যানেজারকে কোনও অভিযোগ করেনি; হাজার হোক, দর্শকরা যে এখানে আসে, সেজন্য সে পশুগুলোর কাছে কৃতজ্ঞ, পশু দেখতে আসা জনতার ভেতর দু'একজন হয়তো তার প্রতি আগ্রহ বোধ করবে, যারা অনুভব করবে সে মানুষ, মাংসাশী নয়।

একদিন সে আবিষ্কার করল, অস্তিত্ব থাকা অবস্থাতেই সে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। লোকেরা তার না খেয়ে থাকাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং তাদের কাছে এটাকে আর নতুন কিছু মনে হচ্ছে না, শিল্প মনে হওয়া তো দূরের কথা; লোকে নির্বিকারভাবে আজকাল তার খাঁচাকে পাশ কাটিয়ে যায় যেন জায়গাটা শূন্য। অভুক্ত থাকাকে একটি শিল্প হিসেবে উপস্থাপন করা কঠিন, যারা বোঝে না, তাদেরকে বোঝানো যায় না। তার খাঁচার সামনে সেঁটে রাখা 'ক্ষুধাশিল্পী' লেখা লেবেলটা ক্রমশ ময়লা এবং পাঠ অযোগ্য হয়ে ওঠে, একদিন সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলা হয়; যে বোর্ডটাতে তার অভুক্ত দিনের হিসাব লিখে রাখা হত এবং প্রতিদিন যত্ন সহকারে সেটা আপডেট করা হত, সেটার হিসাব একসময় একজায়গায় থমকে যায়, সার্কাসের স্টাফদের কাছে ওটা পরিবর্তন করাও অর্থহীন মনে হয়; ক্ষুধাশিল্পী না খেয়ে চলে, যেমনটি সে একসময় চেয়েছিল এবং তার না খেয়ে থাকতে কোনও কষ্ট হয় না যেমন সে একসময় দাবি করত; কিন্তু কেউ আর দিন গোণে না, কেউ না, এমনকী শিল্পী নিজেও জানে না কী কী রেকর্ড সে এর মধ্যে ভেঙে ফেলেছে; তার মন ভারি হয়ে ওঠে। যখন হঠাৎ কোনও অলস পথিক তার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বোর্ডে লেখা পুরনো হিসাব নিয়ে ঠাট্টা করে, বলে যে এখানে মিথ্যে কথা লিখে রাখা হয়েছে, ক্ষুধাশিল্পীর কাছে এটাকে সবচেয়ে হীন এবং ঘৃণ্য ঠাট্টা মনে হয়, কারণ সে কাউকে ঠকায়নি, সততার সাথে সে তার শিল্পচর্চা করে গেছে; পৃথিবী তার প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে, ঠকিয়েছে। যা হোক, আরও অনেকদিন চলে গেল, এবং সেই দিনগুলোও একদিন শেষ হয়ে এল। একদিন এক ধনী ব্যবসায়ীর চোখ পড়ল খাঁচাটির উপর এবং সে সার্কাসের কর্মীদের ডেকে জিজ্ঞেস করল, কেন এত

চমৎকার খাঁচাটির ভেতর কিছু খড়কুটো রেখে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে? কেউ কিছু বলতে পারল না। কতদিন হয়েছে কে জানে, সবাই ক্ষুধাশিল্পীর কথা ভুলে গিয়েছে। হঠাৎ একজন ব্যক্তি মেয়াদোত্তীর্ণ নোটিশ বোর্ডটা দেখে মনে করতে পারল—হ্যাঁ, এখানে একজন ক্ষুধাশিল্পী ছিল বটে। তারা একটা লাঠি দিয়ে খড়কুটোগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে শিল্পীকে খুঁজে পেল। ক্ষুধার্ত থাকতে থাকতে শীর্ণ হতে হতে সে খড়কুটোর সাথে মিশে গিয়েছে, ওগুলোর সাথে তাকে এখন আর আলাদা করে চেনা যায় না।

'তুমি কি এখনও না খেয়ে আছ?' ব্যবসায়ী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কখনোই না খেয়ে থাকা বন্ধ করবে না?'

'আমাকে আপনারা ক্ষমা করে দেবেন।' ক্ষুধাশিল্পী ফিসফিস করে বলল; শুধু তার মুখের কাছে কান পেতে থাকা ধনী ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউ তার কথা বুঝতে পারল না।

'অবশ্যই,' ব্যবসায়ী বললেন এবং কর্মীদের দিকে তাকিয়ে নিজের কপালের পাশে আঙুল ছুঁইয়ে ইশারায় শিল্পীর মানসিক বৈকল্যকে ইঙ্গিত করলেন, 'আমরা তোমাকে ক্ষমা করছি।'

'আমি সবসময় চেয়েছি আপনারা আমার ক্ষুধাশিল্পকে প্রশংসা করবেন,' ক্ষুধাশিল্পী বলল।

'আমরা প্রশংসা করছি।' বললেন ব্যবসায়ী।

'কিন্তু আপনাদের সেটা করা উচিত নয়।'

'কেন নয়?'

'কারণ আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে, অভুক্ত থাকা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই।'

'অদ্ভুত মানুষ তুমি!' ব্যবসায়ী বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'কেন, তোমার আর কোনও উপায় নেই?'

'কারণ, যে খাবার আমার প্রয়োজন, তা আমি এখনও পাইনি। যদি পেতাম, বিশ্বাস করুন, সব ছেড়েছুঁড়ে আমিও আপনাদের মত হয়ে যেতাম।'

এই ছিল ক্ষুধাশিল্পীর শেষ কথা, মৃত্যুর সময়ও তার আধবোজা চোখ দুটোতে অভুক্ত থাকার গর্ব লেগে ছিল, যেন বলছে, 'আমি পারি, আরও বহুদিন, বহু বহু দিন, অনন্তকাল আমি না খেয়ে থাকতে পারি। তোমরা পারো না।'

'যা হোক, এটাকে পরিষ্কার কর।' ব্যবসায়ী বললেন, এবং তারা ক্ষুধাশিল্পীকে কবর দিল, সঙ্গে যে খড়কুটোয় সে শুয়ে থাকত, সেগুলোও। খাঁচার ভেতর তারা একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ রাখল। যে খাঁচাটা এতদিন খড়কুটোয় ভর্তি ছিল, সেখানে এই হিংস্র জানোয়ার যেন প্রাণসঞ্চার করল। চিতাবাঘটি খুব ভালভাবেই বেঁচে রইল। প্রতিদিনই তার পছন্দের খাবার দিয়ে তার খাঁচা ভর্তি করতে কর্মীদের কোনও ভুল হত না, একটি দিনের জন্যও তারা চিতাটিকে ভোলেনি; এমনকী চিতাটি তার স্বাধীনতাও হারায়নি; তার রাজকীয় শরীর অপরূপ রঙিন, যেন স্বাধীনতা এই শরীরকে ঘিরেই চলেছে; কখনও তার চোয়ালের ফাঁকে সে স্বাধীনতাকে বয়ে চলত: তার কণ্ঠ চিরে স্বাধীন গর্জন এমন ভাবেই বেরিয়ে আসত, দুর্বল দর্শকের জন্য সেটা সহ্য করা মুশকিল ছিল। তবু দর্শক আসত, খাঁচা ঘিরে দাঁড়িয়ে মাংসাশী-হিংস্র পশুটিকে দেখত, চলে যেতে চাইত না।

মূল: ফ্রানজ্ কাফকা

অনুবাদ: অনিরুদ্ধ

দ্য লাস্ট স্পিন

যে ছেলেটা তার উল্টোদিকে বসে আছে সে তার শত্রু। উল্টোদিকে বসে থাকা ছেলেটার নাম টিগো। সবুজ রঙের একটা সিল্ক জ্যাকেট পরেছে সে, কমলা রঙের ডোরাকাটা হাতা। জ্যাকেটটা ড্যানিকে বলছে টিগো তার শত্রু। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করছে জ্যাকেট, 'শত্রু, শত্রু!'

'এটা একটা দারুণ জিনিস,' টেবিলের ওপরের আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখিয়ে বলল টিগো। 'এটা কিনতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডলার খরচা হয়ে যাবে তোমার। একটা স্টোর থেকে এটা কিনতে চেষ্টা করে দেখো। অনেক টাকা।'

টেবিলের ওপর রাখা আগ্নেয়াস্ত্রটা স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন .৩৮ পুলিস স্পেশাল।

টেবিলের ঠিক মাঝখানে শোভা পাচ্ছে ওটা। নল কেটে দু'ইঞ্চি করায় ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে অস্ত্রটার। বাঁটটা চেককাটা কাঠবাদামের কাঠ দিয়ে বানানো। অস্ত্রটার রং হালকা নীল। তিনটা .৩৮ স্পেশাল গুলি রাখা আছে ওটার পাশে।

অস্ত্রটার দিকে নিস্পৃহ চোখে তাকাল ড্যানি। সে নার্ভাস এবং শঙ্কিত। তবু মুখে তার প্রভাব পড়তে দেয়নি একটুও। নিজের অনুভূতি টিগোর কাছে প্রকাশ করতে চাইছে না সে। টিগো তার শত্রু। তাই টিগোর সামনে মুখোশ পরে বসে আছে। একটা ভুরু

খাড়া করে সে বলল, 'এধরনের জিনিস আগেও দেখেছি। এটার মধ্যে স্পেশাল কিছু নেই।'

'ওটা দিয়ে আমাদের যা করতে হবে তা ছাড়া,' টিগো বলল। বড় বড় বাদামী চোখ দিয়ে তাকে মাপছিল টিগো। চোখ দুটো দেখলে মনে হয় যেন পানি টলটল করছে। দেখতে কুৎসিত নয় টিগো। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, নাকটা হয়তো একটু বেশি লম্বা। তবে তার মুখ আর চিবুক যুৎসই। মুখ আর চিবুকের গড়ন দেখে সহজেই তাকে বিড়াল বলে ডাকা যায়।

'কেন শুরু করছি না আমরা?' জিজ্ঞেস করল ড্যানি। ঠোঁট ভেজাল সে, তাকিয়ে আছে টিগোর দিকে।

'তুমি জানো,' বলল টিগো, 'তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই।'

'আমি জানি।'

'সংঘ এটাই বলেছে। সংঘ এটাই বলেছে কীভাবে আমরা এটার মীমাংসা করব। কিন্তু আমি তোমাকে জানাতে চাই তুমি কোত্থেকে এসেছ তার কিছুই জানি না আমি—শুধু জানি তুমি নীল-সোনালী রঙের একটা জ্যাকেট পরেছ।'

'আর তুমি পরেছ সবুজ-কমলা রঙের,' ড্যানি বলল, 'এবং এটা যথেষ্ট আমার জন্য।'

'নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম...

'সারারাত বসে বসে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি, নাকি ব্যাপারটা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছি?' জানতে চাইল ড্যানি।

'যা আমি বলতে চেষ্টা করছি তা হলো,' কথা চালিয়ে গেল টিগো, 'ঘটনাক্রমে আমাকে এ কাজের জন্য বাছাই করা হয়েছে তা জানো? দুই ক্লাবের ক্যাচাল মিটিয়ে ফেলতে চাইলে আমার মনে হয়, তোমাকে স্বীকার করতে হবে গতকাল রাতে আমাদের

এলাকায় আসা উচিত হয়নি তোমার ছেলেদের।'

'কিছুই স্বীকার করার নেই আমার,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল ড্যানি।

'ভাল, সে যাহোক, ক্যাণ্ডি স্টোরে গুলি করেছে ওরা। কাজটা ঠিক হয়নি। সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চলার কথা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ড্যানি বলল।

'তো আমরা এভাবে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে সম্মত হয়েছি। মানে বলতে চাচ্ছি, আমাদের একজন আর... তোমাদের একজন। ঠিক এভাবেই। রাস্তায় হাঙ্গামা ছাড়া এবং কোন আইনি সমস্যা ছাড়া।'

'চলো এটা মেনে চলি আমরা,' বলল ড্যানি।

'আমি বলতে চাচ্ছি, এ ঘটনার আগে আমি এমনকী রাস্তায়ও কখনও দেখিনি তোমাকে। সুতরাং এটা আমার ব্যক্তিগত কোন বিষয় না। যেভাবেই এটা করে থাকুক না কেন...

'আমিও তোমাকে কখনোই দেখিনি,' বলল ড্যানি।

দীর্ঘক্ষণ তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল টিগো। 'তুমি এখানে নতুন এসেছ তাই। ঠিক কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'ব্রনক্স থেকে এসেছে আমার পরিবারের সদস্যরা।'

'অনেক বড় পরিবার তোমার?'

'একবোন দুই ভাই, ব্যস এই।'

'অ। আমার শুধু একটা বোন আছে।' কাঁধ ঝাঁকাল টিগো। 'ভাল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'সুতরাং,' ফের দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'চলো কাজটা সেরে ফেলি।'

'অপেক্ষা করছি আমি,' ড্যানি বলল।

আগ্নেয়াস্ত্রটা তুলে নিল টিগো, তারপর একটা গুলি তুলে নিল টেবিলের ওপর থেকে। ক্যাচ টিপে সিলিণ্ডার ভাঁজ করে একটা

গর্তে গুলিটা ঢোকাল। তারপর অস্ত্রটা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সিলিণ্ডার ঘোরাল। 'ঘুরে চলেছে সে,' বলল, 'কোথায় সে থামবে কেউ জানে না। ছ'টা চেম্বার আছে সিলিণ্ডারে, গুলি আছে একটা। সিলিণ্ডার ঘোরা থামলে গুলিটা ফায়ারিং পজিশনে চলে আসতে পারে। সিলিণ্ডারটা পাঁচবার ঘোরালে প্রতিবার এ সম্ভাবনা থাকবে। গুলিটা কোথায় আছে পরীক্ষা করে দেখতে চাও?'

'চাই।'

'প্রথমে আমি পরীক্ষা করব,' টিগো বলল।

তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল ড্যানি।

'কেন?'

'তুমি প্রথমে করতে চাও?'

'আমি জানি না।'

'আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি।' দাঁত বের করে হাসল টিগো। 'প্রথম বারেই আমি আমার মাথা উড়িয়ে দিতে পারি।'

'কেন তুমি আমাকে সুযোগ দিচ্ছ?' জানতে চাইল ড্যানি।

কাঁধ ঝাঁকাল টিগো। 'পার্থক্যটা কোথায় তাতে?' সিলিণ্ডারটা দ্রুত ঘুরিয়ে দিল সে।

'রাশানরা এ জিনিস বানিয়েছে?' জানতে চাইল ড্যানি।

'হ্যাঁ।'

'আমি সবসময় বলি ওরা হচ্ছে ক্রেইজি বাস্টার্ডস।'

'হ্যাঁ, আমি সবসময়... কথা বলতে বলতে থেমে গেল টিগো। থেমে গেছে সিলিণ্ডারটা। লম্বা করে নিশ্বাস নিল সে, .৩৮-এর নলটা মাথায় ঠেকাল, তারপর ট্রিগারে চাপ দিল।

খালি চেম্বারে ক্লিক শব্দ তুলল ফায়ারিং পিন।

'ব্যাপারটা সোজা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সে। টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল অস্ত্রটা। 'তোমার পালা, ড্যানি।'

অস্ত্রটার দিকে হাত বাড়াল ড্যানি। বেইসমেণ্ট রুমটা ঠাণ্ডা, কিন্তু ঘামতে শুরু করেছে সে। নিজের দিকে অস্ত্রটা টেনে নিল। তারপর ওটা টেবিলে রেখেই ট্রাউজারে দু'হাতের ভেজা তালু মুছল। আগ্নেয়াস্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'চমৎকার একটা জিনিস,' টিগো বলল। 'ভাল জিনিস পছন্দ করি আমি।'

'হ্যাঁ, আমিও,' ড্যানি বলল। 'কোন কিছু হাতে নিয়ে স্পর্শ করেই তুমি বলে দিতে পারবে জিনিসটা ভাল কিনা।'

বিস্মিত দেখাল টিগোকে। 'গতকালই একজনকে একথা বলেছি আমি। আমাকে মাতাল ভেবেছে সে।'

'অনেক মানুষই ভাল জিনিস চেনে না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ড্যানি।

'ভাবছিলাম,' টিগো বলল, 'যখন বড়ো হব সেনাবাহিনীতে যোগ দেব। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কাজ করতে ভাল লাগবে আমার।'

'আমিও তা ভেবেছি। আমার ওল্ড লেডি অনুমতি দিলে এখনই জয়েন করতাম। এখন আমি জয়েন করতে চাইলে তার সাইন লাগবে।'

'হ্যাঁ, এরা সব একই রকম,' বলল টিগো, হাসছে। 'তোমার ওল্ড লেডি কি এখানে জন্মেছে, নাকি ওল্ড কান্ট্রিতে?'

'ওল্ড কান্ট্রিতে,' জানাল ড্যানি।

'তুমি জানো, তাদের ধ্যান-ধারণাও পুরনো।'

'আমি তা হলে ঘোরাই,' ড্যানি বলল।

'হ্যাঁ,' মত দিল টিগো।

বাঁ হাত দিয়ে সিলিণ্ডারে থাবড়া লাগাল ড্যানি। সিলিণ্ডার ঘুরতে ঘুরতে একসময় স্থির হয়ে গেল। ধীরে ধীরে রিভলভারটা

মাথায় তাক করল ড্যানি। চোখ বন্ধ করতে চাইল সে, কিন্তু সাহসে কুলাল না। তার শত্রু টিগো লক্ষ করছে তাকে। সে-ও স্থির চোখে টিগোর দিকে তাকাল, তারপর ট্রিগারে চাপ দিল।

একটা বিট মিস করল তার হার্ট, তারপর রক্তের গর্জন ছাপিয়ে খালি ক্লিক শব্দটা শুনতে পেল। তড়িঘড়ি করে অস্ত্রটা টেবিলের ওপর রেখে দিল সে।

'একেবারে ঘামিয়ে দিয়েছে তোমাকে, তাই না?' টিগো বলল।

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল ড্যানি। টিগোকে লক্ষ করছে সে। অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে আছে টিগো।

'এবার আমি, না?' টিগো বলল। গভীর শ্বাস টানল সে, তারপর .৩৮টা তুলে নিয়ে সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে দিল। থামার অপেক্ষা করছে। তারপর মাথায় অস্ত্রটা তাক করল।

'ব্যাং!' টিগো বলল, তারপর ট্রিগার চাপল। আবারও খালি চেম্বারে ক্লিক শব্দ তুলল ফায়ারিং পিন। দম ছেড়ে টেবিলে অস্ত্রটা নামিয়ে রাখল টিগো।

'ভেবেছিলাম এবার আমি শেষ,' বলল সে।

'তোমার হার্টবিট শুনতে পাচ্ছিলাম,' ড্যানি বলল।

'ওজন কমানোর দারুণ উপায় এটা, জানো তুমি?' নার্ভাসভাবে হাসল টিগো। তারপর তার হাসি প্রকৃত হাসি হয়ে উঠল যখন সে দেখল ড্যানিও তার সঙ্গে হাসছে। 'সত্যি না এটা? এভাবে তুমি দশ পাউণ্ড ওজন কমাতে পারো।'

'আমার ওল্ড লেডির দেহ ঘরের মত,' হাসতে হাসতে বলল ড্যানি। 'এরকম ডায়েট ওর ট্রাই করা উচিত।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে সে। টিগোও তার হাসিতে যোগ দিলে খুশি হয়ে উঠল।

'এটাই সমস্যা,' বলল টিগো। 'রাস্তায় সুন্দর এক যুবতীকে

দেখে ভাবলে—আহ, কী দারুণ! তারপর তাদের বয়স বাড়তে থাকল আর তারা মোটা হওয়া শুরু করল।' মাথা নাড়ল সে।

'প্রেমিকা আছে তোমার?' জানতে চাইল ড্যানি।

'হ্যাঁ, আছে একটা।'

'নাম কী তার?'

'অ, তুমি চেনো না ওকে।'

'চিনতেও তো পারি,' ড্যানি বলল।

'ওর নাম জুয়ানা।' টিগো লক্ষ করছে তাকে। 'ও প্রায় পাঁচ ফুট দুই, বাদামী চোখ।'

'আমার মনে হয় আমি ওকে চিনি,' বলল ড্যানি। মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে আমি ওকে চিনি।'

'চমৎকার ও, তাই না?' জানতে চাইল টিগো। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, যেন ড্যানির উত্তর তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'হ্যাঁ, ও চমৎকার,' বলল ড্যানি।

'হ্যাঁ। হেই, হয়তো কখনও আমরা...' নিজেকে থামাল টিগো। অস্ত্রটার দিকে তাকাল, তার আকস্মিক উদ্দীপনা পুরোপুরি উবে গেছে বলে মনে হলো। 'এবার তোমার পালা,' বলল সে।

'এবার কিছুই হবে না,' ড্যানি বলল। সিলিণ্ডারটা ঘুরিয়ে দিল সে, শ্বাস টেনে গুলি করল।

খালি ক্লিক শব্দটা বিকট শোনাল নিঃশব্দ কামরায়।

'ম্যান!' ড্যানি বলল।

'আমরা খুব ভাগ্যবান, জানো?' টিগো বলল।

'নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।'

'খালি চেম্বার কমিয়ে দিতে পারি আমরা। ছেলেরা এটা পছন্দ করবে না আমরা যদি...' ফের নিজেকে থামাল সে, তারপর টেবিলের ওপরের একটা গুলির দিকে হাত বাড়াল। ফের

সিলিণ্ডারটা বের করে দু'ভাগ করল, দ্বিতীয় গুলিটা ঢোকাল সিলিণ্ডারে। 'এখন এখানে দুটো গুলি পাচ্ছি আমরা,' বলল সে। 'দুটো গুলি, ছ'টা চেম্বার। তার মানে চারের জন্য দুই। ভাগ করো এটাকে, তা হলে তুমি পাবে দুইয়ে এক।' একটু বিরতি দিল সে। গেইম খেলতে তুমি?'

'এ... এজন্যেই তো আমরা এখানে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক আছে তা হলে।'

'গেছ,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল টিগো। 'সাহস আছে তোমার, ড্যানি।'

'তুমি সেই একজন যার সাহসের প্রয়োজন,' শান্ত কণ্ঠে বলল ড্যানি। 'এবার তোমার ঘোরানোর পালা।'

আগ্নেয়াস্ত্রটা তুলে নিল টিগো। অলস ভঙ্গিতে সিলিণ্ডারটা ঘোরাতে শুরু করল।

'পরের ব্লকটায় থাকো তুমি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ড্যানি।

'হ্যাঁ।' সিলিণ্ডারে এখনও থাবড়া চালাচ্ছে টিগো। মৃদু একটা শব্দ করে ঘুরছে ওটা।

'কী অবাক কাণ্ড, আমার মনে হয় কখনোই আমরা রাস্তায় পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে যাইনি। এমনও হতে পারে এখানে আমি নতুন বলে।'

'হ্যাঁ, তুমি তো আবার একটা ক্লাবের সঙ্গে জড়িত।'

'তোমার ক্লাবের লোকজনকে পছন্দ করো তুমি?' জানতে চাইল ড্যানি, সিলিণ্ডার ঘোরার শব্দ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে ভাবছে এমন একটা বেকুবি প্রশ্ন কেন করছে সে।

'ঠিক আছে ওরা।' কাঁধ ঝাঁকাল টিগো। 'এদের কেউই আসলে পাঠায়নি আমাকে। কিন্তু ক্লাবটা আমার ব্লকে। সুতরাং কী

করার আছে, তোমার, হ্যাঁ?' সিলিণ্ডার থেকে হাত সরিয়ে নিল সে। ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল সিলিণ্ডারের। অস্ত্রটা মাথায় তাক করল সে।

'থামো!' চিৎকার করে উঠল ড্যানি।

হতভম্ব দেখাল টিগোকে। 'কী ব্যাপার?'

'কিছু না। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম... মানে...' ভুরু কোঁচকাল ড্যানি। 'আমার ক্লাবের খুব বেশি লোকের সঙ্গে খাতির নেই আমার।'

মাথা ঝাঁকাল টিগো। এক মুহূর্তের জন্য পরস্পরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল তারা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে গুলি করল টিগো।

খালি ক্লিক শব্দে ভরে উঠল বেইসমেণ্ট রুম।

'ছিঃ! ছিঃ!' টিগো বলল।

'ম্যান, ফের তুমি এটা বলতে পারো।'

টেবিলের ওপর দিয়ে রিভলভারটা ঠেলে দিল টিগো।

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল ড্যানি। অস্ত্রটা তুলতে চাইছে না সে। নিশ্চিত অনুভব করছে দুই গুলির যে কোন একটির পারকাশন ক্যাপে এবার আঘাত করবে ফায়ারিং পিন। সে নিশ্চিত এবার ঠিক ঠিক নিজেকে গুলি করবে।

'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি টার্কি পাখি,' টিগোকে বলল সে, ভাবনা কণ্ঠস্বরে রূপান্তরিত হওয়ায় বিস্মিত।

'মাঝে মাঝে আমিও এভাবে অনুভব করি,' টিগো বলল।

'একথা আমি কখনও কাউকে বলিনি,' ড্যানি বলল। 'ক্লাবের লোকদের কখনও বললে তারা হাসাহাসি করবে আমাকে নিয়ে।'

'কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা নিজের ভেতর রেখে দিতে হয়।

পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।'

'বিশ্বাস করতে পারো এমন কেউ থাকা উচিত?' ড্যানি বলল। 'যত্তো সব, তোমার লোকজনকে তুমি কিছুই বলতে পারবে না। তারা বুঝবে না।'

হাসল টিগো। 'এটা একটা পুরনো গল্প। কিন্তু ঘটনা এরকমই। কী করতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে এখনও আমার মনে হয় আমি টার্কি পাখি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' টিগো বলল। 'শুধু এটাই না যদিও। মাঝে মাঝে এমনও হয়... ওয়েল, রাস্তায় কাউকে তুমি প্যাঁদালে পরে অবাক লাগে না তোমার? যেমন... বুঝতে পারছ কী বলতে চাচ্ছি? যেমন... লোকটা তোমার কে? কী কারণে তুমি তাকে মারছ? কারণ সে কারও মেয়ের সঙ্গে লটর পটর করে কেটে পড়েছে? মাথা ঝাঁকাল টিগো। 'মাঝে মাঝে জটিল হয়ে পড়ে ব্যাপারটা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...' ফের ভুরু কোঁচকাল ড্যানি। 'ক্লাবের সঙ্গে লেগে থাকতেই হবে তোমাকে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই... কোন সন্দেহ নেই।' ফের পরস্পরের চোখে চোখ আটকে রইল তাদের।

'ওয়েল, এই যে শুরু করছি,' ড্যানি বলল। অস্ত্রটা তুলে নিল সে। 'এটা ঠিক...' মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে দিল। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় নেমে গেল সিলিণ্ডার। অস্ত্রটা পরীক্ষা করছে সে। ট্রিগারে চাপ দিলে নল দিয়ে গুলি দুটোর একটা বেরিয়ে আসবে কিনা ভাবছে।

তারপর গুলি করল সে।

ক্লিক।

'ভাবিনি তুমি এভাবে চালিয়ে যাবে,' বলল টিগো।

'আমিও ভাবিনি।'

'তোমার সাহস আছে, ড্যানি,' বলল টিগো। অস্ত্রটার দিকে তাকাল। ওটা তুলে নিয়ে আবার খুলল সিলিণ্ডার।

'কী করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল ড্যানি।

'আরেকটা গুলি,' টিগো বলল।' 'ছয় চেম্বার তিন গুলি। তিন দু'গুণে ছয়। খেলবে তুমি?'

'তুমি?'

'ছেলেরা বলেছে... নেমে গেল টিগো। 'হ্যাঁ, খেলব আমি,' যোগ করল সে, তার কণ্ঠস্বর কৌতূহল জাগায় এমন নিচু।

'এবার তোমার পালা, তুমি জানো।'

'আমি জানি,' টিগোকে আগ্নেয়াস্ত্রটা নাড়াচাড়া করতে দেখল ড্যানি।

'লেকে কখনও নৌকা বেয়েছ তুমি?'

টেবিলের উপর দিয়ে ড্যানির দিকে তাকাল টিগো, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সে। 'একবার,' বলল সে। 'জুয়ানার সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

'মজা... মজা আছে এতে, কোনও?'

'হ্যাঁ।' হ্যাঁ, দারুণ মজা। বলতে চাচ্ছে তুমি কখনও এভাবে নৌকা চালাওনি?'

'না,' ড্যানি বলল।

'হেই, তোমার চেষ্টা করা উচিত, ম্যান,' উত্তেজিত ভাবে বলল টিগো। 'তবে ভাল লাগবে তোমার। হেই, চেষ্টা করবে তুমি।'

'হ্যাঁ, ভাবছিলাম হয়তো এই রোববারে আমি...' বাক্যটা শেষ করল না সে।

'আমার ঘোরাবার পালা,' ক্লান্ত ভাবে বলল টিগো। সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে দিল সে। 'ভাল একজন মানুষ মারা যাচ্ছে,' বলল সে। রিভলভারটা মাথায় ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল।

ক্লিক।

নার্ভাসভাবে হাসল ড্যানি। 'কোন বিরাম নেই,' বলল সে। 'কিন্তু যিশুর কিরে, সাহস আছে তোমার। জানি না আমি আর এভাবে চালাতে পারব কি না।'

'নিশ্চয়ই তুমি পারবে,' টিগো আশ্বস্ত করল তাকে। 'শোনো, ভয় পাবার কী আছে এতে?' আগ্নেয়াস্ত্রটা টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল সে।

'সারারাত ধরে কি আমরা এ-ই করে যাব?' জিজ্ঞেস করল ড্যানি।

'ওরা বলেছে... তুমি জানো...'

'ওয়েল, এটা এত খারাপ না। বলতে চাচ্ছি আমাদের এই অপারেশন ছিল না। কথা বলার একটা সুযোগও পাব না আমরা, হ্যাঁ?' মৃদু হাসল সে।

'হ্যাঁ,' টিগো বলল, চওড়া হাসিতে ভরে আছে তার মুখ। 'এটা এত খারাপ না, না?'

'না, এটা... ওয়েল, তুমি জানো, ক্লাবের লোকগুলোর সঙ্গে কে তর্ক করতে পারে?'

অস্ত্রটা তুলে নিল সে।

'আমরা পারি...' শুরু করল টিগো।

'কী?'

'আমরা বলতে পারি... ধরো আমরা গুলি করা চালিয়ে যেতে লাগলাম কিন্তু কিছুই ঘটল না, সুতরাং...' কাঁধ ঝাঁকাল টিগো। 'যত্তোসব! সারারাত ধরে আমরা এভাবে চালিয়ে যেতে পারি না,

পারি আমরা?'

'আমি জানি না।'

'চলো এবার শেষ বারের মত ঘোরানো হোক। শোনো, ওরা এটা পছন্দ করবে না। হঠাৎ হাজির হতে পারে ওরা, জানো?'

'আমার মনে হয় না ওরা এটা পছন্দ করবে। ক্লাবের জন্য আমাদের দুজনের এভাবে মীমাংসা করার কথা।'

'খ্যাতা পোড়ো ক্লাবের!' বলল টিগো। 'আমরা কী পরস্পরের...' পরের শব্দগুলো মুখ দিয়ে বের হওয়া কঠিন মনে হলো। যখন বের হলো, তার চোখ ড্যানির মুখ থেকে সরল না। 'বন্ধু হয়ে যেতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই পারি আমরা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ড্যানি। 'নিশ্চয়ই পারি আমরা! কেন নয়?'

'শেষ বারের মত ঘোরাও,' টিগো বলল। 'এসো, দ্য লাস্ট স্পিন।'

'বাদ দাও,' বলল ড্যানি। 'হেই, তুমি জানো, ওরা এই বুদ্ধি বের করায় আমি খুশি। তুমি জানো এটা? সত্যিই আমি খুশি!' সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে দিল সে। 'শোনো, এ রোববারে কি তুমি লেকে যেতে চাও? মানে তোমার এবং আমার বান্ধবীসহ? দুটো নৌকা নিতে পারি আমরা। অবশ্য তুমি চাইলে একটাও নেয়া যায়।'

'হ্যাঁ, একটা নৌকা,' বলল টিগো। 'হেই, জুয়ানাকে পছন্দ করবে তোমার বান্ধবী। কল্যবেই। প্রথম শ্রেণীর জিনিস ও।'

থেমে গেল সিলিণ্ডার। অস্ত্রটা দ্রুত মাথায় ঠেকাল ড্যানি।

'রোববারকে উৎসর্গ করে এবার,' বলল সে। টিগোর দিকে তাকিয়ে হাসল, হাসিটা ফিরিয়ে দিল টিগো। এরপর গুলি করল

সে।

ছোট বেইসমেন্ট রুম কাঁপিয়ে দিল বিস্ফোরণটা, উড়িয়ে নিয়ে গেল ড্যানির মাথার অর্ধেকটা, মুখ ছিন্নভিন্ন। মৃদু একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল টিগোর গলা চিরে, তার দু'চোখে আশ্চর্য বেদনামাখা এক দৃষ্টি। তারপর সে টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করল।

মূলঃ ইভান হান্টার

রূপান্তরঃ হাসান মোস্তাফিজুর রহমান

বাজি

এক

সানফ্রান্সিসকোর নর্থ বীচ অঞ্চলের পরিত্যক্ত এক বাড়ির ওপরতলার একটা ঘরে চাদরে ঢেকে শোয়ানো আছে একজন মানুষের লাশ। রাত প্রায় ন'টা বাজে, ঘরটায় ক্ষীণ আলো ছড়াচ্ছে একটা মাত্র মোমবাতি। লাশ রাখা ঘরে সাধারণত প্রচুর আলো আর বাতাসের ব্যবস্থা রাখা হয়, কিন্তু দুটো জানালাই বন্ধ আর খড়খড়ি নামানো থাকায় এই ঘরের আবহাওয়া গরম। ঘরটায় তিনটে মাত্র আসবাব—একটা আর্মচেয়ার, ছোট্ট একটা রীডিং-স্ট্যাণ্ড, যার ওপরে মোমবাতিটা রাখা আছে, আর লম্বা একটা কিচেন-টেবিল, যার ওপরে শোয়ানো আছে লাশটা। যে-কেউ এখানে থাকলে লক্ষ করত যে আসবাব তিনটে আর লাশটাকে এখানে খুব বেশি আগে আনা হয়নি, কারণ, ওই ক'টা জিনিস ছাড়া সারা ঘরে ধুলোর পুরু স্তর, দেয়ালের কোণ থেকে ঝুলছে মাকড়সার জাল। ঘরটা বাড়ির পিছনের দিকে, ওটার পিছন থেকেই উঠে গেছে খাড়া পাথুরে দেয়াল। বাড়িটাকে তৈরি করা হয়েছে পাহাড়ের গায়ে।

পাশের কোনও গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজল। এমনই অলস, গতানুগতিক সেই শব্দ শুনে যে কারও এ-কথা মনে

হওয়া বিচিত্র নয় যে ঘণ্টা পেটানোর ঝামেলা ঘড়িটা না পোহালেও পারে। ঘরটার একমাত্র দরজা খুলে প্রবেশ করল একজন লোক, এগিয়ে গেল লাশটার দিকে। পেছনে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজা, বাইরে থেকে ভেসে এল তালা লাগানোর শব্দ। এরপর প্যাসেজ ধরে ফিরে যাওয়া পদশব্দে মনে হলো, লোকটা যেন বন্দি। টেবিলের কাছে গিয়ে লাশটাকে দেখল সে কিছুক্ষণ, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালার কাছে গিয়ে তুলে দিল খড়খড়ি। বাইরে নেমে এসেছে গাঢ় অন্ধকার, জানালার কাচগুলো ঢাকা পড়ে গেছে ধুলোর নীচে। কাচ পরিষ্কার করতে সে দেখল, লোহার গরাদ দিয়ে জানালাটা বন্ধ করা। অন্য জানালাটা পরীক্ষা করল সে। একই অবস্থা। ঘর পর্যবেক্ষণ শেষ করে, আর্মচেয়ারে গিয়ে বসে, পকেট থেকে একটা বই বের করল সে, তারপর মোমবাতিসহ রীডিং-স্ট্যাণ্ডটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

লোকটার বয়েস ত্রিশের বেশি নয়, গায়ের রঙ গাঢ়, নিখুঁতভাবে শেভ করা মুখ, মাথায় বাদামী চুল। তার মুখের গড়ন পাতলা, খাড়া নাক, চওড়া কপাল, শক্ত চোয়ালে জেদের চিহ্ন। ধূসর, অবিচল চোখ, নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া সেগুলো বেশি নড়াচড়া করে না। এই মুহূর্তে তার দৃষ্টি বেশির ভাগই স্থির হয়ে রয়েছে হাতে ধরা বইয়ে, কেবল মাঝে মাঝে সেটা চলে যাচ্ছে টেবিলে শোয়ানো লাশটার ওপর। এরকম পরিবেশে দুঃসাহসী মানুষও নানারকম কল্পনা করে, কিন্তু তার মধ্যে সেরকম কোনও লক্ষণ নেই। সে যেন তাকাচ্ছে পড়তে পড়তে হঠাৎ করে লাশটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বলে।

আধ ঘণ্টা মত পড়ার পর, সম্ভবত একটা অধ্যায় শেষ করে, বইটা নামিয়ে রাখল সে। তারপর মেঝে থেকে রীডিং-স্ট্যাণ্ডটা তুলে, সেটাকে নিয়ে গেল ঘরের কোণের একটা জানালার কাছে,

তারপর সেখান থেকে মোমবাতিটা উঠিয়ে নিয়ে, ফিরে এল তার বসার জায়গায়, শূন্য ফায়ারপ্লেসের সামনে।

মিনিটখানেক পর টেবিলের কাছে গিয়ে, লাশটার মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে দিল সে। পাতলা একটা কাপড়ে লাশের মুখ ঢাকা, মাথা ভরা কালো চুল। গম্ভীর মুখে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার নিশ্চল সঙ্গীটির দিকে, তারপর চাদরটা নামিয়ে দিয়ে, চেয়ারের কাছে ফিরে এসে, মোমবাতিদান থেকে দেশলাই নিয়ে, স্যাককোটের পাশের পকেটে রেখে বসে পড়ল। তারপর সকেট থেকে মোমবাতিটা তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগে সে যেন পরীক্ষা করল, ওটা আর কতক্ষণ টিকবে। ইঞ্চি দুই লম্বা ছিল মোমবাতিটা; ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এই ঘরে নেমে আসবে অন্ধকার। মোমবাতিদানে আবার মোমবাতিটাকে বসিয়ে নিভিয়ে দিল সে এক ফুঁয়ে।

দুই

কেয়ারনি স্ট্রীটের এক ডাক্তারের অফিসে টেবিল ঘিরে তিনজন লোক বসে মদ্য পান ও ধূমপান করছিল। সময় প্রায় মাঝরাত। তিনজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ডা. হেলবারসন, এই পানের আয়োজন করেছে; তার ঘরেই বসেছে আসর। ডা. হেলবারসনের বয়েস ত্রিশ ছুঁইছুঁই; অন্য দু'জন আরও কমবয়েসী; সবাই ডাক্তার।

'মৃতকে দেখে মানুষের যে-কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্ক,' বলল ডা. হেলবারসন, 'সেটা বংশগত এবং সংশোধনের অসাধ্য। এ নিয়ে

লজ্জা পাবার কিছু নেই, এটা অনেকটা জন্মগতভাবে অঙ্কে কাঁচা কিংবা মিথ্যে বলার প্রবণতার মত।'

অন্য-দু'জন হেসে উঠল। 'মিথ্যেবাদী হলেও একজন মানুষের লজ্জা পাবার কিছু নেই?' বলল সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি, যে আসলে মেডিকেলের ছাত্র, এখনও ডাক্তার হয়নি।

'প্রিয় হারপার, আমি ঠিক তা বলিনি। মিথ্যে কথা বলার প্রবণতা এক কথা, মিথ্যে বলা আরেক।'

'কিন্তু আপনি কী মনে করেন,' বলল তৃতীয়জন, 'এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুভূতি, মৃতকে দেখে আতঙ্ক, একটা সার্বজনীন ব্যাপার? আমার কিন্তু এরকম কখনও মনে হয়নি।'

'এই আতঙ্ক—তোমার দৈহিক গঠনতন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে,' জবাব দিল হেলবারসন। 'প্রয়োজন কেবল উপযুক্ত পরিবেশ—শেক্‌স্‌পীয়র যাকে বলেছেন "কনফেডারেট সীজন" উপযুক্ত পরিবেশ পেলে লুকানো আতঙ্ক প্রকাশিত হয়ে তোমাকে অবাক করে দেবে। অবশ্য অন্যান্য মানুষের চেয়ে ডাক্তার আর সৈন্যেরা এই আতঙ্কের হাত থেকে অনেকটা মুক্ত।'

'ডাক্তার আর সৈন্য—এর সঙ্গে জল্লাদ আর মুণ্ড শিকারীদের যোগ করলেন না কেন? শ্রেণীতে সব ঘাতকেরাই অন্তর্ভুক্ত হোক।'

'না, প্রিয় মানচার, জুরিরা সরকারি ঘাতকদের ঘাতক বলে মেনে নেবে না, যদিও মৃত্যু কার্যকরী করার সময় ওরাই সবচেয়ে অবিচল থাকে।'

সাইডবোর্ড থেকে একটা চুরুট নিয়ে আবার এসে বসল হারপার। 'উপযুক্ত পরিবেশ বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?'

'যদি কাউকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় একটা লাশের সঙ্গে—একা, পরিত্যক্ত কোনও বাড়ির অন্ধকার একটা ঘরে, সারা

রাত ওভাবে থাকার পরেও সে যদি পাগল না হয়ে যায়, তা হলে তাকে অসমসাহসী বলতে হবে।'

'আমার মনে হয় আপনর শর্তের কোনও শেষ হবে না,' বলল হারপার; 'কিন্তু আমি একজন মানুষকে চিনি যে ডাক্তারও নয় সৈন্যও নয়, তবু আপনার সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে যে-কোনও অঙ্কের বাজি ধরতে প্রস্তুত।'

'সেই মানুষটা কে?'

'তার নাম জ্যারেট—ক্যালিফোর্নিয়ায় নতুন; বাড়ি নিউ ইয়র্কে, আমাদেরই শহরে। আমি অবশ্য টাকা দিতে পারব না, তবে বাজি ধরার কথা শুনলে সে নিজেই বোঝা বোঝা টাকা জোগাড় করবে।'

'তুমি কীভাবে জানলে?'

'সে বরং অনাহারে থাকতে রাজি, কিন্তু বাজি না ধরে থাকতে রাজি নয়। মুশকিল হলো, আতঙ্কিত হবার মত কিছু আছে বলে সে বিশ্বাসই করে না।'

'সে দেখতে কেমন?' আগ্রহী হয়ে উঠল হেলবারসন।

'মানচারের মত, দেখলে মনে হবে তার যমজ ভাই।'

'আমি বাজি ধরতে প্রস্তুত,' ঝটপট বলল হেলবারসন।

'আমিও কি এই বাজিতে যোগ দিতে পারি?' বলল মানচার।

'আমার বিপক্ষে নয়,' বলল হেলবারসন। 'আমি তোমার টাকা চাই না।'

'বেশ,' বলল মানচার; 'তা হলে আমি হবো লাশ।' অন্য দু'জন হেসে উঠল।

এই অদ্ভুত কথাবার্তার ফল কী হয়েছে, সেটা আমরা আগেই দেখেছি।

তিন

মোমবাতিটাকে জ্যারেট নিবিয়ে দিল অচিন্তিতপূর্ব কোনও প্রয়োজনের কথা ভেবে। হয়তো সে এ-কথাও ভাবল যে দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়, এই সামান্য আলোটুকুও তখন স্বস্তি জোগাবে। তা ছাড়া, অন্তত ঘড়ি দেখতেও তো আলোর প্রয়োজন।

নেবানো মোবাতিটা মেঝের ওপর রেখে, পাশেই আর্মচেয়ারে বসে পড়ল সে। আরাম করে হেলান দিয়ে, চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগল ঘুমের জন্যে। কিন্তু ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে, ফলে ঘুমের চেষ্টা বাদ দিল। ভাবতে লাগল, সময় কাটাবে কীভাবে। হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়াবে গাঢ় অন্ধকারে? কিন্তু এতে লাশের সঙ্গে ধাক্কা খাবার সমূহ সম্ভাবনা। জ্যারেট বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর একজন মানুষের শান্তিতে থাকার অধিকার আছে। তাই না উঠে বসেই রইল সে।

সময় কাটাবার চিন্তা করতে করতেই তার মনে হলো, ক্ষীণ একটা শব্দ যেন ভেসে এল টেবিলের দিক থেকে। শব্দটা কেমন ধরনের ঠিক বুঝতে পারল না। মাথা ঘোরাল না সে, অন্ধকারে মাথা ঘোরালেও কিছু দেখতে পাওয়া যায় না; তবে কান পেতে রইল, অন্ধকারে শুনতে কোনও অসুবিধে নেই। মাথা ঘুরতে লাগল তার, দু'হাতে চেপে ধরল চেয়ারের হাতল। কানের ভিতরে ভোঁ ভোঁ করতে লাগল; মাথাটা মনে হলো ফেটে যাবে; জামা যেন বুকে সেঁটে গিয়ে বন্ধ করে দিতে চাইল দম। অবাক হয়ে ভাবল,

এরকম হচ্ছে কেন, আতঙ্কের একটা অনুভূতি যেন জেগে উঠতে চাইছে ভিতর থেকে। হঠাৎ করেই মাথা ঘোরা ছেড়ে গেল, স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাস। উঠে লাথি দিয়ে চেয়ারটাকে সরিয়ে দিল, বড় বড় ধাপে এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। কিন্তু অন্ধকারে বেশিক্ষণ বড় বড় ধাপ ফেলা যায় না; সে হাতড়াতে লাগল, হাতড়াতে হাতড়াতে দেয়াল পেয়ে, কোনাকুনিভাবে এগিয়ে, জানালা দুটো পেরিয়ে ঘরের আরেক কোনায় আসতেই জোর সংঘর্ষ হলো, উল্টিয়ে ফেলে দিল রিডিং-স্ট্যাণ্ডটা। ঝন ঝন করে বিকট শব্দ চমকে তুলল তাকে। বিরক্ত হয়ে জ্যারেট ভাবল, ওটার অবস্থান সে ভুলে গেল কীভাবে! হাতড়াতে হাতড়াতে এবার এল ফায়ারপ্লেসের কাছে। মেঝেতে মোমবাতিটা খুঁজতে খুঁজতে বিড় বিড় করে বলল, 'ওটাকে তুলে রাখতে হবে।'

মোমবাতিটা পেতেই জ্বালল সে, আর তৎক্ষণাৎ তাকাল টেবিলের দিকে। সেখানে কোনও পরিবর্তনের চিহ্ন নেই। রিডিং-স্ট্যাণ্ডটা পড়েই লইল মেঝেতে, ওটাকে তুলে রাখার কথা ভুলে গেল জ্যারেট। ঘরের চারদিকে তাকাল, তারপর দরজার কাছে গিয়ে পাক দিল নবে। ঘুরল না নব। এতে খুশি হয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে আরও শক্ত করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ফিরে এসে চেয়ারে বসে ঘড়ি দেখল; সাড়ে ন'টা বাজে। অবাক হয়ে ঘড়িটা তুলে কানে লাগাল। ঘড়ি বন্ধ হয়নি। মোমবাতিটা আরও ছাট হয়ে গেছে। আবার ওটাকে নিভিয়ে সে নামিয়ে রাখল মেঝের ওপর।

স্বস্তি আর ফিরে এল না জ্যারেটের মনে। 'এখানে ভয় পাবার কী এমন আছে?' ভাবল সে। 'একটা লাশকে ভয় পাবার কোনও মানে হয়? না, এতবড় বোকা হতে আমি রাজি নই।' না, এতবড় বোকা হতে আমি রাজি নই।' কিন্তু 'আমি সাহসী হব' বললেই

সাহস ফিরে আসে না। অযথা ভয় পাবার জন্যে যতই নিজেকে দোষ দিতে লাগল, ততই বাড়ল যুক্তির সংখ্যা। যতই ভাবল যে মানুষের ক্ষতি করার কোনও শক্তিই নেই নিশ্চল একটা লাশের, ততই না কমে আতঙ্ক আরও বাড়ল। 'না'! মানসিক যন্ত্রণায় শেষমেশ চিৎকার করে উঠল সে। 'কোনওরকম কুসংস্কার নেই আমার! অমরত্বে আমার বিশ্বাস নেই! মৃত্যুর পরবর্তী জীবন একটা স্বপ্নকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আমি বাজিতে হারতে পারি না! মৃতুকে নিয়ে যুক্তি খাড়া করার কোনও অর্থ হয় না! তবে হয়তো আমার মনে যুক্তি এসেছে এজন্যে যে, আমার গুহাবাসী পূর্বপুরুষেরা বিশ্বাস করত, মৃতেরা রাতে হেঁটে বেড়ায়; হয়তো—' থেমে কান পাতল। হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই। হালকা, নরম একটা পদশব্দ পিছনে; একটা উদ্দেশ্য নিয়ে শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে কাছে, আরও কাছে।

চার

পরদিন ভোরের আলো ফোটার ঠিক আগে আগে ডা. হেলবারসন আর হারপার আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল নর্থ বীচের রাস্তা ধরে।

'তোমার কী মনে হয়,' বলল হেলবারসন, 'তোমার বন্ধুর দুঃসাহস এখনও অটুট আছে? তোমার কি মনে হয় আমি বাজিতে হেরে গেছি?'

'হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছে,' জোরের সঙ্গে বলল হারপার।

'সত্যি বলছি, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

কয়েকটা মিনিট কাটল নীরবতায়।

'হারপার,' গম্ভীর মুখে বলল হেলবারসন, 'আমার কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। তোমার বন্ধুটির সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছি, সে বড় সহজ পাত্র নয়—আবার বলে কিনা, লাশটা কোনও ডাক্তারের হলেই ভাল হয়। যদি কিছু ঘটে, তা হলে আমরা কিন্তু শেষ।'

'কী ঘটবে? যদি ঘটনা সত্যিই খারাপের দিকে মোড় নেয়—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই—মানচার স্রেফ উঠে বসে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলবে। ব্যস, ঝামেলা শেষ। ডিসেকটিং-রুমের সত্যিকার কোন লাশ হলে আলাদা কথা ছিল।'

বলা বাহুল্য, কথামত ডা. মানচার লাশ সেজেছিল।

ডা. হেলবারসন আবার চুপ করল। গাড়ি শামুকের গতিতে একেক রাস্তায় দু'তিন বার করে যেতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে হেলবারসন বলল, 'আশা করি মানচার যদি উঠে বসতেই বাধ্য হয়ে থাকে, কাজটা সে করেছে সতর্কতার সঙ্গে। এ-ব্যাপারে সে যদি কোনও ভুল করে, তা হলে ভাল না হয়ে ঘটনা আরও খারাপ হতে পারে।'

'হ্যাঁ,' বলল হারপার, 'জ্যারেট ওকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু'—গ্যাস-বাতির আলোয় ঘড়ি দেখল সে—প্রায় চারটে বাজে।'

একটু পরেই গাড়ি থেকে নেমে পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে এগোতে লাগল দু'জনে। বাড়িটার কাছাকাছি যেতেই দৌড়াতে দৌড়াতে একজন লোক এসে থামল তদের পাশে। 'ডাক্তার পাব কোথায় বলতে পারেন?'

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল হেলবারসন।

'গিয়ে নিজেই দেখুন না,' আবার দৌড়াতে লাগল লোকটা।

গতি বাড়াল তারা। বাড়িটাতে পৌঁছে দেখল, অনেক লোক ছুটে ভিতরে ঢুকছে, তাদের চোখে-মুখে উত্তেজনা। আশপাশের বাড়ির জানালাগুলোতেও গিজগিজ করছে লোকের মাথা। সবাই প্রশ্ন করছে, অন্যের প্রশ্ন শুনছে না। কোনও কোনও জানালার খড়খড়ি নামানো, ভিতরে আলো জ্বলছে: ওই ঘরগুলোর বাসিন্দারা তৈরি হলো এখানে আসার জন্যে। হেলবারসনের বাহু ধরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে হারপার, মুখ তার মড়ার মত ফ্যাকাসে। 'ঘটনা খুব খারাপ মনে হচ্ছে, এখানে গেলে ফেঁসে যাব আমরা। তার চেয়ে পালিয়ে যাই চলুন।'

'আমি একজন ডাক্তার,' বলল হেলবারসন ঠাণ্ডা স্বরে, 'ওখানে হয়তো একজন ডাক্তারের প্রয়োজন।'

রাস্তার বাতির আলো এসে পড়েছে খোলা দরজার মুখের প্যাসেজের ওপর। প্যাসেজে লোক গিজগিজ করছে। কেউ কেউ ভিতরে ঢুকতে পেরেছে, যারা পারেনি তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। একসঙ্গে কথা বলছে সবাই, কিন্তু শুনছে না কেউই। হঠাৎ একটা ভীষণ হৈচৈ শুরু হলো সিঁড়ির মাথায়। একটা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল একজন লোক, নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। যারা তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল তাদের কাউকে সে ধাক্কা দিল, কাউকে ঘুসি মারল, ঠেসে ধরল কাউকে দেয়ালের সঙ্গে, কারও গলা টিপে ধরল, পড়ে গেলে মাড়িয়ে গেল নির্দয়ভাবে। লোকটার কাপড় আলুথালু, মাথায় হ্যাট নেই। চোখে অস্থির, বন্য দৃষ্টি, শরীরে আসুরিক শক্তি। মসৃণভাবে শেভ করা মুখ রক্তশূন্য, মাথার চুল বরফের মত সাদা।

সিঁড়ির নীচের লোকজন যে যেদিকে পারল সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিল। লাফিয়ে সামনে এসে হারপার চেঁচাল,

'জ্যারেট! জ্যারেট!'

কলার ধরে হারপারকে পিছনে সরিয়ে আনল ডা. হেলবারসন। কয়েক মুহূর্ত লোকটা এমনভাবে তাকিয়ে রইল দু'জনের দিকে যেন জীবনেও তাদের দেখেনি, তারপর লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে এক দৌড়ে উধাও হয়ে গেল। শক্তসমর্থ একজন পুলিশ এতক্ষণ চেষ্টা করেও ভিতরে ঢুকতে পারেনি, ছুটে গেল সে লোকটাকে তাড়া করে, জানালায় মাথা বের করে রাখা মহিলা আর শিশুরা চিৎকার করে তাকে উৎসাহ জোগাতে লাগল।

সিঁড়ি এখন অনেকটা ফাঁকা, বেশির ভাগ লোক রাস্তায় নেমে এসেছে পালানো আর তাড়া করা দেখতে। এই সুযোগে হেলবারসন ওপরে উঠে গেল, পেছনে পেছনে হারপার। প্যাসেজের মুখে একজন পুলিশ অফিসার বাধা দিল তাদের। হেলবারসন বলল, 'আমরা ডাক্তার।' অফিসার সরে গেল সামনে থেকে। ঘরভর্তি মানুষ, সবাই টেবিলটাকে ঘিরে। দু'জনে ধীরে ধীরে এগিয়ে সামনের লোকগুলোর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা লোক, কোমরের নীচের অংশ চাদর দিয়ে ঢাকা। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পুলিশের হাতে ধরা বুল'স-আই লণ্ঠনের আলোয় টেবিলটা চমৎকারভাবে আলোকিত। এ ছাড়া মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারসহ কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে, বাদবাকিরা অন্ধকারে। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা লোকটার মুখ হলুদ, বীভৎস, ভয়ঙ্কর। ওপরদিকে ওল্টানো চোখ সামান্য খোলা, চোয়াল ঝুলে পড়েছে; ফেনা গড়িয়ে নোংরা হয়ে আছে ঠোঁট, চিবুক আর গাল। লম্বা একটা লোক, নিঃসন্দেহে ডাক্তার, ঝুঁকে পড়ে তার হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে জামার ভিতরে। একটু পর হাত বের করে নিয়ে সে দুটো আঙুল ঢোকাল লোকটার মুখে। 'এই লোক প্রায় দু'ঘণ্টা আগে মারা গেছে,'

অবশেষে বলল সে। 'এটা এখনও করোনারের কেস।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে অফিসারের হাতে দিয়ে, পা বাড়াল সে দরজার দিকে।

'ঘর ফাঁকা করুন—বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান সবাই' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে, পুলিশ কনস্টেবলের হাত থেকে বুল'স-আই লণ্ঠনটা নিয়ে সবার মুখে আলো ফেলতে লাগল অফিসার। হঠাৎ এই কাণ্ডে দারুণ প্রতিক্রিয়া হলো। তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় পাগলের মত ছুটতে লাগল লোকজন। একজন আরেকজনের সঙ্গে ধাক্কা খেলো, কে কোথায় ছিটকে পড়ল। কিন্তু এই আতঙ্ক সত্ত্বেও নির্দয়ভাবে সবার মুখে আলোর ঝাটা মারা অব্যাহত রাখল অফিসার। ছুটন্ত লোকের ধাক্কায় ধাক্কায় ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, নীচের রাস্তায় এসে পড়ল হেলবারসন আর হারপার।

'হায় ঈশ্বর! আমি আপনাকে বলিনি যে জ্যারেট ওকে হত্যা করতে পারে?' লোকজনের ভিড় ছেড়ে ফাঁকায় আসতেই বলল হারপার।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হেলবারসন।

নীরবে হেঁটে চলল তারা, ব্লকের পর ব্লক। ধূসর হয়ে আসা পুবাকাশের নীচে দেখা যেতে লাগল পাহাড়ীদের ছায়া। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দুধের ওয়াগন; শিগ্‌গিরই বেরিয়ে আসবে রুটিঅলারা; আর ইতিমধ্যেই দূরদূরান্তে চলে গেছে সংবাদপত্রের গাড়ি।

'মনে হচ্ছে,' বলল হেলবারসন, 'ভোরের বাতাসে খুব বেশি হাঁটাহাঁটি করেছি আমি আর তুমি। এটা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর; আবহাওয়া পরিবর্তন করা দরকার। ইউরোপ ভ্রমণে গেলে কেমন হয়?'

'কখন?'

'ঠিক জানি না। আজ বিকেল চারটেয় গেলে মনে হয় খুব দেরি হবে না।'

'যথাসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হবে জাহাজে,' বলল হারপার।

পাঁচ

সাত বছর পর এই দু'জন লোককে আবার দেখা গেল নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে। একটা বেঞ্চে বসে গল্পগুজব করছিল তারা। আরেকজন লোক তাদের অজান্তে খানিকটা দূর থেকে শুনছিল সেই গল্প। কিছুক্ষণ পর লোকটা উঠে তাদের কাছে গিয়ে, বরফের মত সাদা চুলে ভরা মাথা থেকে হ্যাট খুলে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমার ধারণা, লাশের ভান করে থাকা কোনও লোক ঘটনাচক্রে কাউকে হত্যা করতে বাধ্য হলে, মৃত লোকের সঙ্গে পোশাক বদলাবদলি করে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল হেলবারসন আর হারপার। দু'জনেই বেশ অবাক হয়েছে। অবশেষে অপরিচিত লোকটার দিকে নরম চোখে তাকিয়ে হেলবারসন জবাব দিল, 'আমার পরিকল্পনা বরাবর এরকমই ছিল। আপনার ধারণার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ...'

হঠাৎ থেমে গেল হেলবারসন, মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাসে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল সে লোকটার দিকে; সারা শরীর থরথর করে

কাঁপছে।

'আরে ডাক্তার!' বলল লোকটা, 'আপনি তো দেখছি অসুস্থ। নিজের চিকিৎসা যদি করতে না পারেন, ডা. হারপার মনে হয় আপনাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।'

'লোক আপনি সুবিধের নন, আসলে আপনি কে বলুন্ তো?' সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল হারপার।

আরও কাছে এসে, তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ফিসফিস করে লোকটা বলল, 'নিজেকে আমি মাঝেমাঝে জ্যারেট নামে পরিচয় দিই, কিন্তু পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে আপনাদের কাছে আসল পরিচয় দিতে আপত্তি নেই আমার। আমি ডা. উইলিয়াম মান্‌চার।'

বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল দু'জনেই। 'মান্‌চার!' চেঁচাল তারা সমস্বরে; তারপর হেলবারসন বলল, 'হায় ঈশ্বর, এ কি সত্য!'

'হ্যাঁ,' অদ্ভুতভাবে হাসল লোকটা, 'নিঃসন্দেহে।' থেমে কী যেন একটা মনে করার চেষ্টা করল সে, তারপর গুনগুন করে গাইতে লাগল জনপ্রিয় একটা গান।

'শোনো, মান্‌চার,' বলল হেলবারসন, 'আমাদের বলো দেখি, কী ঘটেছিল সেরাতে—জ্যারেটের।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জ্যারেট,' বলল সে। 'গল্পটা আপনাদের আগেই বলা উচিত ছিল—এই গল্প আমি প্রায়ই বলি। লাশ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে শুনি, ভীষণ ভয় পেয়ে আপনমনে কথা বলছে জ্যারেট। তখন একটা মজা করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। টেবিল থেকে নেমে হাঁটতে লাগলাম ধীরে ধীরে, ভাবতেই পারিনি যে ব্যাপারটাকে সে এত গুরুত্ব দেবে। উফ্, লাশের সঙ্গে পোশাক বদল করা কি সোজা ঝামেলা! তারপর বের হতে গেলাম। কিন্তু আপনারা— আপনারা আমাকে বের হতে দেননি।'

শেষে কথাগুলো এত হিংস্রতার সঙ্গে বলা হলো যে দু'জনেই কয়েক ধাপ পিছিয়ে গেল তীব্র আতঙ্কে।

'আমরা?—কেন?—কেন?' তোতলাতে লাগল হেলবারসন, 'এতে আমাদের কোনও হাত নেই।'

'আপনারা দু'জন তো ডা. হেলবর্ন আর ডা. শারপার, তাই না?' হেসে উঠল সে উন্মাদের মত।

'আমার নাম হেলবারসন, আর এ হলো হারপার। কিন্তু এখন আমরা আর ডাক্তার নই। এখন আমরা, মানে, জুয়াড়ি—বাজি ধরি,' হেলবারসন সত্য কথা বলল।

'জুয়া-বাজি ধরা,' বলল সে মাথা নাড়াতে নাড়াতে, 'চমৎকার পেশা-অত্যন্ত চমৎকার, আশা করি সমস্ত সৎ জুয়ারীর মত জ্যারেটের গচ্ছিত বাজির টাকা মিটিয়ে দেবেন। জুয়া—বাজি ধরা—অত্যন্ত চমৎকার, সম্মানজনক পেশা,' বলল সে আবার, 'তারপর যেন ডুবে গেল গভীর ভাবনায়; 'কিন্তু আমি আমার পুরানো পেশাটাকেই ধরে আছি। আপনারা অসুস্থ, মাথারও দোষ আছে মনে হচ্ছে। ভাববেন না, অসুস্থকে সুস্থ করে তোলাই ডাক্তারের ধর্ম।' কাছেই ব্লুমিংটন পাগলা গারদে ভর্তির জন্যে কোনওরকম দুশ্চিন্তা করবেন না, আমি সেখানকার হাই সুপ্রীম মেডিক্যাল অফিসার।'

মূলঃ অ্যামব্রোস বিয়ার্স
রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

দানব পাখির ডিম

'অর্কিড নাকি?'

পেছন থেকে প্রশ্নটা শুনে ঘুরে তাকালাম। হাসি মুখে এগিয়ে এসে আমার সামনের চেয়ারে বসল প্রশ্নকর্তা, ষণ্ডা চেহারার লোকটি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালাম।

'সাইপ্রিপেডিয়াম নিশ্চয়ই?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

তার চোয়াড়ে মুখের ডান পাশে বিশাল কাটা দাগ। ভাল লাগল না আমার।

'বেশিরভাগই ওই প্রজাতির,' জবাব দিলাম।

'নতুন কিছু পাননি? সাতাশ বছর আগে গিয়েছিলাম ওই দ্বীপে।'

'কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'জোয়ান বয়সের খেয়াল। উড়ু উড়ু মন, তাই উড়েই বেড়িয়েছি। দু'বছর ছিলাম ইস্ট ইণ্ডিজে। ব্রেজিলে সাত বছর। তারপর গেলাম মাদাগাসকারে।'

'ওই দ্বীপে গেছে এরকম কিছু লোকের নাম জানি। কার চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'ডসনের। বুচারের নাম শুনেছেন? আমিই বুচার।'

'ও, আপনিই! ডসনের বিরুদ্ধে মামলা তো আপনিই করেছিলেন। চার বছর আটকে ছিলেন মরুদ্বীপে। সেই চার বছরের টাকা আপনি মামলা করে আদায় করেছিলেন ডসনের কাছ

থেকে, ঠিক না?'

বিগলিত হাসিতে গলে পড়ল বুচার। 'জ্বি, আমিই সেই অধম। মামলাটা খুবই মজার ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, দারুণ ইন্টারেস্টিং।'

'ঈপাইওরনিস নামটা কি শুনেছেন?'

'শুনেছি। অ্যাণ্ড্রুজ বলেছিল। ওটা নিয়ে গবেষণা করছে সে। একখানা মাত্র উরুর হাড় নিয়ে যে কী মাতামাতি। স্রেফ পাগলামি। ওই জন্যেই তো সমুদ্র পাড়ি দিতে হলো আমাকে।'

'উরুর হাড়!' অবাক হলো যেন বুচার।

'হ্যাঁ, একগজ মত লম্বা সে হাড়। দৈত্যের মত প্রাণী।'

'দৈত্য মানে এক্কেবারে সিন্দবাদের দৈত্য। কবে, কোথায় পেয়েছে ওটা জানেন আপনি?'

'কোথা থেকে পেয়েছে বলতে পারব না, তবে হাতে পেয়েছে তিন-চার বছর আগে। কেন, আপনি কি ওটা সম্পর্কে কিছু জানেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না মানে? হাড় কেন, ওই হাড়ের মালিকও তো আমারই আবিষ্কার। ডসন ব্যাটা যদি বেতন নিয়ে খ্যাচড়ামি না করত, তা হলে ওই একখান হাড়ের বদৌলতেই রাজা বনে যেত।'

'আপনিই বা ওটা পেলেন কোথায়?'

'কপালগুণে রে ভাই, কপালগুণে। নৌকাটা যে নোঙর ছিঁড়ে আপন খেয়ালে ভেসে যাবে তা কি জানতাম। ঘুমের ঘোরে ভাসিয়ে নিয়ে ঠেকাল আন্তানানারিভো থেকে প্রায় নব্বুই মাইল উত্তরের এক বিরাট জলায়।'

'ও হ্যাঁ, অ্যাণ্ড্রুজ তো বলেছিল জলাতেই পাওয়া গেছে ওটা।'

'পূর্ব উপকূলের জলা। গোল করে চারদিক থেকে জলাভূমি

ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। পানির কারণেই কিনা কে জানে, কিছুই পচে না। নোনতা বিশ্রী স্বাদের পানি, তাতে আলকাতরার গন্ধ। ওখানটাতেই পেয়েছিলাম। দেড় ফুটের মত লম্বা। একটা নয় দুটো নয়, অনেকগুলো ডিম।

'আসলে বেরিয়েছিলামই ডিম খুঁজতে। সঙ্গে দু'জন কালো আদিবাসী ছিল। চারখানা ক্যানু, চারদিনের খাবার আর তাঁবুটাবুসহ যখন নৌকা এনে এখানে ফেলল বেচারা, কী আর করা। ভাগ্য বলেই মেনে নিলাম। মোটামুটি শক্ত আর কাদা কম দেখে এক জায়গায় তাঁবু খাটালাম। কী গন্ধ রে ভাই, এখনও যেন নাকে আটকে আছে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ওই আলকাতরার গন্ধ। তবে কাজটা ছিল মজারই, লোহার শিক দিয়ে কাদা খোঁচানো। আচ্ছা বলেন দেখি এমন করে খোঁচাখুঁচি করলে আস্ত থাকে ডিম?

'শেষ কবে যে ডিম ফুটে ঈপাইওরনিসের বাচ্চা দ্বীপময় দাপিয়ে বেড়িয়েছিল তা ওই কালো ব্যাটাদের মুখেই শুনেছিলাম। কিংবদন্তী মিশনারীদের প্রচার। জ্যান্ত ঈপাইওরনিস সাদারা কোনওকালেই দেখেনি। কালোরাও দেখেছে কিনা সন্দেহ।

'১৭৪৫ সালে ম্যাকার নামে কে নাকি দেখেছিল; মাদাগাস্কারে জ্যান্ত, চলেফিরে বেড়ানো ঈপাইওরনিস। কী জানি। দেখতেও পারে। আমি পেয়েছিলাম ডিম। যেন সদ্য পাড়া। নৌকা থেকে নামাতে গিয়ে পাথরের ওপর পড়ে ঠাস্ করে ফেটে চৌচির হয়ে গেল একটা। পচা তো নয়ই। একেবারে টাটকা গন্ধ!

'আশ্চর্য দেখেন, ওটা যার পেট থেকে বেরিয়েছে, সে তো সেই চার শ' বছর আগেই অক্কা পেয়েছে। যাহোক, ডিম ভাঙতে মেজাজ গেল খিঁচড়ে। যাবে না-ই বা কেন, সেই সারাদিন কাদা

ঘেঁটে ঘেঁটে বের করেছি আর ব্যাটা কালা হারামজাদা ফেলে ভাঙল। রাগলে আবার আমার মাথার ঠিক থাকে না। দিলাম আচ্ছামত ধোলাই। তাই বলে তোরা ওই ভাবে শোধ নিবি?

'কেটলিতে চায়ের পানি ফুটছে। আমি পাইপ ধরিয়ে আয়েশ করে টানছি আর দু'চোখ ভরে দেখছি জলাভূমির সূর্যাস্ত। অদ্ভুত সুন্দর সে দৃশ্য। সামনে সিঁদুর রঙা আকাশের গায়ে ধূসর পাহাড়। জলাভূমিতে পড়েছে তার ছায়া। থিরথির করে কাঁপছে লালচে পানি। অপূর্ব। দেখছি আর মনে মনে হিসেব করছি কয়দিন এখানে থাকতে পারব। স্টকে আছে তিনজনের তিন দিনের মত খাবার আর এক পিপে পানি। ভয়ের কিছু নেই। ভাল মতই ফিরতে পারব। হঠাৎ ঝপাৎ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি, দুই হারামজাদা নামিয়ে নিয়েছে নৌকো। মুহূর্তে বুঝে গেলাম শয়তানদের মতলব। সর্বনাশ! ছররাওলা বন্দুক যাও আছে তা তাঁবুতে। ওটা আনতে আনতেই ব্যাটারা চলে যাবে নাগালের বাইরে। ঝট করে মনে পড়ল ছোট্ট রিভলভারটা তো আছে পকেটে। ছুটলাম সমুদ্রের দিকে। ততক্ষণে চলে গেছে বিশগজ মত। পিস্তল তাক করে ধরে বললাম, ফিরে আয় শয়তানের বাচ্চারা, নইলে কুত্তার মত গুলি করে মারব। কেয়ারই করল না। উল্টে আমাকে কী টিটকারি দেয়া! পিত্তি জ্বলে গেল। দিলাম দমাদম গুলি চালিয়ে। পড়ে গেল একজন পানিতে। আরেকজন মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল নৌকার খোলে। দাঁড়টা পড়ে গেল পানিতে। বুঝলাম এভাবে কাজ হবে না। জামা কাপড় খুলে ছুরিটা দাঁতে কামড়ে দিলাম ঝাঁপ পানিতে। অনেক দূরে চলে গেছে নৌকো। হাঙরের ভয়ও আটকাতে পারল না। ভয় পেলে এই দ্বীপে পচে মরতে হবে, জানি। অন্ধকার নেমে গেছে। স্রোতের টানে দাঁড় ছাড়া নৌকা কোনদিকে ভেসে যাবে আঁচ করে সেই দিকেই

সাঁতরে চললাম। কালো কালির মত অন্ধকারে ঢেউয়ের মাথায় ঝিকিয়ে উঠতে লাগল ফসফরাসের আলো। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। খানিক দূরে ছায়ামত চোখে পড়ল। বুঝলাম নৌকোটা। ঢেউ আছড়ে পড়ছে ওটার তলায়। সাবধানে এগিয়ে গেলাম। ব্যাটা টের পেলে, রক্ষে নেই। নিঃশব্দে মাথা তুললাম, পুরো নৌকা খালি। তারমানে খোলের ভেতর শুয়ে পড়া লোকটা গুলি খেয়েই শুয়েছে, জন্মের মত। নৌকোয় উঠেই ওকে ফেলে দিলাম পানিতে।

'দুঃশ্চিন্তা আর পরিশ্রমে ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। দু'খানা বিস্কুট আর দু'ঢোক পানি খেয়ে পাটাতনের ওপরে শুয়ে পড়লাম। উঠে দেখি সকাল। ডাঙার চিহ্নও নেই। সীমাহীন পানি। বহু দূরে একটা পালতোলা জাহাজের মাস্তুলের আগাটুকু একপলকের জন্য দেখতে পেলাম। সূর্য মাথার ওপর উঠতেই চড়চড়ে রোদে জ্যান্ত ভাজা হয়ে যাবার জোগাড় হলাম। বিস্কুট মোড়ানো একটুকরো খবরের কাগজ ছিল ওটাই মাথার ওপর দিলাম। ওটুকুতে কী আর হয়। ফোসকা পড়ে গেল সারা গায়ে।

'পুরো দশ দিন এভাবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করলাম। রোদের তোড়ে চোখ মেলে তাকাতেও পারতাম না। শুধু সকাল আর বিকেলের দিকে লক্ষ্য রাখতাম জাহাজ-টাহাজ যায় কিনা। দু'বার দেখেছিলামও। চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়েছি। শুনতে পায়নি। কপালে আছে দুর্ভোগ–না হলে... যা হোক, খাওয়ার টান পড়তেই একটা ডিম ভাঙলাম। একটু গন্ধ গন্ধ। তবে স্বাদ খারাপ না। হাঁসের ডিমের মত। কুসুমের পাশে বিটকেলে এক দাগ। সরু সরু সুতা আর মইয়ের মত জাল জাল কী যেন। খিদের সময় অত কে দেখে। তিনদিন ধরে খেলাম ওই একখান ডিম। তিনদিন পর আরেকটা ভাঙতেই খাড়া হয়ে গেল গায়ের লোম! অবিশ্বাস্য এক

দৃশ্য! বাচ্চা ফুটছে একটু একটু করে। প্রায় চারশো বছর আগের আলকাতরা-কালো কাদায় পোঁতা ডিম। তাই থেকে বেরুচ্ছে ছানা। রোদের তাতে তৈরি হচ্ছে বাচ্চা! আজব কেরামতি রে ভাই। ভ্রূণের মধ্যে বিরাট মাথা আর বাঁকা পিঠ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমনকী ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানিও দেখতে পাচ্ছি। পাতলা এক পর্দা ক্রমশ শুকিয়ে আসা কুসুমটাকে ঢেকে ফেলেছে। এসব দেখে অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার মন। ভারত মহাসাগরের বুকের ওপর বসে ডিম ফুটাচ্ছি! কোন কালে লুপ্ত হয়ে যাওয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এক পাখির ডিম! ডসন যদি জানত, চার বছরের মাইনে আমার এক কথাতে দিয়ে দিত, তাই না?'

এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে শুনছিলাম আমি। তার প্রশ্নে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে আগ্রহ ভরে জানতে চাইলাম, 'তারপর?'

'খিদের জ্বালায় সেই আধফোটা বাচ্চাকেই খেয়ে ফেললাম একটু একটু করে। জঘন্য স্বাদ। ভাবলেও গুলিয়ে ওঠে গা। তৃতীয়টা আর ভাঙলাম না, খাওয়া যাবে না বুঝতে পেরেই। এভাবে মাঝ সমুদ্রে না খেয়ে মরার ভয়ে বাঁচার চেষ্টা চালালাম। একটা দিক নির্দিষ্ট করে নৌকো নিয়ে এগুতে লাগলাম। বিশাল ডিমের খোলাটাকে দাঁড় হিসেবে ব্যবহার করলাম। এভাবেই পৌঁছুলাম অ্যাটলে। চাকার মত প্রবাল দ্বীপ। মাঝখানে উপহ্রদ। চারমাইলের ছোট্ট দ্বীপটাতে গোটা কয় গাছ, একটা ঝরনা আর হ্রদ বোঝাই কাকাতুয়া মাছ।

'টেনে ডাঙায় তুললাম নৌকো। তারপর সাবধানে নামালাম ডিমটা। সৈকত থেকে দূরে শুকনো বালুতে গর্ত করে তাতে রাখলাম ওটা। ভালমত রোদ লাগার জন্য খুলে রাখলাম গর্তের মুখ। এরপর শুরু হলো রবিনসন ক্রুশোর জীবন। ছোটবেলায় বই

পড়ে ভেবেছিলাম চমৎকার জীবন। অ্যাডভেঞ্চারে ভরা। বাস্তবে দেখলাম একেবারে জঘন্য। অসহ্য একঘেয়েমিতে ভরা। প্রথম দিনটা খাবারের সন্ধান করতেই কেটে গেল। সারাদিনের শ্রমে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল শরীর। নৌকোর মধ্যে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। যেন এক সঙ্গে হাজার হাজার নুড়ি পাথর আছড়ে পড়ল নৌকোর গায়ে। স্বপ্ন দেখছিলাম। আচমকা ঘুম ভাঙতে ভুলে গিয়েছিলাম পরিবেশ পরিস্থিতি। নিজের বাড়িতে আছি ভেবে অন্ধকারেই হাতড়ালাম দেশলাইয়ের জন্যে। মুহূর্তে খেয়াল হলো আছি কোথায়। সোঁ সোঁ বাতাসের শব্দের সঙ্গে গর্জন করে নৌকোর গায়ে আছড়ে পড়ল ঢেউ। ভাগ্যিস পানির কাছ থেকে অনেক দূরে রেখেছিলাম ডিমটা। ঘন কালো আকাশ। আলোর চিহ্ন নেই কোথাও। প্রচণ্ড শব্দে একের পর এক বাজ পড়তে লাগল। তারপর শুরু হলো বৃষ্টি। যেন ফুটো হয়ে গেছে আকাশ। মাথায় ফসফরাসের আগুন নিয়ে কিলবিলিয়ে এগিয়ে এল বিশাল এক ঢেউ। ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দিলাম ছুট। বৃষ্টি ধরতেই ফিরে এলাম নৌকোর কাছে। কিন্তু কোথায় নৌকো! বুঝলাম ভেসে গেছে। ডিম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি ঢেউ। ওটার পাশে বসেই কাটিয়ে দিলাম বাকি রাতটুকু। কী ভয়ানক রাত। এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

'ভোর হলো। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। বালুর ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নৌকোর টুকরো-টাকরা। কুড়িয়ে আনলাম ওগুলো। পাশাপাশি দুটো গাছে ওগুলো বেঁধে ছাউনি মত বানিয়ে নিলাম। ওই দিনই ডিম ফুটে বেরুল ঈপাইওরনিসের বাচ্চা।

'ডিমটা জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছিলাম। ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেলাম ফটাশ শব্দে ভাঙল কী যেন। ভাঙুকগে, আমার কী, ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম আবার। কিন্তু আচমকা ঝাঁকুনি লাগতেই

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। ডিমটার দিকে তাকিয়ে দেখি ফুটো হয়ে গেছে খোলা। ফুটো থেকে কদাকার এক বাদামি মুণ্ডু জুল জুল চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওকে দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। 'সোনা মানিক, লক্ষ্মী বাপধন আমার!' বলে ডাকতেই খুটুর খাটুর করে বেরিয়ে এল। দেখতে পাখির ছানার মতই। তবে আয়তনে বড়।

'ওর গায়ের বাদামি রঙের নোংরা মামড়ি দু'দিনেই ঝড়ে গেল। গজালো চুলের মত নরম মিহি পালক। নাম রাখলাম ফ্রাইডে। রবিনসন ক্রুশোর ফ্রাইডে ছিল মানুষ। আমার ফ্রাইডে হলো তিন চারশো বছর আগের এক দানব পাখির ছানা।

'ডিম থেকে বেরুনোর পর ওর কুৎসিত চেহারা দেখে ঘিন ঘিন করে উঠেছিল আমার গা। কিন্তু মুরগির মত ঘাড় ঘুরিয়ে কোঁক কোঁক করে ডেকে খাবার চাইতেই হু-হু করে উঠল মন। আহা রে, মা-বাপ নেই। আমি ছাড়া কে দেবে ওর খাবার। তখুনি ছুটলাম মাছ ধরে আনতে। খাওয়াতে গিয়ে দেখি, ওরে বাবা, এ যে রাক্ষস। দিতে না দিতেই শেষ। আর শেষ হতেই ঠোঁট ফাঁক করে কোঁক কোঁক শব্দ করে কী লাফালাফি। দারুণ মজা পেলাম। বললাম, খেয়ে দেয়ে বড় হ। অনেক দিন মাংসের স্বাদ পাই না, তোকে দিয়ে সে সাধ পূর্ণ হবে।

'দিন দিন বেড়ে চলল ঈপাইওরনিসের ছানা। সেই সঙ্গে খুলতে লাগল ওর রূপ। বাড়তে লাগল চেকনাই। মাথায় গজাল নীল ঝুঁটি। লেজের লম্বা পালকের রং হলো ঝিকমিকে সবুজ। ওকে নিয়ে বেশ সুখে শান্তিতে কেটে গেল দুটো বছর। কাজকর্ম নেই। মাথায় নেই দায়িত্বের বোঝা। মাইনে জমা হচ্ছে ডসনের অফিসে। শুধু তামাক নেই এই যা দুঃখ।

'সময় কাটানোর জন্যে সাজাতে শুরু করলাম দ্বীপটাকে।

নুড়ি, শামুক, ঝিনুক দিয়ে দ্বীপের চারপাশ ঘিরে লিখলাম 'ঈপাইওরনিস আইল্যাণ্ড'। প্রতিদিন সকাল বিকাল সমুদ্রের তীরে বসে থাকতাম জাহাজের আশায়। এসব সময় ফ্রাইডে সারাক্ষণই থাকত আমার পাশেপাশে। আমাকে খুশি করার জন্যে কিংবা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে মাঝেমাঝে নাচত। অপূর্ব সে নাচের ভঙ্গি। নীল ঝুঁটি ঘুরিয়ে, লেজে ঢেউ তুলে পা তুলে তুলে সে কী নাচ! ঝড় বৃষ্টির সময় গুটিগুটি এসে আমার গা ঘেঁষে বসত। বড় ভাল লাগত। ওসব মুহূর্তে ওর ওপর কেমন যেন স্নেহপূর্ণ অনুভূতি হত আমার। এই মানে, বলতে পারেন ফাদারলি ফিলিংস।

'কিন্তু এ-সুখ আর বেশিদিন সইল না আমার কপালে। ফ্রাইডের বয়স দুই বছর পেরিয়ে গেছে। লম্বা হয়েছে চোদ্দ ফুট। গাঁইতির ফলার মত বিশাল মাথা। কতবেলের মত বড় বাদামি দুই চোখের চারপাশ ঘিরে হলুদ রিং। অস্ট্রিচের পালকের মত কর্কশ নয় বরং বেশ মসৃণ ওর পালক। রং আর পালক দুই-ই অনেকটা ক্যাসওয়া-রি পাখির মত। কিন্তু রক্তে যার রয়েছে বেঈমানী তাকে বাইরের রূপে কি চেনা যায়? আমার খেয়ে যার হয়েছে এত চেকনাই, সে কিনা চালায় আমার ওপর স্বৈরাচার! নিমকহারাম, বুঝলেন! একেবারে নিমকহারাম।' দুঃখে সত্যি সত্যি ভারি হয়ে উঠল বুচারের কণ্ঠ।

'একদিন মাছ ধরতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলাম। রোজ ধরা পড়ে পড়ে ব্যাটা মাছেরাও হয়ে গেছে ভীষণ চালাক। সব পালিয়েছে লেকের মধ্যিখানে। একটাও আর পাই না। এদিকে শয়তানের বাচ্চা ঘাড় উঁচিয়ে টহল দিচ্ছে। বুঝতে পারছি ওর পেটে ভীষণ খিদে। পেটে যখন রাক্ষুসে খিদে তা হলে সামুদ্রিক শশা খেয়েও তো পেট ভরাতে পারে। তা না, নবাবের বাচ্চার চাই মাছ। খিদেয় পেট জ্বলছে আমারও। তাই অনেক কষ্টের পর

একটা মাছ পেয়ে ওকে ভাগ দিতে চাইলাম না। মোটে একখান মাছ। ওটাতে ওর পেটের কোনাও ভরবে না জেনেই একাই খেতে গেলাম। ওরে বাবা, হোয়াক্ করে তেড়ে এসে ছিনিয়ে নিল। খিঁচড়ে গেল মেজাজ। মাথায় দিলাম কষে এক ঘা। ব্যস, সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

'এই দেখুন,' বলে বুচার তার মুখের কাটা দাগটা দেখাল। 'এক ঠোক্করেই এই দশা হয়েছিল। এত বছরেও দাগটা মুছল না। জানি জীবনেও মিলাবে না। ঠোকর মেরেও রেহাই দিল না। শুরু হলো ঝড়ের বেগে লাথি। ঘোড়ার লাথি তার কাছে কিছুই না। মুহূর্তে বুঝে গেলাম শয়তানটার মতলব। খুন করবে আমাকে। তারপর আমার মাংসেই উদোর পূর্তি করবে। টের পেতেই ছুটতে শুরু করলাম। সে-ও তাড়া করল আমাকে। পঙ্খীরাজের গতি ওর। ধরা পড়ে গেলাম। ওর পাঁচ ফুট উঁচু গোদা পায়ের লাথি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম। এরপর শুরু হলো ঠোক্কর আর লাথি বৃষ্টি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গিয়ে পড়লাম লেগুনের পানিতে। জানতাম পানিতে নামবে না ইবলিশটা। সারাদিন গলা পানিতে দাঁড়িয়ে কাটালাম। এক মুহূর্তের জন্যেও সে নড়ল না ওই জায়গা থেকে। গলা লম্বা করে ঝুঁটি উঁচিয়ে পায়চারি করতে থাকল। সেই সাথে চিৎকার। সহ্য করা যায় না। মিথ্যে বলব না, নবাবের বাচ্চার খানদানী টহল দেখে নিজেকে খুবই ছোট লাগছিল। অমন লর্ড স্টাইলে হাঁটা আমার দ্বারা জীবনেও সম্ভব হবে না। ওকে দেখছি আর যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছি। সারা শরীর থেঁতলে দিয়েছে হারামজাদা। দরদর করে রক্ত পড়ছে মুখের ক্ষত থেকে।

'শরীরের কষ্টকে ছাপিয়ে উঠল মনের কষ্ট। ডিম ফুটিয়ে যাকে জন্ম দিলাম, নিজ হাতে খাইয়ে এতটা বড় করলাম, তারই হাতে আজ এতটা অপদস্থ। কতবড় নিমকহারাম ভাবুন একবার।'

ঈপাইওরনিসের বাচ্চার নিমকহারামির কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে এল বুচারের। মনে হলো দুঃখে কেঁদেই ফেলবে সে। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মুখের চেহারা ম্লান করলাম আমি।

'ভেবেছিলাম রাগ পড়ে গেলে নিজের ভুল বুঝতে পারবে সে। কিন্তু আমার ভাবনা মিথ্যে প্রমাণিত করে সে আমার উঠে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েই রইল। সারাদিন এভাবে কাটার পরও যখন সে নড়ল না, তখন ডুব সাঁতার দিয়ে চুপি চুপি গিয়ে উঠলাম একটা তাল গাছের তলায়। জিন্দিগীতে তালগাছে উঠিনি। প্রাণের ভয়ে ওই ক্ষতশরীর নিয়ে উঠলাম তালগাছের মাথায়। নিজের হাতের ওপর জন্মানো এক বেঈমানের ভয়ে নেংটি ইঁদুরের মত বসে আছি তালগাছে। মানুষের বাচ্চা হয়ে আমি চারশো বছর আগের বিলুপ্ত এক পাখির ভয়ে কাঁপছি ঠক্‌ঠক করে।

'গাছের মাথায় আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল। গলা লম্বা করে ধরতে চেষ্টা করল। শয়তানটাকে বশে আনার জন্যে কত যে ফন্দি ফিকির করলাম, তা মুখে বলতে পারব না। এখন ভাবতেই লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ফন্দি ফিকিরে কাজ হলো না দেখে মারধর শুরু করলাম। বড় বড় প্রবালের টুকরো ছুঁড়ে মারতে লাগলাম। ওমা, অবাক হয়ে দেখি গিলে ফেলছে কোঁৎ কোঁৎ করে। তাই দেখে খোলা ছুরি ছুঁড়ে দিলাম। বললাম, "এইবার গেল হারামজাদা"। যেন সে বুঝতে পারল আমার মতলব। ছুরি নিজের দিকে ছুটে আসতে দেখেই গলা সরিয়ে নিল সে। ব্যর্থ হলো আমার এই পরিকল্পনা। শেষ পর্যন্ত ফন্দি করলাম না খাইয়ে মারব। এও ব্যর্থ হলো। হারামজাদা অল্প পানিতে নেমে পোকা মাকড় খুঁটে খেয়েই পেট ভরাতে লাগল। না খেয়ে মরতে বসলাম আমি নিজেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অর্ধেক সময় থাকতে লাগলাম গলা পানিতে ডুবে। বাকি অর্ধেক সময় তাল গাছের ডগায় বসে।

'একদিন পা ঝুলিয়ে ঘুমাচ্ছি তালগাছে। আচমকা পায়ে তীব্র ব্যথায় চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। বাম পা উঠিয়ে দেখি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে আশপাশে খুঁজলাম। পেয়েও গেলাম। তালগাছের পাশেই ঝাঁপির মত বড়সড় এক গাছ ছিল। ওটাতে উঠেই শয়তানের বাচ্চা আমার গোড়ালি থেকে ঠুকরে তুলে নিয়েছে মাংস। অসহ্য যন্ত্রণায় সারারাত কাতরালাম। নীচে নেমে গাছপাতার রস লাগিয়ে যে রক্ত বন্ধ করব, সে উপায়ও নেই। পরিত্রাণের কোনও পথ না দেখে অসহায়ের মত কাঁদতে শুরু করলাম। উঃ, কত বড় ইবলিশ তা আর কী বলব। পাখি না জ্যান্ত শয়তান। দেখতে যেমন জঘন্য, স্বভাবটাও তাই।

'এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমি বাঁচব না, বুঝতে পারলাম। খুন চেপে গেল মাথায়। খুন করব হারামজাদাকে, যেভাবেই হোক। দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে ধরার প্ল্যান করলাম। লেগুন থেকে আঁশের মত একরকম গাছ আর লম্বা ঘাস তুলে কখনও পানিতে দাঁড়িয়ে কখনও গাছের ডগায় বসে বানিয়ে ফেললাম বিরাট এক দড়ি। একদিনে হয়নি। দিনের পর দিন লেগেছে। এরপর বড় এক প্রবালের টুকরা দড়ির আগায় বেঁধে পানিতে দাঁড়িয়ে বন বন করে দড়িটা ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম ওর দুইপা সই করে আটকে গেল পা। ছুটার জন্যে অস্থিরভাবে লাফাতে লাগল। যত লাফায় ততই জড়ায়। শেষে যখন ঝপাৎ করে পড়ে গেল, তখন উঠে এলাম পানি থেকে। একটুও ইতস্তত না করে ছুরি দিয়ে পচ পচ করে কেটে ফেললাম ওর গলা।

'এখন ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। অনুশোচনা হয়। মনে হয় মানুষ খুন করেছি। আসলে তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। বালুর ওপর রক্তের নদী বইছে। সেই রক্তে ওর সুন্দর দুই পা আর বাহারি গলা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। ওই মুহূর্তে ওই দৃশ্যেও

আমার মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট লাগেনি। খানিকক্ষণ বাদেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল মাথা। বুঝলাম কতবড় ভুল করেছি। বুক ফেটে কান্না এল। ডিম থেকে যাকে বার করে বড় করলাম, দিনের পর দিন যে সঙ্গ দিয়ে আমার নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে রেখেছিল, তাকে নিজ হাতে খুন করলাম। প্রবাল পাহাড় খোঁড়ার সরঞ্জাম থাকলে মানুষের মতই কবর দিতাম তাকে। সে বেঈমানী করলেও আমি তাকে ভাল বেসেছিলাম। পুত্রস্নেহে পালন করেছিলাম। ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠল নিঃসঙ্গতা। খেয়ে না খেয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম দ্বীপময়। এভাবেই কেটে গেল বহুদিন। তারপর একদিন এক পালতোলা জাহাজ এল অ্যাটলে। স্মৃতি হিসেবে নিয়ে এলাম ওর হাড়গোড়।

'এই কাহিনি শুনে উইন্সলো নামে এক লোক জোর করেই কিনে নিল সেই হাড়। বেশি দামে সে বেচে দিল হ্যাভার্সকে। হ্যাভার্স মারা যাবার পর ঈপাইওরনিস নিয়ে নতুন করে হৈ চৈ শুরু হলো। হ্যাভার্সের বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল শুধু ঊরুর হাড়টা। এই পাখির পুরো নাম কি আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করল বুচার।

'ঈপাইওরনিস ভ্যাসটাস,' বললাম আমি। 'আপনার ওই পাখির হাড়টা ছিল এ পর্যন্ত পাওয়া হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তাই ওটার নাম দেয়া হয়েছিল ঈপাইওরনিস টাইটান। আপনারটার পরেও আরও হাড্ডি পাওয়া গেছে ঈপাইওরনিস ভ্যাসটিসিমাসের।

মুখের কাটা দাগটায় হাত বুলিয়ে করুণ সুরে বুচার বলল, 'এখন বলুন মিস্টার, আমার সঙ্গে অমন জঘন্য ব্যবহার করা কি উচিত হয়েছিল ঈপাইওরনিস ভ্যাসটাসের?'

মূলঃ এইচ.জি. ওয়েলস

অনুবাদঃ নাখশাব আফরিন

লোভ

শেষ বিকেলের দিকে লিঙ্কন জেফির ভি-১২ নিয়ে ডেটোনা বীচের রাস্তায় উঠে এল ডেনি মার্লিন। ধীর গতিতে পাশ কাটাল স্টেডিয়াম আর চমৎকার সাজানো ককুইনা-রক ব্যান্ড স্ট্যান্ড। সাগর সৈকতের দিকে যাচ্ছে মানুষ। তাদের ঈর্ষার চোখে দেখতে দেখতে ডেনি ভাবল এখানেই গাড়ি থামাবে কিনা। চট্ করে সমুদ্র স্নানটা সেরে নেয়া যায়। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। নাহ্, এখানে নামলে চলবে না। ওকে যেতে হবে অনেকদূর। ওশান এভিন্যুর দূর প্রান্তে লাল ত্রিভুজ সাইনটা চোখে পড়ল ডেনির–কনোকো সার্ভিস স্টেশন। ওটার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সে।

সাদা ইউনিফর্ম পরা তিনজন অ্যাটেনড্যান্ট, ব্রেস্ট পকেটে লাল ত্রিভুজ ব্যাজ সেলাই করা, বেরিয়ে এল অফিস থেকে। ডেনি গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল।

'তেল ভরো, ঘঁষামাজাও করো,' নির্দেশ দিল ডেনি। 'আর গাড়িটার প্রতি খেয়াল রেখো। আমি কিছু খেয়ে আসছি।'

বেঁটে ও মোটা এক লোক, আর্মলেট দেখে বোঝা গেল ফোরম্যান, অফিস থেকে বেরিয়ে এল। 'শুভ সন্ধ্যা' ডেনিকে স্বাগত জানাল সে। প্রশংসার দৃষ্টিতে গাড়িটার ওপর চোখ বুলাল, তারপর আবার ফিরল ডেনির দিকে। খদ্দের ভালই চেনে সে।

ডেনিকে ধরে নিল মালদার পার্টি হিসেবে, ধারণা করল ছুটিতে বেরিয়েছে এবং এ ধরনের লোকজন খরচের দিকে তাকায় না। ঠিকই অনুমান করেছে লোকটা।

ভারী সোনার কেস খুলে একটা সিগারেট বের করল ডেনি, ধরাল। 'ভাল খাবার কোথায় মিলবে?' জানতে চাইল সে।

রাস্তার ওপারে আঙুল তুলে দেখাল ফোরম্যান। 'ওখানে, স্যার। চেজনির খাবারটা বেশ ভাল, সার্ভিসও দ্রুত।'

ডেনি বলল, 'ঠিক আছে। ওখানেই যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। গাড়ি যেন রেডি থাকে। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।'

'অবশ্যই রেডি থাকবে। মিয়ামি যাচ্ছেন নাকি, স্যার?'

মাথা ঝাঁকাল ডেনি। 'সেরকমই ইচ্ছে। বুঝলে কি করে?'

দাঁত বের হয়ে গেল ফোরম্যানের। 'সবাই এখন ছুটি কাটাতে মিয়ামির দিকেই যাচ্ছে কিনা। বছরের এ সময়টাতে খুব জ্যাম বেঁধে যায় রাস্তায়। শুনলাম ঝড়ও আসছে।'

শ্রাগ করল ডেনি। 'ঝড়টড় কেয়ার করি না।' তারপর লম্বা পা ফেলে এগোল রেস্টুরেন্টের দিকে।

চোখ দিয়ে ডেনিকে অনুসরণ করল ফোরম্যান, দেখল চেজনির দরজা খুলে আড়াল হয়ে গেল সে। ফোরম্যান গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, উঁকি দিল ভেতরে। 'সুন্দর গাড়ি,' মন্তব্য করল সে। 'লোকটার নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা।'

উইন্ডস্ক্রিন ন্যাকড়া দিয়ে মুছছিল এক অ্যাটেনড্যান্ট, বলল, 'আমারও তাই ধারণা।' রাস্তায় থু করে থুথু ছিটাল। 'তবে লোকটা কিপটে হতে পারে। যে যত বড় গাড়ির মালিক বকশিশের হাতটাও তার ততই ছোট।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফোরম্যান। দৃষ্টি মেয়ে

দুটোর দিকে। সার্ভিস স্টেশনের বিপরীত দিকের দোকানের ছাউনির নিচে আধ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। গাড়ির আসা যাওয়া লক্ষ করছে। ডেনির গাড়িটার ওপর চোখ পড়তে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। দু'জনে কি যেন বলছে। খুব সিরিয়াস ভঙ্গির শলাপরামর্শ। একটা অদ্ভুত জোড়া। একটা মেয়ে খাটো, অন্যটা লম্বা। খাটো মেয়েটি ভারি সুন্দরী। এক মাথা সোনালি চুল, পাতলা লাল সোয়েটার আর কোঁচকানো হলুদ স্কার্ট পরনে। শরীরের খাঁজ-ভাঁজগুলো মারাত্মক। পায়ে হলুদ স্যান্ডেল। সূর্যের তাপ আর বাতাসের ঝাপটা চেহারাটাকে ম্লান করে রেখেছে। তার সঙ্গিনী ছয় ফুটেরও বেশি লম্বা। তবে নারীসুলভ কোন কমনীয়তা নেই চেহারায়। পোশাক আর আচরণ দেখে ওকে মেয়ে বলেই মনে হয় না। লম্বা মেয়েটা পরেছে রং জ্বলা হলুদ-সাদা ট্রাউজার আর কালো পোলো সোয়েটার। মাথার চুল ছেলেদের মত ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রঙ আবলুস কালো।

ফোরম্যান ওদেরকে দেখছে। মেয়ে দুটো মনে হয় একমত হতে পেরেছে। এক সাথে রাস্তা পার হলো, হেঁটে আসছে ফোরম্যানের দিকে।

লম্বা মেয়েটা কোন ভণিতা না করে জানতে চাইল, 'দুটো অসহায় মেয়ের একটা উপকার করতে পারবে?'

অস্বস্তি লাগল ফোরম্যানের, একটু সরে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'কি উপকার?'

হাসল মেয়েটা, তবে হাসি তার চোখ স্পর্শ করল না। 'ওই লিঙ্কন গাড়িটা,' বলল সে, 'কোন দিকে যাচ্ছে ওটা?'

ফোরম্যান জবাব দিল, 'মিয়ামি—কেন, লিফট দরকার?'

'হ্যাঁ। ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'না। এসব কাজ আমরা করি না।'

লম্বা মেয়েটা ঘুরল তার সঙ্গিনীর দিকে। 'তুমি একটু ওদিকে যাও, স্টেলা।' স্টেলা নামের মেয়েটি একটু ইতস্তত করল, তারপর কয়েক কদম সামনে বাড়ল। 'আমার সঙ্গিনী খুব সুন্দরী, না? মেয়েটা লাজুক, তবে তুমি চাইলে ও তোমার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারে।'

'আচ্ছা?' লোভে চকচক করে উঠল ফোরম্যানের চোখ।

'আমরা ওই গাড়িটাতে চড়তে চাই, প্লেবয়। আর সে ব্যবস্থা করে দিতে পারলে আমার ধারণা স্টেলা তোমাকে অখুশি করবে না।' আবার প্রাণহীন হাসিটা ফিরে এল মেয়েটার মুখে।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ফোরম্যান। 'তোমরা একবার গাড়িতে চড়তে পারলে আমার ফায়দা কি?'

'ফায়দা আছে,' বলল লম্বু। 'ওকে নিয়ে দশ মিনিটের জন্যে কোথাও চলে যাও না।'

ঘাম ফুটল ফোরম্যানের কপালে। তাকাল স্টেলার দিকে। শুকনো ঠোঁট চেটে বলল, 'কিন্তু ও কি রাজি হবে?'

'অবশ্যই হবে,' তীক্ষ্ণ শোনাল তালগাছের কণ্ঠ। 'আরে, তোমার কোথাও যাবার জায়গা নেই নাকি?'

ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল ফোরম্যান অস্বস্তি নিয়ে। 'আ...ইয়ে জায়গা থাকবে না কেন। আমার অফিসেই আসতে পারে।'

'তাহলে অফিসে গিয়ে বসো। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে আমাদের লিফটের কিন্তু ব্যবস্থা করে দিতে হবে, প্লেবয়। নইলে তোমার কপালে খারাবি আছে।' হুমকির মত শোনাল কথাগুলো।

ফোরম্যান খানিক দোটানায় ভুগল, তারপর পা বাড়াল নিজের অফিসের দিকে। চোখ-মুখ ছলছল করছে, একটু পর তার পিছু নিল স্টেলা।

সার্ভিস স্টেশনের নিচু দেয়ালটার ওপর উঠে বসল লম্বু, সিগারেট ধরাল একটা। ধীরে ধীরে ধূমপান করছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাস্তার ওপারের রেস্টুরেন্টের দিকে। স্টেশন অফিসের দিকে সে একবারও তাকাল না। মিনিট দশেক পরে ডেনিকে দেখল ওয়েটারকে ডেকে বিল দিচ্ছে। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে। পা বাড়াল অফিসের দিকে। ঢুকে পড়ল দরজা খুলে। তিন অ্যাটেনড্যান্ট ওদের কাণ্ড দেখছিল, মুখে হাসি। লম্বা মেয়েটা পাত্তাই দিল না ওদেরকে। অফিসে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। গলা চড়াল, 'চলে এসো তোমরা। ও এসে গেছে।'

মিনিটখানেক অপেক্ষা করল সে। তারপর আবার ডাকল। অফিসের পেছন দিকের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ফোরম্যান। এখনও হাঁপাচ্ছে। তার ঘাড়ের শিরায় রক্ত দেখতে পেল মেয়েটা। হাসল। বলল, 'এখন যাও, প্লেবয়। লিফটের ব্যবস্থা করে দাও।'

কথা না বলে মেয়েটাকে পাশ কাটাল ফোরম্যান। মেয়েটা পেছনের ঘরে ঢুকল। সঙ্গিনীকে অধৈর্য গলায় বলল, 'এ নিয়ে মাইন্ড করার কিছু নেই। নাও, রেডি হও। আর দয়া করে কান্নাকাটি কোরো না। তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।' আবার অফিসে ফিরে এল সে, চেহারায় ফুটে আছে রাগ, চোখে হিমশীতল দৃষ্টি।

ডেনি মার্লিন নিজের গাড়িটাকে খুঁটিয়ে দেখল, সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। ছেলেগুলো ভালই কাজ করেছে। খাওয়াটাও জবর হয়েছে। তৃপ্তি বোধ করছে ও। ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'কত দিতে হবে?'

অঙ্কটা বলল ফোরম্যান, টাকা দিয়ে দিল ডেনি। সাথে পাঁচ ডলার বকশিশ। 'এটা তোমার ছেলেদের জন্যে। ওরা ভাল কাজ করেছে।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল ফোরম্যান, আমতা আমতা করে বলল, 'দুটি মেয়ে আমার অফিসে বসে আছে, স্যার। খুব ভাল মেয়ে। মিয়ামি যাবে। আপনি যদি ওদের একটা লিফট দিতেন...'

'পারব না,' সাফ জানিয়ে দিল ডেনি। 'আমার গাড়ি কাউকে লিফট দেয়ার জন্যে নয়।'

চেহারা সাদা হয়ে গেল ফোরম্যানের। তো তো করে বলল, 'ওরা খুব বিপদে পড়েই না... আপনি যদি ওদের সাথে একটু কথা বলতেন...

'বললাম তো সম্ভব নয়,' গাড়িতে উঠল ডেনি। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। ঠিক তখন অফিস ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল স্টেলা।

সুযোগটা কাজে লাগাল ফোরম্যান। দ্রুত বলে উঠল, 'ওই মেয়েটা সেই দু'জনের একজন। খুব সুন্দর, না?'

ডেনি স্টেলাকে দেখে আগ্রহ বোধ করল। এত সুন্দরী মেয়ে লিফট চাইছে, তা সে ভাবেনি। গাড়ি স্টার্ট দিতে গিয়েও দিল না। তার দ্বিধা লক্ষ করে মনে মনে উল্লাস বোধ করল ফোরম্যান। তবে চেহারাটা আরও করুণ করে বলল, 'মিয়ামি যাওয়া ওদের জন্যে খুবই দরকার, স্যার। সেই কখন থেকে চেষ্টা করছে লিফট পেতে। কিন্তু সবগুলো গাড়ি ভর্তি।'

স্টেলা ভীরু পায়ে এগিয়ে এল। ডেনির কাছে ওর চোখজোড়া খুবই আবেদনময় মনে হলো। টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে দরজা খুলে দিল সে। 'তুমি লিফট চাইছ?' আবার গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

ডেনির চোখে চোখ রাখল স্টেলা। 'আমরা মিয়ামি যেতে চাই,' মৃদু গলায় বলল সে। 'আমরা আপনাকে একটুও বিরক্ত করব না।'

ফোরম্যান লক্ষ করল তালগাছকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে হাসল সে। লম্বু খুব চালাক। যথাসময়ে রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়ে যাবে।

ডেনি মাথা দোলাল। 'তোমাকে লিফট দিতে কোন অসুবিধে নেই আমার।' চারপাশে একবার নজর বুলাল। 'অন্য মেয়েটাকে দেখছি না যে?' জিজ্ঞেস করল সে ফোরম্যানকে।

লম্বা মেয়েটা অফিসেই বসে ছিল। এবার অফিস থেকে বেরিয়ে এল সে, লম্বা পা ফেলে এগোল গাড়ির দিকে।

ডেনি ভুরু কুঁচকে তাকাল মেয়েটার দিকে। মনে মনে হতাশ। লম্বুর হাঁটার স্টাইল এবং চাউনি কোনটাই পছন্দ হয়নি তার।

'তুমি অপর জন?' মাথার হ্যাটটা সামান্য তুলে ধরে দ্বিধা মেশানো গলায় জানতে চাইল সে।

বড় বড় দাঁত বের করে হাসল মেয়েটা। 'জ্বী। আপনাকে ধন্যবাদ। আসুন, আমার বান্ধবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ও স্টেলা ফ্যাবিয়ান আর আমি গের্ডা তামাভিচ।'

ডেনির ইচ্ছে করছে না পালোয়ান মেয়েটাকে সঙ্গে নিতে। কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছে সে। জোর করে হাসি ফোটাল মুখে, বলল, 'আমি ডেনি মার্লিন। নিউ ইয়র্ক থেকে আসছি। তোমরা রেডি তো? তাহলে চলো যাত্রা শুরু করি।'

গের্ডা তাকাল স্টেলার দিকে, গাড়ির সামনের দরজা খুলে ধরল। 'তুমি মি. মার্লিনের সাথে বসো। আমি পেছনের সীটে বসছি।' ডেনির দিকে ফিরল সে চওড়া হেসে। 'আমার পা লম্বা, প্রচুর জায়গা দরকার।'

খুশি হলো ডেনি। লম্বু তার পাশে বসতে চাইলে মেজাজটাই যেত খারাপ হয়ে। স্টেলাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল সে, তারপর বসে পড়ল ওর পাশে। গের্ডা জায়গা নিল পেছনে।

সালাম দিল ফোরম্যান। কিন্তু কেউ ওর দিকে ফিরেও চাইল না। ওশান এভিন্যু ছাড়িয়ে ব্রডওয়াকের দিকে গাড়ি ছোটাল ডেনি।

চৌমাথায় এক ট্রাফিক পুলিশ ইশারা করল ওকে গাড়ি থামাতে। 'ব্যাটা চায় কি?' পুলিশটাকে ওদের দিকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল ডেনি।

মেয়েদুটির কেউ জবাব দিল না। ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে গেছে দু'জনে। দেখছে পুলিশটাকে। গের্ডা একটা রুমাল বের করে মুখ মোছার ছলে চেহারা আড়াল করে রাখল

ডেনিকে স্যালুট দিল পুলিশ, অমায়িক হেসে বলল, 'মিয়ামি যাচ্ছেন নাকি, স্যার?'

মাথা দোলাল ডেনি। 'হ্যাঁ। কেন, যেতে পারি না?'

'পারেন, তবে ঝুঁকি আছে, স্যার,' বলল পুলিশ।

'প্রচণ্ড হারিকেন ঝড় আসছে। ফোর্ট পিয়ার্সে পৌঁছার আগেই হয়তো ঝড়ের কবলে পড়ে যাবেন।'

'জানি,' বলল ডেনি। 'কনোকোর লোকজন বলেছে আমাকে। আমি যাব অনেক দূর, তবে অবস্থা বেগতিক দেখলে ফোর্ট পিয়ার্সে থামব।'

আবার স্যালুট করল ট্রাফিক পুলিশ। 'আপনার খুশি, স্যার।' হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওদেরকে।

ড্রাইভিং মিররের দিকে তাকিয়ে ঘেউ করে উঠল ডেনি। 'এরা ঝড়ের কথা বলে বলে কান ঝালাপালা করে দিল।'

'সামনে ঝুঁকে এল গের্ডা। 'আপনি বোধহয় ফ্লোরিডায় এই

প্রথম?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'না, মানে, এখানকার লোকজন এই হারিকেন ঝড়কে খুব ডরায়।'

হারিকেন নিয়ে কথা বলতে বিরক্ত বোধ করছিল ডেনি। সূর্য এখনও সমানে উত্তাপ ছড়িয়ে চলেছে, উপকূল থেকে বইছে মৃদু হাওয়া। ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবার লক্ষণ নেই কোথাও। স্টেলার দিকে তাকাল সে। সীটের এক কোণে সরে বসেছে মেয়েটা। স্টেলার শরীরের গাঁথুনি চমৎকার, মনে মনে স্বীকার করল ডেনি। ভাগ্যিস গের্ডা তার পাশে বসে নেই। সে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই হারিকেন ভয় পাও না?'

ডেনির দিকে এক ঝলক তাকাল স্টেলা, মাথা নাড়ল। 'না। আমি হারিকেন ঝড় দেখেছি। তবে এই ঝড়ের সাথে কোন কিছুর তুলনা হতে পারে না।'

স্টেলার কণ্ঠ মিষ্টি, ওর বলার ধরনটাও ভাল লাগল ডেনির। মেয়েটির সুগঠিত; নগ্ন হাঁটুর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা আসলে কি করো?'

স্টেলাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কলকলিয়ে উঠল গের্ডা, ডেনির প্রায় কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে। তার কণ্ঠ নিচু, খসখসে। 'আমরা চাকরি খুঁজছি। ডেটোনা বীচে আর ভাল্লাগছিল না। তাই মিয়ামি যাচ্ছি। আশা করি ওখানে কাজ-টাজ জুটে যাবে।'

পুরানো ডিক্সি হাইওয়েতে মোড় নিল ডেনি। রাস্তাটা পোর্ট অরেঞ্জের দিকে গেছে। গ্যাস পেডালে চাপ দিল সে, হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে গতি বেড়ে গেল লিঙ্কনের। কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে বলল, 'আমি রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সাথে জড়িত। তোমরা কি শর্ট হ্যান্ড বা এ ধরনের কিছু জানো? তাহলে তোমাদের হয়তো

কাজ-টাজ জুটিয়ে দিতে পারব।'

হেসে উঠল গের্ডা। কপালে ভাঁজ পড়ল ডেনির। মহিলা পালোয়ানের কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে হিসহিস করে হাসার ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না তার। 'এতে হাসার কি হলো?' তীক্ষ্ণ গলায় বলল ডেনি।

'না। কিছু হয়নি,' বলল গের্ডা। 'আপনাকে দেখেই মনে হয়েছিল আপনি চাকরির খনি। তাই না, স্টেলা?'

চুপ করে রইল স্টেলা। তারপর বলল, 'আমরা গান বাজনা করি। অভিনয় করি। নটা-পাঁচটা অফিসের কাজ আমাদের পোষাবে না।'

'ও আচ্ছা!' কর্কশ গলায় বলল ডেনি। 'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। গান-বাজনা আর অভিনয় করলে ধরা-বাঁধা চাকরির কি দরকার? তা মিয়ামি গেলেই কাজ জুটে যাবে বুঝলে কি করে?'

'জুটে যাবে বলিনি তো,' জবাব দিল গের্ডা। 'বলেছি আশা আছে। স্টেলার মত সুন্দরী মেয়ে থাকতে চিন্তা কি?' আবার হেসে উঠল সে। 'ওর চেহারাটাই তো একটা পুঁজি।'

'আর তোমার পুঁজি কি?' ব্যঙ্গ ভরে জানতে চাইল ডেনি। ঠাট্টা গায়ে মাখল না গের্ডা। হালকা গলায় বলল, 'স্টেলা অভিনয় করে। গান গায়। আমি ওর ড্রেসের দিকে খেয়াল রাখি। তাই না, স্টেলা?'

কিছু বলল না স্টেলা। অস্বস্তির ভঙ্গিতে নড়েচড়ে বসল, খাটো স্কার্টটা উঠে গেল কয়েক ইঞ্চি ওপরে। নির্লোম, ধবধবে উরুর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াল ডেনি। গের্ডা না থাকলে মেয়েটাকে নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যেত, ভাবল সে।

পোর্ট অরেঞ্জ পার হয়ে ইউ.এস হাইওয়ে ওয়ান-এ ঢুকে পড়ল গাড়ি। পুব উপকূলের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে ওরা, রাস্তা বাঁক

নিয়ে গেছে নিচু জলার মাঝখান দিয়ে। রাস্তার দু'পাশে ফলভরা ম্যান্ডারিন গাছ, গোলাপী ম্যালোর (লোমশ পাতাঅলা গাছ) সারি। দৃশ্যটা ভারি সুন্দর লাগল ডেনির।

নিউ স্মিরনাতে থামল ওরা পেট্রল নিতে। সন্ধ্যা নামছে দ্রুত, হলদে আভা গায়ে মেখে আকাশের তটরেখায় ডুব দিতে যাচ্ছে সূর্য। পায়ে খিঁচ ধরে গেছে একটানা গাড়ি চালিয়ে। দরজা খুলে নেমে পড়ল ডেনি। দেখাদেখি মেয়ে দুটিও। ট্রাকের লম্বা একটা সারি দেখল ওরা। আসছে এদিকেই। মেকানিককে জিজ্ঞেস করল ডেনি, এত ট্রাক লাইন বেঁধে আসার কারণ কি। 'হারিকেনের ভয়ে,' জবাব দিল মেকানিক। 'খবরে বলল খুব দ্রুত হামলা চালাবে ঝড়।'

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল ডেনির। 'ঝড়ের নিকুচি করি,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সে। 'আমি আজ রাতের মধ্যে মিয়ামি পৌঁছুবই। ঝড়ের বাবারও সাধ্য নেই আমাকে ঠেকায়। কি বলো?'

পেট্রল ভরা হয়ে গেছে, লোকটা গ্যাস ট্যাঙ্কের মুখ আটকে দিয়ে সিধে হলো। হোস পাইপটা ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'সে আপনার ইচ্ছে, স্যার। দুই ডলার দিন।'

ডেনি টাকা দিয়ে মোড়ে এসে দাঁড়াল। মেয়ে দুটি ট্রাকের যাওয়া দেখছে। ডেনি বলল, 'এই ট্রাকগুলো খামার থেকে আসছে। হারিকেনের ভয়ে।'

গের্ডা দৃঢ় গলায় বলল, 'সামান্য বৃষ্টি আর বাতাসের ধার ধারি না। অবশ্য গাড়িটা আপনার। সিদ্ধান্ত নেয়ার ভারও আপনার।'

'আমি ঠিক করেছি যাব।'

'আপনি নিশ্চয়ই আমাদের না খাইয়ে রাখবেন না, মি. মার্লিন।' হাসছে গের্ডা।

ভুরু কুঁচকে গেল ডেনির। 'কেন, তোমাদেরকে কি খাওয়ানোর কথাও ছিল আমার?'

গের্ডা পা বাড়াল গাড়ির দিকে। 'এমনি বললাম, ভুলে যান।'

ডেনি ফিরল স্টেলার দিকে। 'তোমার কিছু বলার আছে?'

ইতস্তত করে স্টেলা বলল, 'আমাদের এখন একটু টানাটানি চলছে...তবে খাবার আনতে হবে না। আমাদের খিদে পায়নি।'

এক মুহূর্ত কি ভাবল ডেনি। তারপর বলল, 'একটু দাঁড়াও। আসছি এখুনি।'

বাধা দিতে গেল স্টেলা, 'না, মি. মার্লিন...'

ডেনি ততক্ষণে হাঁটা দিয়েছে কফি শপের দিকে। স্টেলার ডাক শুনলেও কানে তুলল না। একটু পরে দুটো কাগজের ব্যাগ হাতে নিয়ে ফিরে এল। ব্যাগ দুটো ফেলল সীটের ওপর। বলল, 'এই নাও খাবার। আশা করি ফোর্ট পিয়ার্স পর্যন্ত এ দিয়েই চালাতে পারবে। তারপর ওখানে পেট পুরে খাব আমরা। চলো এখন। খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

নিউ স্মিরনা ছেড়ে এল ডেনি নিঃশব্দে। একটাও কথা বলল না। মেয়ে দুটি চিকেন স্যান্ডউইচ খেল ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে। গের্ডা বলল, 'আপনার কাছে একটা স্কচের বোতল ছিল না?'

বোতল নয়, ফ্লাস্ক। গের্ডার চোখ এড়ায়নি। ডেনি ফ্লাস্কটা কাঁধের ওপর দিয়ে পার করে দিল পেছনে। ভাবছে লম্বু খুব লোভী তো!

ইন্ডিয়ান রিভারের পাশ দিয়ে ওরা এখন চলেছে। সবে সন্ধ্যা নেমেছে, চিকমিক করছে নদীর পানি, ঢেউ উঠেছে। মাঝে মাঝে মনে হলো পানির ওপর জ্বলে উঠছে আলো। মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে গাড়ি চালাল ডেনি। মাথার ওপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে সাঁঝের আকাশে মিলিয়ে গেল একদল হেরন।

কাঠঠোকরারা টেলিফোন লাইনের ওপর বসে ছিল, হঠাৎ রকেটের গতিতে শূন্যে ঝাঁপ দিল।

'এই এলাকাটা ভারি সুন্দর,' ডেনি বলল স্টেলাকে। 'এখানে ছুটি কাটাতে এসে ভালই করেছি।'

'আপনি একা কেন?' জিজ্ঞেস করল স্টেলা। 'বউ-বাচ্চা নেই?'

'বিয়েই করিনি তার আবার বউ-বাচ্চা,' গলা ছেড়ে হেসে উঠল ডেনি।

'টাকা কামানোর ধান্ধায় ব্যস্ত ছিলাম এতদিন। জানো, গত দশ বছরে এই প্রথম সত্যিকার অর্থে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি আমি।'

গের্ডা ডেনির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'অনেক টাকা কামিয়েছেন?'

আবার হাসল ডেনি। 'অনেক। পাঁচ লাখ ডলার তো হবেই।'

টাকার অঙ্কটা শুনে দম বন্ধ হয়ে এল গের্ডার। ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে যেন। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর গের্ডাই নীরবতা ভাঙল। 'অত টাকা দিয়ে তো আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন।'

মুচকি হাসল ডেনি। 'তা তো পারিই।'

অস্ট্রেলিয়ান পাইন উইন্ডব্রেক দেয়া একটা রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল ওরা। উইন্ডব্রেকগুলো হঠাৎ ফুঁসে ওঠা বাতাসের ধাক্কায় দুলছে। স্টেলা বলল, 'দেখেছ, বাতাসের বেগ কি বেড়েছে? গাছগুলো কেমন নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে।'

'তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না,' অভয় দিল ডেনি। 'গাড়ির ভেতর আমরা নিরাপদেই থাকব।'

সূর্য আকাশে চাঁদের জায়গা করে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। আঁধার এখনও জেঁকে বসেনি পুরোপুরি। তবু

হেড-ল্যাম্প জ্বেলে দিল ডেনি। 'অন্ধকারে গাড়ি চালাতে ভাল লাগে আমার। বিশেষ করে এসব এলাকায়। নদীর দিকে তাকাও। মনে হচ্ছে না আগুন জ্বলছে?'

বাতাসের বেগ সত্যি বেড়েছে। বড় বড় ঢেউ উঠেছে নদীতে। মনে হচ্ছে ঢেউয়ের চুড়োয় আগুনের জিভ লকলক করছে। আসলে ওগুলো ফসফরাসের আলো। চন্দ্রালোকিত আকাশে ছোট ছোট মেঘ, একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় মশগুল। ছুটছে দুরন্ত গতিতে। কালো রঙের মেঘগুলো গ্রাস করতে চাইছে গোল থালার মত চাঁদ।

'ঝড় এলে প্রয়োজনে ফোর্ট পিয়ার্সে আশ্রয় নেব,' বলল ডেনি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। 'ভাল কথা, তোমাদের সাথে লাগেজ-টাগেজ নেই?'

'না,' জবাব দিল গের্ডা।

ডেনি কিছু না বলে চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল। নিজের ওপর বিরক্ত লাগছে এখন। ভাবছে এই ঝামেলাটা কাঁধে না নিলেই হত। মনে হচ্ছে এদের কারণে দুর্ভোগ আছে তার কপালে।

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা পড়ল উইন্ডস্ক্রিনে। সাথে সাথে যেন ঝপ করে নেমে এল আঁধার। হেডলাইটের শক্তিশালী দুটি আলোক রেখা উজ্জ্বল করে রেখেছে সামনের রাস্তা, আঙ্গুর আর লেবু গাছের সারির পাশ দিয়ে যাবার সময় ভুতুড়ে লাগল ওগুলোকে।

এঞ্জিনের মৃদু গোঙানি ছাড়িয়ে কানে ভেসে এল বাতাসের হুংকার, সেই সাথে প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ চমকে দিল ওদেরকে। বজ্রপাতের শব্দ মিলিয়ে না যেতেই শুরু হয়ে গেল ঝমঝম বৃষ্টি। ওয়াইপার চালু করে দিল ডেনি। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিতে সামনে কিছু দেখা যায় না। বাধ্য হয়ে গাড়ির গতি কমাতে হলো।

'আশা করি এরচে' বেশি জোরে বৃষ্টি আসবে না,' বলল ডেনি।

'আসবে,' বলল স্টেলা। 'এটা তো মাত্র শুরু।'

স্টেলার কথা শেষ না হতেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ তুলে ধেয়ে এল বাতাস, প্রবল ঝাঁকি খেল লিঙ্কন, প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল। এঞ্জিনে আরও গ্যাস ঢোকাল ডেনি, স্পিডোমিটারের কাঁটা বিশের ঘর ছুঁইছুঁই করছে।

'কোথাও থামা দরকার,' বলল ডেনি। 'নিউ স্মিরনাতে রাতটা কাটিয়ে গেলেই ভাল হত। তোমরা দেখো তো আশপাশে বাড়িঘরের হদিশ পাও কিনা। এই আবহাওয়ায় গাড়ি চালানো ঠিক হবে না।'

'থামবেন না,' চট করে বলল গের্ডা। 'ফোর্ট পিয়ার্স এখান থেকে মাত্র মাইল কুড়ি দূরে।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ডেনি। বিদুৎচমক তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। অন্ধকার আকাশ জুড়ে ফস করে জ্বলে উঠছে, সেকেন্ডের জন্যে রাস্তাঘাট গাছপালা আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে আবার নিভে যাচ্ছে। লিঙ্কন এখন প্রায় খুঁড়িয়ে চলছে, যদিও অ্যাকসিলেরেটরে পা দাবিয়ে রেখেছে ডেনি। ঘণ্টায় কমপক্ষে একশো মাইল বেগে বাতাস বইছে, ধারণা করল ও।

গাড়ির ছাদে উদ্দাম নাচছে বৃষ্টির ফোঁটা, বজ্রপাতের আওয়াজ ম্লান করে দিচ্ছে। বাতাস নয় যেন নেকড়ের ডাক। এত তীক্ষ্ণ শব্দ, হিম হয়ে যায় গা।

একটু পরপর ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। ডেনির মনে হলো বিদ্যুতের আলোয় এক পলকের জন্যে সে বাম দিকে একটা দালান দেখতে পেয়েছে। হাইওয়ে থেকে একটা সরু রাস্তা মোড় নিয়েছে বামে, হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সরু রাস্তাটাতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল ডেনি। 'ওদিকে একটা বাড়ি দেখেছি। ওখানে শেল্টার নেব।' দালানটার যতটা কাছে সম্ভব গাড়ি নিয়ে এল ডেনি, তারপর বন্ধ করে দিল এঞ্জিন।

'সাবধানে নামবেন,' উদ্বিগ্ন শোনাল স্টেলার কণ্ঠ। 'নইলে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

সাবধানে গাড়ির দরজা খুলল ডেনি। পিছলে নেমে এল গাড়ি থেকে, কুঁজো হয়ে আছে। বৃষ্টি এবং বাতাস হামলে পড়ল ওর ওপর। গাড়ির দরজা ধরা না থাকলে এখনই উড়ে যেত। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল ও কিছুক্ষণ, বাতাস আর বৃষ্টির বেগ সয়ে নিচ্ছে। মুহূর্তে কাক ভেজা হয়ে গেল ডেনি। তারপর, প্রকৃতির দুই মহাশক্তির সাথে লড়াই করতে করতে এগোল বাড়িটির দিকে।

বাড়িটির সবগুলো জানালা বন্ধ, সদর দরজায় দমাদম পিটতে লাগল ডেনি। ওর ভাগ্য ভাল এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে, বাতাসের ঝাপটা লাগছে না বললেই হয়। কড়া নেড়ে, দরজায় কিল-ঘুসি মেরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ডেনি। কেউ খুলছে না। শেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ও। এক পা পিছিয়ে এসে দড়াম করে লাথি মারল দরজার গায়ে। প্রথম লাথিতে ফাটল ধরল দরজায়, দ্বিতীয় লাথিতে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে ঢুকল ডেনি। অন্ধকার। বার দুই 'কেউ আছেন' বলে খামোকাই হাঁক ছাড়ল। সাড়া পেল না কোন। বৃষ্টি আর বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে নিজের ডাক নিজেই শুনতে পেল না।

পকেট থেকে সিগারেট লাইটার বের করল ডেনি, জ্বালল। হাতের কাছেই বিদ্যুৎ বাতির সুইচ চোখে পড়ল। জ্বেলে দিল বাতি। দেখল সাজানো গোছানো একটা লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে ও,

তিন দিকে তিনটি ঘর। চারপাশে দ্রুত একবার নজর বুলিয়েই বুঝতে পারল কেউ নেই বাড়িতে। সম্ভবত হারিকেনের ভয়ে ফোর্ট পিয়ার্সে গেছে এ বাড়ির বাসিন্দারা। তবে ঘরটা বেশ আরামদায়ক এবং সুসজ্জিত। এখন মেয়ে দুটোকে ভেতরে নিয়ে আসতে হবে।

আবার ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ডেনি, বহু কষ্টে পৌঁছাল গাড়িতে। বাড়িটির দিকে হাত তুলে দেখাল ও, তারপর স্টেলার হাত ধরল। এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল মেয়েটা, তারপর নেমে এল গাড়ি থেকে। ওকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে প্রচুর সময় লাগল ডেনির। বার দুই সদ্য তৈরি বৃষ্টির ডোবায় আছাড় খেল ওরা, কাদা আর পানিতে ভিজে সয়লাব।

ঘরে ঢুকে আলোর নিচে বৃষ্টিস্নাত স্টেলাকে দেখে রক্ত চলাচল দ্রুততর হয়ে উঠল ডেনির। ভেজা কাপড় গায়ের সাথে সেঁটে আছে স্টেলার, শরীরের প্রতিটি রেখা উদ্ভাসিত। সরু কোমরের নিচে ভারী নিতম্বের দুলুনি আর ভরাট দুই বুকের অপরূপ সৌন্দর্য যেন পাগল করে তুলল ডেনিকে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল সে। ঢোক গিলে বলল, 'তোমাকে দারুণ লাগছে।'

অন্য দিকে তাকাল স্টেলা। 'আমাকে দেখার দরকার নেই। দয়া করে গের্ডাকে নিয়ে আসুন।'

গের্ডাকে নিয়ে আসতে হলো না। সে নিজেই চলে এসেছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওদেরকে লক্ষ করেছিল সে চুপচাপ। ভেজা কাপড়ে তার পুরুষালী শরীরটা যেন আরও প্রকট ভাবে ফুটে উঠেছে। গের্ডা বলল, 'আমি গাড়ির দরজা বন্ধ করে এসেছি। বৃষ্টি ভেতরে ঢুকতে পারবে না।'

'আমাকে আবার গাড়িতে যেতে হবে,' জানাল ডেনি। 'সুটকেসটা নিয়ে আসা দরকার। ওতে গরম জামা-কাপড় আছে। সারারাত ভিজে কাপড়ে থাকতে পারব না।'

'আপনার সাথে আমিও যাই চলুন,' প্রস্তাব দিল গের্ডা। তারপর দু'জনে আবার নেমে এল ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির মাঝে। বাতাসের সাথে লড়াই করতে করতে এগুলো। ডেনি লক্ষ করল ঝড়ো বাতাস তেমন কাবু করতে পারছে না গের্ডাকে। বরং ডেনি একবার ডিগবাজি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল, গের্ডা ওকে ধরে ফেলল চট করে। মেয়েটার গায়ে কি শক্তি! দুজনে মিলে গাড়ি থেকে বের করল সুটকেস, বন্ধ করল দরজা। তারপর ফিরে এল বাড়িতে।

'তোমার গায়ে অনেক শক্তি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডেনি, জামার কলার চেপে পানি বের করছে।

জবাবে কিছু বলল না গের্ডা। অদৃশ্য হয়ে গেল রান্নাঘরে। লাউঞ্জে চলে এল ডেনি। ওখানে খালি একটা ঝাঁঝরির সামনে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিল স্টেলা। ডেনিকে দেখে ভেজা স্কার্টটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেয়েটা।

'এক ঢোক খেয়ে নাও,' স্কচের ফ্লাস্কটি এগিয়ে দিল ডেনি। 'নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' ও নিজেও কাঁপছে।

দু'জনেই স্কচ খেলো। বেশ ভাল লাগল গরম জিনিসটা পেটে যেতে।

'ভেজা জামা কাপড় ছেড়ে ফেলো।' মুচকি হাসল ডেনি। 'যদিও এতেও তোমাকে বেশ লাগছে।'

লালচে হয়ে উঠল স্টেলার চেহারা। 'আপনি মাঝে মাঝে আমাকে খুব অস্বস্তিতে ফেলে দেন, মি. মার্লিন। এটা ঠিক না।'

ডেনি আরেক ঢোক স্কচ পান করল। 'তোমাকে আমি অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না,' বলল সে। 'কিন্তু এত সুন্দর ফিগার, তুমিই বরং অন্যদের মাথা গরম করে দাও। এত মারাত্মক ফিগার থাকা ঠিক না।'

গের্ডা কিছু কাগজ আর লাকড়ি নিয়ে ঢুকল ভেতরে। 'ভেজা

জামাকাপড় খুলে ফেলো, স্টেলা। বাথরুমটা প্যাসেজের শেষ মাথায়। ইলেকট্রিক গিজারও আছে ওখানে। আমি চালু করে দিয়েছি। তোমার জন্যে কাপড়ের ব্যবস্থা করছি। জলদি।'

চলে গেল স্টেলা। গের্ডা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আগুন জ্বালাতে। কাগজ আর লাকড়ি দিয়ে দ্রুত আগুন জ্বেলে ফেলল সে ফায়ার প্লেসে। প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকে দেখল ডেনি। 'খুব কাজের মেয়ে দেখছি।'

ঘাড় ঘুরিয়ে ডেনির দিকে তাকাল গের্ডা। স্থির, সবুজ চোখ। 'আপনারও জামাকাপড় বদলানো দরকার। ভাল কথা, প্যান্ট্রিতে ঢুঁ মেরেছিলাম। কিছু খাবার চোখে পড়ল। রাতটা না খেয়ে কাটাতে হবে না।'

মাথা চুলকাল ডেনি। 'কিন্তু বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া এভাবে তাদের জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক হচ্ছে না।'

'আপনার সাথে আমার দর্শন মিলবে না।' ঘুরে দাঁড়াল গের্ডা, পা বাড়াল দরজার দিকে। 'আপনার তো অনেক টাকা, তাই না? ওখান থেকে কিছু ছাড়ুন না। জগতের এটাই নিয়ম। যার আছে তার বেশি বেশি দিতে হয়।'

গের্ডা চলে যাবার পরে দ্রুত ভেজা পোশাক খুলে ফেলল ডেনি। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ফ্লানেল ট্রাউজার আর সাদা সিল্কের শার্টের ওপর ভারী সোয়েটার চাপাল ডেনি। তারপর ভেজা কাপড়গুলো রেখে এল বাথরুমে।

গের্ডা টকটকে লাল রং-এর ড্রেসিং গাউন পরেছে, লম্বা পায়ে টার্কিশ স্লিপার। রান্না করছে। টেবিলের ওপর তিনটে বড় বড় ককটেল শেকার আর তিনটে গ্লাস।

একটা শেকার তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল ডেনি। 'আরে তুমি দেখছি রীতিমত পার্টির ব্যবস্থা করে ফেলেছ।'

গের্ডা ডেনির দিকে না তাকিয়েই হালকা গলায় বলল, 'আপনি স্টেলাকে খুব পছন্দ করেন, না?'

থমকে গেল ডেনি, একটা গ্লাস তুলতে যাচ্ছিল, হাতটা থেমে রইল ওখানে। 'মানে! কি বলতে চাও তুমি?' তীক্ষ্ণ শোনাল কণ্ঠ।

'কি বলতে চাই,' গের্ডা গ্রিলে আটকানো মাংসের বড় একটা টুকরো নড়াচড়া করছে আগুনের ওপর, 'তা আপনি ভাল করেই জানেন। ওর সঙ্গে শুতে চান?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল ডেনি। ককটেল ঢালল দুটো গ্লাসে, গ্লাস জোড়া নিয়ে চলে এল গের্ডার পেছনে। একটা রাখল ওর পাশে। 'এ ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নই আমি,' বলল সে। 'এরকম কথা যারা বলে বোঝাই যায় তারা কোত্থেকে এসেছে।'

গের্ডা নিজের গ্লাস তুলে চুমুক দিল। 'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না।'

নিজের ড্রিংকটা শেষ করল ডেনি, ঢালল আরেকটা। 'এ ধরনের বিষয় নিয়ে তোমার মত মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।' কর্কশ গলায় বলল সে। 'কারণ তুমি হচ্ছ থার্ডপার্টি। আর এ সব ব্যাপারে তোমার নাক গলাবার বা পরামর্শ দেয়ার কোন অধিকার নেই।'

গের্ডা গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে, প্যান্ট্রি থেকে ডিম আনার জন্যে পা বাড়াল। ফিরে এসে বলল, 'আমি বোধহয় আপনাকে ভুল বুঝেছি। সব পুরুষকে এক কাতারে ফেলা ঠিক নয়। তবে স্টেলাকে দেখে অনেক মেয়েরও মাথা ঠিক থাকে না।'

ঠাণ্ডা গলায় বলল ডেনি, 'তুমিও কি তাদের দলে?'

'ওহ্, নো। চাইলে ওরকম হতে পারতাম। কিন্তু ব্যাপারটা ভাবলেই ঘিনঘিন করে ওঠে গা। স্টেলা আমাকে খুব ভালবাসে।

তবে আমি ওর ভালবাসার অন্যায় সুযোগ নিই না।'

একটা সিগারেট ধরাল ডেনি। বলল, 'তুমি জানো তুমি দেখতে সুন্দর নও। তবে তোমাকে নিয়ে কখনও কটাক্ষ করে থাকলে ক্ষমা চাইছি।'

হাসল গের্ডা। 'ভণিতা করে কি লাভ? আমি খুব ভাল করেই জানি আপনি স্টেলাকে চাইছেন। আপনার প্রচুর টাকা। আর আমার ফুটো পয়সাও নেই। কিন্তু আমি টাকা চাই। যে কোন ভাবেই হোক আমাকে টাকা পেতে হবে। এখন বলুন, মি. মার্লিন, স্টেলাকে আজ রাতের জন্যে পেতে কত টাকা খরচ করতে পারবেন আপনি?'

ঝট করে এক পা এগিয়ে এল ডেনি গের্ডার দিকে। চেহারা লাল টকটকে। 'চুপ করো!' হিসিয়ে উঠল সে। 'তোমার নোংরা মুখ দিয়ে ওসব কথা আর উচ্চারণ করবে না। বুঝেছ?'

স্থির দাঁড়িয়ে রইল গের্ডা, ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে।

'বুঝেছি। বুঝেছি এ আপনার মনের কথা নয়।' একটা প্লেটে এক জোড়া ভাজা ডিম আর হ্যাম সাজিয়ে ডেনির হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'খেয়ে নিন। আমি যাচ্ছি। গোসল করা দরকার। তাছাড়া স্টেলাকেও তাড়া দিতে হবে।' চলে গেল গের্ডা। বেকুব হয়ে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল ডেনি।

গের্ডা বাথরুমে ঢুকে দেখল স্টেলা তখনও গোসল করছে। গের্ডাকে দেখে হাসল স্টেলা। 'আমি কি তোমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় রেখেছি, ডার্লিং?' জিজ্ঞেস করল সে, হাত দিয়ে বুক ঢাকল, শুয়ে পড়ল কনুইয়ে ভর দিয়ে।

ধবধবে সাদা শরীরটা দেখতে দেখতে বাথটাবের কোনায় বসল গের্ডা। 'না,' জবাব দিল সে। 'যতক্ষণ ইচ্ছে গোসল করো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

মুখে আঁধার ঘনাল স্টেলার। 'আবার কি চাও?'

'যাও। ওর সাথে খেলা করো গে। তোমাকে লোকটার খুব পছন্দ হয়েছে। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মাথা নাড়ল স্টেলা। 'না,' ঠোঁট কামড়াল সে। 'পারব না আমি—না!'

'পারতেই হবে। খুব সহজ কাজ। আমি বিছানায় ঢুকব আর তুমি ওর ঘরে চলে যাবে। বলবে ঝড়ো বাতাসে তোমার খুব ভয় লাগছে। একটু অভিনয় করলেই চলবে। লোকটা চাইছে শুরুটা তুমিই করো। তারপর আমি এসে পড়ব। তুমি ঘুমাতে যাবে। বেশি কিছু করতে হবে না তোমায়—ওকে একটু গরম করলেই...'

'না!' আবার বলল স্টেলা।

'অমত কোরো না, লক্ষ্মীটি,' তোয়াজের সুরে বলল গের্ডা। 'রাজি হয়ে যাও। তুমি রাজি হয়ে গেলে অনেকগুলো টাকা পাব আমরা। মিয়ামির সেরা হোটেলে থাকতে পারব, কিনতে পারব সবচে' দামী পোশাক। যা মন চায় তাই খেতে পারব।'

হাত দিয়ে মুখ ঢাকল স্টেলা। 'তারপর যখন টাকা ফুরিয়ে যাবে আবার আরেকজনের কাছে আমাকে বিক্রি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে তুমি। যেভাবে ডেটোনা বীচে করেছ, করেছ ব্রুকলিন এবং নিউ জার্সিতে। না-না-না!'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল গের্ডা। 'আমাদের একমাত্র পুঁজি তুমি। তুমিই আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছ। চাওনি? আমি কি তোমাকে আসতে বলেছিলাম? তোমার কি ধারণা আমি একা কাজ উদ্ধার করতে পারি না? আমি আগে কিভাবে কাজ করেছি যখন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে না? কাজ করতে আমি ভয় পাই না। আমার গায়ে শক্তি আছে, তোমার মত দুর্বল নই। তুমি আমার সাথে থাকতে চেয়েছ—তুমি সাহায্য না করলে কি আমি বাঁচব না?

তোমাকে সুখী করার জন্যে আমি কি না করেছি। সে সব কথা ভুলে গেলে? তুমি শুধু শরীরের কথা ভাবো। কেন, শরীরের কথা ভুলে যেতে পারো না?

বাথটাব থেকে নেমে এল স্টেলা, একটা তোয়ালে পেঁচাল গায়ে। অল্প অল্প কাঁপছে। 'আমাকে আর কতদিন এসব চালিয়ে যেতে হবে?' অভিমানী গলায় জানতে চাইল সে। 'তুমি কি আমায় আর ভালবাস না? এভাবে আমি ব্যবহার হয়ে চলেছি এতে তোমার কষ্ট হয় না?'

গের্ডা স্টেলাকে জড়িয়ে ধরল, আদর করতে শুরু করল। জানে কড়া ডোজের পর আদর করলে সব ভুলে যায় স্টেলা। ওর কথার অবাধ্য হয় না।

ডেনি খাওয়া শেষ করেছে, এমন সময় হালকা নীল একটা আলোয়ান গায়ে ঘরে ঢুকল স্টেলা। ফর্সা শরীরে দারুণ মানিয়েছে। আবার ককটেল মেশাচ্ছে ডেনি। ছ'টা পান করা শেষ, গরম হয়ে উঠছে গা। স্টেলাকে দেখে হাসল।

'কেমন বোধ করছ এখন?' জিজ্ঞেস করল ডেনি। 'তোমাকে চমৎকার লাগছে। নাও, একটা জিন এবং দু বটেল্স পান করো। চাঙা হয়ে উঠবে। রাঁধতে পারো? আমি পারি না। তোমার খাবার তোমার নিজেকেই বানিয়ে নিতে হবে।'

স্টেলা ড্রিংকটা নিল। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল রান্নার কাজে। 'আপনি গোসল করবেন না, মি. ব্লার্লিন?' জানতে চাইল সে। ডানে-বামে মাথা নাড়ল ডেনি। 'না।'

গ্রিলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল স্টেলা, ওটা গরম হয়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করছে। ডেনির দিকে পেছন ফিরে আছে ও, আলোয়ানটা একবার ঢিলে করল। তারপর, ফুটন্ত তেল যাতে আলোয়ানে না লাগে এমন ভান করে ওটা শক্ত করে গায়ে পেঁচিয়ে নিল।

ডেনি স্টেলার মেদহীন শরীরের শ্বাসরুদ্ধকর খাঁজ ভাঁজ দেখতে পাচ্ছে, গোল নিতম্বের কার্ভগুলো ওকে সাংঘাতিক উত্তেজিত করে তুলল। স্টেলা ভীষণভাবে টানছে ওকে। ঘুরে দাঁড়াল ডেনি, আরেকটা ড্রিংক নিল। 'তোমার কুৎসিত বান্ধবীটা কোথায়?' ফস করে প্রশ্ন করে বসল ও।

আড়ষ্ট হয়ে গেল স্টেলা। 'গের্ডা?' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ডেনির দিকে। 'ওকে কুৎসিত বললেন কেন?'

শ্রাগ করল ডেনি। 'সরি। ফরগেট ইট। আমি ভুলেই গেছিলাম ও তোমার বন্ধু।'

'গের্ডা গোসল করছে। সহজে বেরুবে না বাথরুম থেকে। গোসল করতে খুব ভালবাসে ও। বলেছে নিজেই নিজের সাপার বানিয়ে নেবে।'

'তোমার বয়স কত?' স্টোভের গায়ে হেলান দিল ডেনি। এবার স্টেলার চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। 'তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি একটি খুকু মণি।'

লাল হয়ে গেল স্টেলা। 'উনিশ। আগামী মাসে কুড়িতে পা দেব।'

'এরকম একটা জীবন যাপন করছ। খারাপ লাগে না? আসলে আমি জানতে চাইছি তোমাকে দেখাশোনার কেউ নেই? বাবা-মা?'

ডিম ভেঙে প্যানে ছেড়ে দিল স্টেলা। 'না। আমার কেউ নেই। আসলে এবারই আমরা ঝামেলায় পড়ে গেছিলাম। ভাড়া দিতে পারিনি বলে বাড়িউলি আমাদের জিনিসপত্র রেখে দিয়েছে।'

ডেনি সরে এল স্টেলার পাশে। 'এই মেয়েটা, গের্ডা, তোমার সঙ্গিনী হিসেবে তাকে মোটেই মানাচ্ছে না। সত্যি করে বলো তো, ওর জন্যে কখনও তোমায় ঝামেলায় পড়তে হয়নি?'

স্টেলা তাকাল ডেনির দিকে। চোখের তারায় রাগ ফুটিয়ে

তোলার চেষ্টা করছে। 'গের্ডা আমার খুব ভাল বন্ধু।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেনি, ঘুরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা মেলাতে পারছে না সে। স্টেলাকে তার ভবঘুরে আর সস্তা মনে হয়নি। অমন মেয়ে হতেই পারে না স্টেলা। তাহলে গের্ডা অমন প্রস্তাব দিল কিভাবে? সে কি করে ভাবল স্টেলা রাজি হয়ে যাবে? এমন কি হতে পারে যে স্টেলা ডেনিকে পছন্দ করতে শুরু করেছে? অনেকগুলো ককটেল গেলার কারণে খানিকটা মাতাল হয়ে পড়েছে ডেনি। তার মনে হচ্ছে স্টেলা আসলে তাকে পছন্দ করে। খুব মজা হয় স্টেলাকে নিয়ে এখন কেটে পড়লে। গের্ডা থাকুক এখানে।

স্টেলার পিছু পিছু ডাইনিং রুমে চলে এল ডেনি, বসল ওর বিপরীতে। স্টেলা খাচ্ছে, বসে বসে তাই দেখল। বাইরে ঝড়ো হাওয়া আর দমকা বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে দেয়ালে, থরথর করে কেঁপে উঠছে বাড়ি। স্টেলার খাওয়া শেষ হলে জোর করে প্লেট নিয়ে গেল ডেনি। ফিরে এল মেয়েটির জন্যে ককটেল-শেকার বানিয়ে। আগুনের ধারে, বড়, গদি আঁটা লম্বা বেঞ্চিতে বসে আছে স্টেলা। আলোয়ানটা খোলা, নগ্ন পা দেখা যাচ্ছে। পায়ের শব্দ পেয়ে আলোয়ানটা দ্রুত পেঁচিয়ে নিল গায়ে। কিন্তু এর মধ্যে যা দেখার দেখে ফেলেছে ডেনি।

ডেনি টের পেল ওর সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। সে আস্তে গিয়ে বসল স্টেলার পাশে।

স্টেলা বলল, 'ধনী হতে পারা খুব মজার, না?'

অবাক হলো ডেনি। 'অবশ্যই। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?'

'জানেন, কিছু কিছু লোকের কাছে টাকা অনেক কিছু। তবে আমার কাছে নয়। একবার এক লোকের কাছে একশো ডলারের একটা নোট দেখলাম। জীবনে ওই প্রথম একশো ডলারের নোট

দেখেছি আমি। টাকাটা পেয়ে লোকটার সেকি পাগলামি!'

হেসে উঠল ডেনি। হিপ পকেট থেকে পেট মোটা একটা ওয়ালেট বের করল। 'হাজার ডলারের নোট দেখেছ কখনও?' জিজ্ঞেস করল সে ওয়ালেট খুলতে খুলতে। 'আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি পাগলামি করছি?'

ওয়ালেট খুলে নোটের একটা তাড়া বের করল ডেনি। স্টেলাকে দেখাল ওতে আটটা এক হাজার ডলার এবং অনেকগুলো একশো ডলারের নোট আছে। অতগুলো টাকা দেখে চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল স্টেলার। 'ওহ্,' বলল সে, 'টাকাগুলো সরিয়ে রাখুন। এগুলো–'

এমন সময় গের্ডা পেছন থেকে নরম গলায় বলে উঠল, 'অনেক টাকা। এ টাকায় কয়েক মাস ভালভাবে থাকা যায়। লিঙ্কন রোডে গিয়ে যা মনে চায় তাই কেনা সম্ভব। অ্যালেন-এ খাওয়া, ডাচেসে যাওয়া...সব এ টাকায় সম্ভব। মিয়ামি আমাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে।'

পাঁই করে ঘুরল ডেনি, বন্ধ করে ফেলেছে ওয়ালেট। 'তুমি আবার উদয় হলে কোত্থেকে?'

গের্ডা তাকিয়ে রইল ওর দিকে। সবুজ চোখ নয় যেন কাঁচের টুকরো, কঠিন। তবে অভিব্যক্তিশূন্য। 'আপনি খুব ভাগ্যবান মানুষ, মি. মার্লিন।' বলল সে। 'আমি ঘুমাতে যাচ্ছি। কাল বোধহয় থেমে যাবে ঝড়। তারপর আমরা চলে যাব যে যার রাস্তায়। তবে আপনাকে কোনদিন ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।' দরজার দিকে পা বাড়াল সে, ঘুরে দাঁড়াল। 'গুড নাইট, মি. মার্লিন।' দরজা বন্ধ করে চলে গেল গের্ডা।

ডেনি তাকাল স্টেলার দিকে। 'ও কি বলে গেল–কোন দিন ভুলতে পারবে না। মানে কি এ কথার?'

স্টেলাকে ম্লান আর বিষণ্ন লাগল। 'জানি না আমি,' বলল সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দু'জনে। বাতাসের আর্তনাদ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। ডেনি চেষ্টাকৃত হাসি দিল। 'তোমার বান্ধবী ঘুমাতে গেছে। তুমি আরেকটা ড্রিংক নেবে?'

মাথা নাড়ল স্টেলা। নেবে না। চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ওর হাত ধরে ফেলল ডেনি। 'যেয়ো না,' বলল সে। 'তুমি জানো এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি। তোমার সাথে কথা বলতে চাই। তোমার মিষ্টি কণ্ঠটি শুনতে চাই।' ডেনি উঠে বাতি নিভিয়ে দিল। শুধু ফায়ার প্লেসের আগুনে আলোকিত হয়ে থাকল ঘর। সে বসল স্টেলার প্রায় গা ঘেঁষে।

'এখন আরও রোমান্টিক লাগছে না?' একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল স্টেলার হাতে। 'নাও। এটা খেয়ে নাও। রাত এমন কিছু বেশি হয়নি। তাছাড়া এখানে ক'দিনের জন্যে আটকা পড়ে গেছি কে জানে। পরস্পরকে জেনে নেয়ার এই সুযোগটা হারাই কেন?'

টেবিলের পাশে গ্লাসটা রেখে দিল স্টেলা। 'আমি যাই। সত্যি, মি. মার্লিন, আপনার সঙ্গে আমার থাকা সম্ভব নয়। এটা—এটা ঠিক না।'

'মিস্টার বাদ দাও। আমাকে স্রেফ ডেনি বলে ডাকতে পারো না? অচেনা এক লোকের বাড়িতে এমন ঝড়ের রাতে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, আগুনের সামনে বসে কথা বলছি। ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর লাগছে না তোমার কাছে? আমার কাছে তো রূপকথার মত মনে হচ্ছে।'

'আমি বুঝতে পারছি, ডেনি। কিন্তু আমার এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না। গের্ডা হয়তো—'

স্টেলার মাথার পেছনে হাত চালিয়ে দিল ডেনি, ঝুঁকে এল ওর দিকে। 'গের্ডা গোল্লায় যাক। একটা ঘণ্টা অন্তত সময়টাকে স্থির করে দিতে পারো না? তোমাকে ভালবাসি এই কথাটা আমাকে বলতে দাও। বলতে দাও এই কুৎসিত পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র সুন্দর মানবী। তোমার সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হয়ে গেছে ঝড়ের শক্তি। আমার দিকে তাকাও, স্টেলা। একটা ঘণ্টার জন্যে কি আমরা রূপকথার রাজ্য থেকে ঘুরে আসতে পারি না? তুমি কি ভুলে যেতে পারো না কে তুমি আর কে আমি। এই পৃথিবীকে ভুলে আমার সাথে আসতে পারো না?' স্টেলাকে নিজের কাছে টেনে আনল ডেনি। ভয়ে কাঁপছে মেয়েটা, কাঁপতে কাঁপতেই নিজেকে সমর্পণ করল ডেনির কাছে।

ডেনি স্টেলার নরম অধরে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল, সেই মুহূর্তে স্টেলাকে একান্তভাবে পাবার প্রচণ্ড ইচ্ছে জেগে উঠল মনে। বাতাসের শোঁ শোঁ, বজ্রপাতের গুড়ুম গুড়ুম কোন কিছুই এখন তার কানে যাচ্ছে না। এত তীব্র আকর্ষণ সে কোনদিন অনুভব করেনি কোন মেয়ের প্রতি। আলোয়ানের বাঁধন আলগা করল স্টেলা, কাঁধ থেকে খসে পড়তে দিল ওটাকে।

অন্ধকার ছায়ার মত ঘরে ঢুকল গের্ডা, দাঁড়াল ওদের পেছনে। আগুনের শিখা ওর চোখে প্রতিচ্ছবি ফেলেছে, ডেনির কাঁধের ওপর থেকে সঙ্গিনীকে দেখে ফেলল স্টেলা। মুখ হাঁ হয়ে গেল তার, চিৎকার করছে গের্ডাকে হাতে কি একটা তুলতে দেখে। ঝিলিক দিয়ে উঠেছে জিনিসটা আগুনে।

স্টেলা শরীরের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল ডেনিকে। তার আগেই ঝিলিক মেরে ওঠা জিনিসটা বিদ্যুৎগতিতে নেমে এল ডেনির গলা লক্ষ্য করে, খক্ করে কেশে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে স্টেলার বুকের ওপর। জান্তব চিৎকার দিয়ে

ডেনিকে মেঝের ওপর ঠেলে ফেলে দিল স্টেলা, হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল।

'এ কি করলে তুমি!' চেঁচাচ্ছে সে গের্ডার দিকে তাকিয়ে। 'এ কি সর্বনাশ করলে!' টলতে টলতে বাতির ধারে গেল স্টেলা, অন করল সুইচ।

ভাঙা 'দ' হয়ে পড়ে আছে ডেনি, কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করছে। একটা লম্বা, সরু ব্লেডের টেবিল-নাইফ তার ঘাড়ের গভীরে গেঁথে আছে। শুধু রূপোলি বাঁটটা বেরিয়ে রয়েছে। দৃশ্যটা দেখে তীব্র আতঙ্কে মুখে হাত চাপা দিল স্টেলা।

ডেনির সাদা শার্ট লাল হয়ে গেছে রক্তে, এখন মেঝেতে গড়িয়ে পড়ছে। ছুরির বাঁটটা ধরার চেষ্টা করছে ডেনি, যেন এখনও বিশ্বাস হতে চাইছে না মারা যাচ্ছে সে। খুবই নিচু গলায়, গোঙাতে গোঙাতে সে গের্ডাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে মারলে?'

গের্ডা কিছু বলল না। সে স্থির দৃষ্টিতে রক্তের লাল ফিতেটাকে দেখছে। ওটা ক্রীম রঙের কার্পেটটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

'তোমাদের বিশ্বাস করে কি যে ভুল করেছি আমি,' হাঁপাচ্ছে ডেনি। 'টাকার জন্যেই আমাকে মেরেছ বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমাদেরকে তো আমার অমন কিছু মনে হয়নি। আমাকে মেরে কি লাভ তোমার? ওভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? একটা ডাক্তার ডাকো। নইলে রক্তক্ষরণেই আমি মারা যাব।'

'হ্যাঁ।' হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচিয়ে উঠল স্টেলা। 'ডাক্তার ডেকে আনো। ফর গডস সেক!'

দাবড়ি লাগাল গের্ডা। 'শাট আপ!' সে মুখ কুঁচকে সরে গেল ডেনির পাশ থেকে।

'তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?' আতঙ্ক ফুটে উঠল ডেনির

চোখে। 'আমাকে বাঁচাও! ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না। দেখছ না রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছি আমি?'

স্টেলা বেঞ্চির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কেঁদে ফেলল হু হু করে। বাইরে, বাতাসের দাপাদাপি চলছে, সেই সাথে বজ্রপাতের শব্দ আর ছাদে বৃষ্টির আওয়াজ। গের্ডা দ্রুত পা ফেলে চলে এল স্টেলার কাছে। চুলের মুঠি ধরে মুখটা উঁচু করল, তারপর প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারল।

থাপ্পর খেয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল স্টেলার, থেমে গেছে কান্না। 'তোমাকে চুপ থাকতে বলেছি,' হিসিয়ে উঠল গের্ডা। 'কথা কানে যায় না?'

অনেক কষ্টে হাঁটু মুড়ে বসল ডেনি, তারপর একটা চেয়ার ধরে টলতে টলতে সিধে হলো। 'আমাকে বাঁচাও, স্টেলা,' ফোঁপাচ্ছে ও। 'আমাকে মরতে দিয়ো না, স্টেলা–বাঁচাও আমাকে।'

ছুরির হাতলটা ধরল ডেনি, টেনে বের করার চেষ্টা করল। তীব্র ব্যথা ঘাঁই মারল শরীরে। সহ্য করতে না পেরে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ও।

স্টেলা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। একটু পর ফিরে এল তোয়ালে নিয়ে। 'এটা নাও,' উন্মাদের মত বলল সে গের্ডাকে। 'এটা দিয়ে চেপে রক্ত থামাও।'

গের্ডা একটানে তোয়ালেটা ছিনিয়ে নিল স্টেলার হাত থেকে, দুপদাপ পা ফেলে এগিয়ে গেল ডেনির কাছে। ছুরির বাঁটটা ধরল শক্ত হাতে, টান মেরে ছুটিয়ে আনল ক্ষত থেকে। ঘর ফাটিয়ে চিৎকার দিল ডেনি, ঘাড় থেকে ঝর্নার মত কলকল করে বেরোতে লাগল রক্ত। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও মেঝেতে, খামচে ধরল রক্তাক্ত কার্পেট।

কাটা মুরগীর মত পা দাপাল খানিকক্ষণ, তারপর স্থির হয়ে গেল। এখনও সমানে রক্ত বেরুচ্ছে ঘাড় বেয়ে। তারপর এক সময় প্রবাহটা ধীর হয়ে এল, বন্ধ হয়ে গেল রক্ত পড়া।

মেয়ে দুটি দেখছিল ডেনিকে। আতঙ্কিত স্টেলা চোখ সরাতে পারছে না।

প্রথমে কথা বলল গের্ডাই, 'মারা গেছে ও। তুমি এখন কিচেনে যাও।'

স্টেলা দৌড়ে এল। 'না। তুমি কি করবে আমি ভাল করেই জানি। ওর টাকা নিয়ে নেবে। এজন্যেই ওকে খুন করেছ।'

'ওর এখন আর টাকার দরকার নেই,' বলল গের্ডা। 'তুমি পাশের ঘরে যাও। নইলে কিন্তু খুব রাগ করব।'

স্টেলা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। ও চলে যেতেই কাজে লেগে পড়ল গের্ডা। খুব সাবধানে ডেনিকে ডিঙাল ও, কার্পেটের রক্ত যেন পায়ে না লাগে। তারপর ডেনির হিপ পকেট থেকে বের করল ওয়ালেট। সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে ওয়ালেটটা রেখে দিল যথাস্থানে। নোটের তাড়ার দিকে তাকিয়ে রইল গের্ডা। টাকাগুলো মুঠো পাকাল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা। অবশেষে আমি মুক্ত, ভাবছে গের্ডা। আর অভাব স্পর্শ করতে পারবে না আমাকে।

স্টেলাকে কিচেনে পেল গের্ডা। নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছে, কাঁপছে। ওর দিকে মনোযোগ না দিয়ে আধ শুকানো জামাকাপড় পরতে লাগল গের্ডা। টাকার বান্ডিলটা ঢোকাল ট্রাউজারের পকেটে, নোংরা কালো সোয়েটারটা গায়ে চাপিয়ে ফিরল স্টেলার দিকে। 'কাপড় পরে নাও এখুনি,' হুকুম করল ও। 'আর প্যানপ্যানানি বন্ধ করো। কেঁদে কোন ফায়দা হবে না।'

স্টেলা ফিরেও চাইল না। মেজাজ হারাল গের্ডা, স্টেলাকে

এক ঝটকায় চেয়ার থেকে উঠিয়ে রীতিমত ঝাঁকি দিতে শুরু করল। 'জামাকাপড় পরতে বলেছি, গাধা মেয়ে,' চেঁচাল সে। 'কথা কানে যায় না?'

ফাঁকা চোখে গের্ডাকে দেখল স্টেলা, নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল।

ওকে ছাড়ল না গের্ডা, এক টানে আলোয়ান খুলে ফেলল গা থেকে, তারপর জোর করে কাপড় পরাতে লাগল। আর জোরাজুরি করল না স্টেলা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তবে সারাক্ষণ ফুঁপিয়েই চলল। স্টেলাকে জামা পরিয়ে আবার ঝাঁকি দিল। কিন্তু স্টেলা যেন সমস্ত বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। সাড়া মিলল না। ওকে দিয়ে কাজ হবে না বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিল গের্ডা।

স্টেলাকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানেই থাকো। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবে না।'

সদর দরজা খুলল গের্ডা। এখনও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, তবে কমে এসেছে বাতাসের বেগ। সাহস করে বাইরে এল গের্ডা। দেখল হাঁটতে তেমন বেগ পেতে হচ্ছে না।

আবার বাড়িতে ঢুকল গের্ডা। ডেনির জামাকাপড়গুলো জড়ো করল। ওগুলো সহ সুটকেসটা নিয়ে গেল গাড়িতে। পেছনের সীট থেকে বড় একটা কম্বল নিয়ে ফিরে এল লাউঞ্জে। কম্বলটা দিয়ে মুড়ে দিল ডেনিকে, তারপর পা ধরে টানতে টানতে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। লিঙ্কনের পেছনের দরজা খুলে ডেনির লাশ ঢোকাল ভেতরে। কাজটা করতে সময় লাগল প্রচুর।

একদম ভিজে গেছে গের্ডা, জামাকাপড় লেপ্টে আছে গায়ে। ডেনিকে গাড়িতে তুলতে জান বেরিয়ে গেছে তার। কয়েক ঢোক হুইস্কি গেলার পরে একটু চাঙা লাগল।

এখন পর্যন্ত সব ভালয় ভালয় মিটেছে, মনে মনে ভাবল গের্ডা। ঘরের চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে। ঘরের এমন দশা রেখে কেটে পড়ার সাহস পাচ্ছে না গের্ডা। যাবার আগে সমস্ত প্রমাণ তাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। লিঙ্কনের রানিং বোর্ডে গ্যাসোলিনের অতিরিক্ত একটা ক্যান দেখেছে গের্ডা। ওটা নিয়ে এল। ক্যানটা লাউঞ্জে রেখে ঢুকল কিচেনে।

স্টেলা আগের মতই বসে আছে চেয়ারে। কান্না থেমেছে। তবে মাঝে মাঝেই শিউরে উঠছে। 'এখন চলে যাব,' জানাল গের্ডা ওকে। 'খোদার দোহাই উঠে পড়ো।'

'লিভ মি–গো অ্যাওয়ে! লোকটা বলেছিল তুমি ভাল মানুষ নও। আমি বিশ্বাস করিনি তার কথা। আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল সে। ওহ্, এমন কাজ তুমি কি করে করতে পারলে?' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আবার কাঁদতে লাগল স্টেলা।

গের্ডার চেহারায় হঠাৎ অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে উঠল। ওকে ভীষণ কুৎসিত আর বুড়ি লাগছে। বলল, 'টাকাটা শুধু আমার জন্যে নিইনি, তোমার জন্যেও নিয়েছি। আমরা এখন ধনী হতে পারব, স্টেলা। আমাদের আর আস্তাকুড়ের খাবার খেতে হবে না। কোন পুরুষের সাথে তোমার আর ছলনাও করতে হবে না। ওই সবই এখন থেকে অতীত। এর কি কোন মূল্য নেই?'

'তুমি এত নিরুদ্বেগে কথা বলছ কি করে? একটা লোককে মেরে ফেলেছ। তোমার কোন অনুতাপ হচ্ছে না? তোমার হৃদয় কি এতই পাষাণ যে নিজের কৃতকর্মের জন্যে ভয় হচ্ছে না, কষ্ট পাচ্ছ না?'

'লাশটাকে গাড়িতে রেখে এসেছি,' বলল গের্ডা। 'নদীতে লাশ

সহ গাড়ি ফেলে দেব। খুব গভীর নদী। লোকটার আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। তারপর আরেকটা গাড়ি চড়ে মিয়ামি চলে যাব। তারপর লোকটার টাকা দিয়ে উপভোগ করব জীবন।'

কটমট করে গের্ডার দিকে তাকাল স্টেলা। 'সেরকমই ইচ্ছে বুঝি তোমার? বাড়িটার কি হবে? রক্তের দাগ?'

'বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেব। লোকে ভাববে বাজ পড়ে পুড়ে গেছে।'

মুখ সাদা হয়ে গেল স্টেলার। 'ডেনি ঠিকই বলেছিল। তুমি আসলেই একটা ডাইনী। নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝো না। যাও, যা খুশি করোগে। আমি তোমাকে বাধা দেব না। তবে তোমার সাথে কোথাও যাচ্ছি না আমি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব তাও ভাল। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর নয়। তোমার চেহারাও আর দেখতে চাই না।'

চিন্তিত চেহারা নিয়ে স্টেলার দিকে তাকাল গের্ডা। 'কিন্তু আমি তা তোমাকে করতে দিতে পারি না। তুমি কারও কাছে মুখ খুলতে পারো। তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি, স্টেলা। তবে আমারও ধৈর্যের সীমা আছে।' গের্ডার গলা অস্বাভাবিক শান্ত, তবে চোখ জোড়া জ্বলছে জ্বলজ্বল করে।

মাথা নেড়ে স্টেলা বলল, 'আমি কারও কাছে মুখ খুলব না। সে ভয় তোমাকে পেতে হবে না। আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। প্রার্থনা করি তোমার সাথে যেন আর কোনদিন দেখা না হয়।'

স্টেলা এখন অনেকটাই শান্ত। ওর একমাত্র চিন্তা গের্ডার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে সে।

হাত বাড়িয়ে দিল গের্ডা। 'আমরা তো বন্ধু ছিলাম। যাবার আগে হ্যান্ডশেক করে যাও। জানি আমি ভুল করেছি। কিন্তু...'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'যাক, যা গেছে গেছে। এসো, স্টেলা। আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাও।'

সামান্য ইতস্তত করল স্টেলা; দরজার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল, ফিরে এল আবার। 'খোদা তোমার সহায় হোন, গের্ডা।'

হাত নয়, স্টেলার নরম গলা ইস্পাতের হুক যেন আটকে ধরল। দু'হাতে ওর গলা চেপে ধরেছে গের্ডা। হিসহিস করে বলল, 'গাধা মেয়ে। ভেবেছিস তোকে আমি বিশ্বাস করব? তুই যে আমার খুনের কথা বলে দিবি তা আমি জানি না ভেবেছিস? আমার সাথে তুই আর না থাকলে কি যায় আসে? আমার আট হাজার ডলারে ভাগ বসানোর জন্যে তোর মত শত শত মেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। তুই তোর ডেনি নাগরের কাছে যা। যা!'

স্টেলাকে ল্যাং মেরে মেঝের ওপর ফেলে দিল গের্ডা, বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে আছে গলা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল স্টেলার বুকে। স্টেলা প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করছে কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছে না। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে শক্তি। প্রচণ্ড শক্তিতে স্টেলার গলা চেপে ধরে রাখল গের্ডা। কয়েক মিনিটের মধ্যে নেতিয়ে পড়ল স্টেলা। স্থির হয়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গের্ডার দিকে।

ওকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গের্ডা হাঁপাতে হাঁপাতে। আঙুল ব্যথা করছে। স্টেলার দিকে তাকাল ও। দুঃখ লাগল নিষ্পাপ মুখখানার দিকে তাকিয়ে, তাও এক মুহূর্তের জন্যে। বাতাস থেমে গেছে। ওর এখনও প্রচুর কাজ পড়ে আছে। প্রতিটি সেকেন্ড এখন মূল্যবান।

স্টেলার লাশ পাঁজাকোলা করে তুলে নিল গের্ডা। তারপর

প্রায় ছুটে চলে এল গাড়িতে। ডেনির গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলল স্টেলাকে, বন্ধ করল দরজা, আবার দৌড়ে ঢুকল বাড়িতে। খুব দ্রুত সব ক'টা ঘরে গ্যাসোলিন ছিটিয়ে দিল গের্ডা। যখন বেরিয়ে এল ততক্ষণে জানালার গরাদ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে। রাস্তার শেষ মাথায় গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল গের্ডা, তাকাল পেছন ফিরে। দাউ দাউ জ্বলছে বাড়িটা। ছাদ যেন ফুটো করে আগুনের লম্বা জিভ বেরিয়ে পড়ছে, কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ ছুটে আসছে ওর দিকে। সন্তুষ্ট বোধ করল গের্ডা। অল্প সময়ের ভেতরে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বাড়ি। সে হাইওয়েের দিকে গাড়ি ছোটাল।

এখনও বৃষ্টি পড়ছে তবে মরে গেছে বাতাস। দূরে ফোর্ট পিয়ার্সের আলো নজরে এল। দরকার হলে হেঁটে পৌঁছুবে সে ওখানে, সিদ্ধান্ত নিল গের্ডা।

ইন্ডিয়ান রিভার আঁধারেও জ্বলছে, গাড়ি চালাতে চালাতে পছন্দসই স্পট খুঁজছে গের্ডা। পেয়েও গেল একটা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ও। লম্বা, টানা হাইওয়েের দিকে তাকাল। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। লিঙ্কনের পেছন দিকে ফিরে চাইতে সাহস হলো না, হ্যান্ড থ্রটল অ্যাডজাস্ট করার সময় কেঁপে উঠল গের্ডা। রানিং বোর্ডে দাঁড়িয়ে গিয়ার অ্যাডজাস্ট করল, গাড়িটা সামনের দিকে লাফ মারতেই চট করে গাড়ি ছেড়ে সরে এল গের্ডা। দেখছে গাড়ি এবং তার যাত্রীদের অন্তিম দশা।

ঢালু তীরে পৌঁছে যেন ইতস্তত করল লিঙ্কন, তারপর ডিগবাজি খেয়ে পড়তে লাগল। দৌড়ে গেল গের্ডা। আগুন ধরে গেছে গাড়িতে ডিগবাজি খাওয়ার সময়। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল লিঙ্কন, ডুবে গেল নদীতে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে গের্ডা। কোন গাড়ি পেলে লিফট চাইবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্রাক আসতে দেখল।

এতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করেছে ও। ঠাণ্ডা লাগছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে জামাকাপড় ভেজা। সেঁটে আছে গায়ের সঙ্গে। রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল গের্ডা। হাত তুলল। থামতে বলছে ট্রাকটাকে। ব্রেক কষল ট্রাক। দৌড়ে গেল গের্ডা।

ড্রাইভার উঁকি দিল। তবে তার চেহারাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

'ফোর্ট পিয়ার্সে যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল গের্ডা, ট্রাক ড্রাইভারের চেহারা দেখার চেষ্টা করছে। 'আমাকে একটা লিফট দেবেন?'

'অবশ্যই,' দরজা খুলে দিল ড্রাইভার। 'উঠে পড়ুন।'

ড্রাইভারের পাশে বসল গের্ডা। সাথে সাথে ছেড়ে দিল গাড়ি। ড্রাইভার বিশালদেহী। ঘন দাড়ি গোঁফ মুখে। বানরের মত লাগছে দেখতে। ড্রাইভারও আড়চোখে ওকে লক্ষ করছে, খেয়াল করল গের্ডা।

'কোত্থেকে আসছেন?' ঘড়ঘড়ে, কর্কশ গলা ড্রাইভারের।

'ডেটোনা বীচ থেকে।' দু'হাতের তালু ঘষল গের্ডা, শীতে কাঁপছে। 'ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেছিলাম। এক জায়গায় থেমেছি কিছুক্ষণ। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করেছি।'

'হাহ্,' থু করে একদলা থুথু ফেলল ড্রাইভার রাস্তায়।

'আসার পথে একটা বাড়ি দেখলাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাজটাজ পড়েছে বোধহয়।'

গের্ডা কিছু বলল না। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। ঘুম আসছে।

'এরকম একটা জায়গায় একা একা হাঁটছিলেন। ভয় করেনি?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

শরীর শক্ত হয়ে গেল গের্ডার। 'আমার ভয়ডর কম,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও। 'এক লোক আমার সাথে একবার ফাজলামি

করার চেষ্টা করেছিল। এখনও সে সেদিনের কথা মনে পড়লে আঁতকে ওঠে।'

'খুব কঠিন মানুষ, অ্যাঁ?' খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল ড্রাইভার। 'কঠিন মেয়েমানুষই আমার পছন্দ।'

'মেয়েদের কঠিন হওয়াই দরকার, নয় কি?' হালকা গলায় বলল গের্ডা।

আবার বিশ্রী ভঙ্গিতে হেসে উঠল ড্রাইভার। 'বেশ, বেশ। কি রকম কঠিন মেয়ে তুমি, দেখি।' ব্রেক কষল সে। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ট্রাক। 'ট্রাকের পেছনে চলো খানিকখনের জন্যে।'

'এ সব ফাজলামি পছন্দ করি না আমি,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল গের্ডা। 'গাড়ি ছাড়ো। ফোর্ট পিয়ার্সে পৌঁছে দাও। উপযুক্ত ভাড়া পাবে।'

ঝট করে ঘুরল ড্রাইভার। 'আচ্ছা?' ভয়ঙ্কর শোনাল তার কণ্ঠ। 'মেয়েদের এত তেজ আমার সহ্য হয় না। জলদি ট্রাকের পেছনে যাও। নইলে কপালে তোমার খারাবি আছে। আমি তোমাকে যা দেব তা তোমার নিতে হবে। কথা দিচ্ছি মন্দ লাগবে না তোমার।'

গের্ডা খুলে ফেলল দরজা। 'গোল্লায় যাও তুমি,' বলে নেমে পড়ল ট্রাক থেকে। দু'কদমও এগোতে পারেনি, হাঁটুর পেছনে প্রচণ্ড বাড়ি খেল ও, ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। এত জোরে লেগেছে, কয়েক মিনিট মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। নড়াচড়ার শক্তিও নেই। চোখ বুজে ছিল গের্ডা, টের পেল শক্তিশালী এক জোড়া হাত ওকে টেনে তুলছে। চোখ মেলে চাইল। ড্রাইভার। দাঁত বের করে হাসছে। গের্ডা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রাকের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওকে। 'কেমন লাগল?' ড্রাইভার ঝুঁকে এল

গের্ডার মুখের ওপর।

গের্ডা বুঝতে পারল ট্রাকের পেছনে ওকে নিয়ে এসেছে ড্রাইভার। কয়েক মুহূর্ত ও কথা বলতে পারল না। হাঁপাতেই লাগল।

'কি, খেলবে? নাকি আরও কয়েক ঘা লাগাব?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

গের্ডা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ঠিক আছে। তুমিই জিতলে। আমাকে একটু সুস্থির হতে দাও।'

ড্রাইভার সরে এল, ট্রাকের দরজার সামনে দাঁড়াল যাতে গের্ডা পালিয়ে যেতে না পারে। 'তাহলে যতটা কঠিন ভেবেছিলাম ততটা তুমি নও, অ্যাঁ?' বলল সে।

গের্ডা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ব্যথায় ঝন ঝন করছে শরীর। সিধে হয়েও কিছুক্ষণ হাঁপাল। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড ঘুসি তুলল ড্রাইভারের মুখে।

ড্রাইভার প্রস্তুত ছিল। চট করে মাথাটা সরিয়ে নিল সে একপাশে। গের্ডার ঘুসি তার কানে লাগল। সাথে সাথে ভীষণ থাবড়া খেলো গের্ডা মুখে। ঘুরে পড়ে গেল ও। ভয় পেল গের্ডা এই লোক সহজ পাত্র নয় বুঝতে পেরে।

ড্রাইভার এবার মারতে শুরু করল গের্ডাকে। চড় আর থাবড়ার আঘাতে দরদর করে জল ঝরতে শুরু করল চোখ বেয়ে। গের্ডা বৃথাই হাত তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। এবার লোহার মত তর্জনী দিয়ে ভয়ানক গুঁতো মেরে বসল ড্রাইভার গের্ডার পেটে। ব্যথায় দুনিয়া আঁধার হয়ে এল। কেঁদে উঠল গের্ডা। 'এবার হয়েছে?' আরও গোটাকতক চড় মারার পর জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

ব্যথায় কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে গের্ডা। নিঃসাড়

পড়ে আছে। জানে এবার চূড়ান্ত হামলা আসবে। টের পেল কর্কশ একজোড়া হাত ওর শরীরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, জামা কাপড় খুলে নগ্ন করে ফেলেছে ওকে। কিন্তু বাধা দিতে পারল না গের্ডা। লাল নীল ফুলকি দেখছে সে চোখে, মগজে আগুন ধরে গেছে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল গের্ডা। মনে হলো অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে। শুনল ড্রাইভার বলছে 'ওয়াও!' দারুণ হতাশ বোধ করল গের্ডা ড্রাইভার ওর টাকার বান্ডিলটা পেয়ে গেছে বুঝতে পেরে।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল গের্ডা, হাত বাড়াল টাকাটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। কিন্তু ড্রাইভার ওর চেয়ে অনেক চালাক। গের্ডাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল সে, সিধে হলো।

'এ জিনিস কোথায় পেলে?' চেঁচিয়ে বলল ড্রাইভার, নোট ধরা হাতটা কাঁপছে।

'ওটা আমার টাকা। দিয়ে দাও।'

'তাই নাকি? প্রমাণ কি তোমার টাকা?'

'আমি বলছি আমার টাকা,' রাগে দুঃখে কেঁদে ফেলল গের্ডা। 'দিয়ে দাও বলছি।'

নোটগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল ড্রাইভারের পকেটে। 'এ টাকা তুমি নিশ্চয়ই কারও কাছ থেকে মেরে এনেছ। সেই জ্বলন্ত বাড়িটা থেকে টাকাটা পেয়েছ কিনা খোদা জানে। তোমার মত ফকিরনীর কাছে তো এত টাকা থাকার কথা নয়।'

গের্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্রাইভারের ওপর, নখ ঢুকিয়ে দিতে চাইল চোখে। গের্ডার দু'চোখের মাঝখানে প্রচণ্ড ঘুসি মারল ড্রাইভার, ফ্লোরবোর্ডে ছিটকে পড়ল মেয়েটা। ওকে লাথি মেরে ফেলে দিল ট্রাক থেকে। ধুপ করে কাদার মধ্যে পড়ে গেল

গের্ডা। চোখে আবার লাল-নীল ফুলকি দেখল।

গের্ডার পাশে লাফিয়ে নামল ড্রাইভার। গলা বাড়িয়ে বলল, 'টাকা ফেরত চাইলে ফোর্ট পিয়ার্সে গিয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ কোরো। ওরা হয়তো তোমাকে টাকা দিয়ে দেবে।' হা হা করে হেসে উঠল সে। লাফ মেরে উঠে পড়ল ট্রাকে। তারপর ছেড়ে দিল ট্রাক।

মূলঃ জেমস হ্যাডলি চেজ
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

ঈশ্বরের অপেক্ষায়

তিন দিন ধরে ওই শৈলশিরাটার ওপর বসে রয়েছে সে। মনে হয় না একটিবারের জন্যেও সরেছে। কাজ করতে যেতে হয় আমাকে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতবারই সেদিকে চোখ পড়েছে, দেখেছি ও আছে। কালো পোশাক পরা একটা মূর্তি, তার পিছনে উঠে যাওয়া দানবীয় পাহাড়-চূড়াটার পটভূমিতে হাস্যকর রকম ক্ষুদ্র।

কখনও বা উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে। কখনও হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনার ভঙ্গিতে, মাথাটা ঝুলে পড়ে বুকের ওপর। বাকি সময় বসে থাকে ছোট একটা পাথরের ওপর।

তিন দিন ধরে একই কাণ্ড করছে। সম্ভবত রাতেও তাই করে। সন্ধ্যায় যখন ঘরে ঢুকি তখনও দেখি আছে, ভোরে যখন ঘর থেকে বেরোই, তখনও আছে। দু'একবার ওর কাছে যাওয়ার কথা ভেবেছি। কিন্তু জানি তাতে কোনও লাভ হবে না। আমি যে আছি, জলজ্যান্ত একজন মানুষ, এটাই হয়তো তার নজরে পড়বে না। অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতা যেন দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করে ঘিরে রেখেছে তাকে, যা ভেদ করার সাধ্য কোনও মানুষের নেই। ঈশ্বরের কাছে দরখাস্ত করে বসে আছে সে, কখন তার কেসটা বিবেচনা করবেন ঈশ্বর সেই অপেক্ষায়।

এক

আমি কাহিনিকার নই, গল্প বলতে জানি না, ব্যাপারটা ঠিক যেভাবে ঘটেছে, যেভাবে দেখেছি, সে-ভাবেই বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

লোকটার নাম ইমেট ডাটরু। শরীরে ওলন্দাজ রক্ত। গরুতে টানা ছাতশূন্য বিশাল এক ওয়াগন নিয়ে এক সন্ধ্যায় পেনসিলভ্যানিয়া থেকে আমাদের নতুন রাজ্য উইয়োমিঙে এসে হাজির। জানি, কষ্টকর পথ, নিশ্চয় কয়েক মাস লেগেছে আসতে। ভাল আবহাওয়ায় কম করেও দিনে বিশ মাইল পথ চলেছে, খারাপ হলে কম, আরও বেশি খারাপ হলে একেবারেই বন্ধ। ওয়াগনে করে এনেছে খাবার, চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, আর পুরানো তেরপলে ঢেকে কয়েকটা অতি সাধারণ আসবাব। কোনও সন্দেহ নেই এতটা পথ হেঁটে এসেছে সে, গরুর জোয়ালে বাঁধা চামড়ার দড়ি ধরে ওগুলোকে পথ দেখাতে দেখাতে এনেছে। কখনও গাড়িতে চড়ে, কখনও বা পাশাপাশি পায়ে হেঁটে এসেছে তার স্ত্রী আর একমাত্র ছেলেটা।

দেখলাম, আমার বাড়ির কাছে যে খাঁড়িটা আছে, প্রথম রাতে সেখানে আস্তানা গাড়ল ওরা। গরুগুলোকে জোয়াল থেকে খুলে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেল সে, তার ছেলে গেল আগুনের ব্যবস্থা করতে, আর তার স্ত্রী ওয়াগনের অ্যাক্সেলে ঝোলানো রান্নার সরঞ্জামগুলো খুলে আনতে। হাতের কাজ শেষ করে রাতের খাবার খেতে বসার আগে খাঁড়িতে নেমে গেলাম আমি। পাথর মাড়িয়ে

এগিয়ে গেলাম ওদের অগ্নিকুণ্ডের দিকে। আগুনের কাছ থেকে উঠে এসে আমার পথরোধ করল লোকটা। বিশালদেহী মানুষ, চওড়া কাঁধ, এমনিতেই মোটা, আরও বেশি মোটা লাগছে অদ্ভুত পোশাকে। মোটা সুতায় তৈরি কালো কাপড়ের ঢোলা প্যান্ট, লেজ ছাড়া ফ্রককোটের মত দেখতে কালো জ্যাকেট, কালো রঙের হ্যাট—চূড়া খাটো, কানা চওড়া। কালো রঙের চৌকোনা চাপদাড়িতে মুখের অধিকাংশটাই ঢাকা পড়েছে। কাছে থেকে ভাল করে উঁকি দিয়ে না তাকালে গভীর অক্ষিকোটরের ভিতরে যে একজোড়া চোখ আছে বোঝাই যায় না।

তার পিছনে পরিবারের অন্য দু'জন আগুনের ধারে আগের জায়গায় বসে আছে। গোবেচারা এক মহিলা, পরনে কালো রঙের পোশাক, ওটা যে কী জিনিস, গাউন না ফ্রক, না কি, কিছুই বোঝা যায় না। ছেলের পরনেও বাপের মতই পোশাক, ব্যতিক্রম কেবল তার মাথায় হ্যাট নেই।

থেমে গেলাম। লোকটাকে না সরিয়ে আর সামনে এগোনোর উপায় নেই। বললাম, 'ইভনিং, মিস্টার।'

'গুড ইভিনিং,' ভারি কণ্ঠে লোকটা জবাব দিল। গলার অনেক গভীর থেকে ভেসে এল এক ধরনের গুড়ুগুড়ু। মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাদ্রী যেমন করে শ্লোক পড়ে, কথা বলার ভঙ্গি অনেকটা সে-রকম। 'কোনও কাজ আছে আমার কাছে?'

'আমার ঘরে গরুর তাজা মাংস আছে,' বললাম।

'দাম কত?'

'পয়সা লাগবে না।'

আমার দিকে তাকাল লোকটা। চোখ দেখলাম না, কোটর দুটো যেন আমার দিকে তাক করে জবাব দিল, 'মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিই না আমি।'

আগুনের ধার থেকে উঠে এল তার ছেলে। হাত তুলে খাঁড়ির ওপরের ঢালে চারণভূমিতে গরুগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো আপনার...'

'জেস!' শপাং করে উঠল যেন লোকটার কণ্ঠস্বর।

কুঁকড়ে গেল ছেলেটা। তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে পড়ল আবার আগের জায়গায়। আমার দিকে ফিরল ওর বাবা। 'আর কোনও কাজ আছে আপনার?'

'না।'

পাথর মাড়িয়ে কিছুদূর এসে আরেকটা সহজ পথে ঢাল বেয়ে উঠে এলাম আমার র‍্যাঞ্চহাউসে।

দুই

পরদিন সকালে নিজের সীমানা চিহ্নিত করল সে। উপত্যকায় খাঁড়ির এক প্রান্ত থেকে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত অনেকখানি জায়গা বেছে নিল। শত শত বছর আগে বৃষ্টি হলে পাহাড়ী ঢলের পানি বয়ে যেত ওই পাহাড়ের গোড়া দিয়ে। গোড়াটা কেটে দিয়েছে পানি। চকচকে মসৃণ হয়ে আছে পাথরের খাড়া দেয়াল। আপাতদৃষ্টিতে বাড়ি করার চমৎকার জায়গাই মনে হয়—চাষের জমি আছে, একটা ঝর্না আছে, টিলার ঢালে বেশ কিছু কটনউড গাছও জন্মেছে। তবে অসুবিধেও আছে অনেক, যেমন শীতকালে বড় বেশি আবর্জনা জমে যায় টিলার গোড়ায়। তা ছাড়া পর্বত থেকে নেমে আসা হিমেল বাতাস বয়ে যায় ঠিক ওই জায়গাটার ওপর দিয়ে। জায়গা বাছাইয়ের নমুনা দেখেই বুঝতে পারলাম

এদিকের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই ওর।

তবে খাটতে পারে পিতা-পুত্র। ঘর বানানোর জন্যে গাছ কেটে, ডাল-পাতা ছেঁটে গরু দিয়ে টেনে আনাল। দুই দিন যেতে না যেতে ঘরের একটা কাঠামো খাড়া করে কাঁধ সমান বেড়া দিয়ে ফেলল। এই সময় নামল বৃষ্টি। সেই সঙ্গে দমকা বাতাস। আর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। ওদের কথা ভেবে চিন্তিত হলাম আমি। এই প্রচণ্ড শীত আর বৃষ্টির মধ্যে মাথার ওপরে ছাত নেই, আগুন জ্বালতে পারবে না। বুট পরলাম। স্লিকারটা গায়ে চড়িয়ে, পুরানো হ্যাটটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে। এখনও কাজ করে যাচ্ছে পিতা-পুত্র। শীত ঠেকানোর জন্যে পুরানো তেরপল চারকোনা করে কেটে, মাঝখানে একটা ছিদ্র করে মাথা গলিয়ে ফেলে রেখেছে কাঁধের ওপর, লম্বা দুই প্রান্ত ঝুলে আছে দেহের দু'দিকে। হাতের জন্যে বাধা হয়ে যাচ্ছে এই তেরপল, অসুবিধে হচ্ছে কাজ করতে, তা-ও করেই যাচ্ছে ওরা। ঘরের একপাশের বেড়া ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ওয়াগনটা, অন্য একপাশ ঢেকে দিয়েছে তেরপল দিয়ে। তাতে ওয়াগনের নীচে ছোট একটা গুহামত তৈরি হয়েছে, সেখানে মাটিতে গাছের ডাল বিছিয়ে বসে আছে মহিলা। একটু উঁচু হতে গেলেই মাথা ঠুকে যায় গাড়ির তলায়। কাঠের ওয়াগনের মেঝেটা গুহার ছাত তৈরি করেছে, কিন্তু ওতে এত বেশি ফাঁক-ফোকর, বৃষ্টির পানি ঠেকাতে পারছে না।

আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে আগের বারের মত পথরোধ করল ও। গায়ের ওপর তেরপল ফেলে রাখায় আরও বিরাট লাগছে শরীরটা। অক্ষিকোটর দুটো তাক করল আমার দিকে।

বললাম, 'এক কাজ করুন না, আমার ওখানে চলে আসুন। এখানে থেকে শুধু শুধু কষ্ট করার দরকার নেই। ঝড়-বৃষ্টি যতক্ষণ

না করে, থাকবেন। ঘরটা বড় আছে আমার, জায়গা হয়ে যাবে।'

'না,' গুড়ুগুড়ু মেঘের শব্দ বেরিয়ে এল ওর গলার গভীর থেকে, 'আমাদের যা আছে তা দিয়েই চালিয়ে নিতে পারব।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আমার চোখে পড়ল বিচিত্র গুহার ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে মহিলার মুখ। ভেজা হ্যাট। ভিজে কুঁচকে গেছে মুখের ফ্যাকাসে চামড়া। লোকটার দিকে ফিরে বললাম, 'আপনি কী! ওসব ফালতু অহঙ্কার বাদ দিন না। স্ত্রী আর ছেলের কথা অন্তত ভাবুন।'

'তাই তো ভাবছি। আর সে-জন্যেই বর্ম হয়ে রক্ষা করতে চাইছি ওদের।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেলাম। পিছন থেকে ডেকে বলল সে, 'নেইবার, আপনাকে বোধহয় একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত। আমাদের ভাল চাইছেন আপনি।'

'হ্যাঁ, চেয়েছিলাম,' হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিলাম।

একটিবারের জন্যেও ফিরে না তাকিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বাতি ধরিয়ে কয়েক টুকরো কাঠ ছুঁড়ে ফেললাম ফায়ারপ্লেসে।

দুই হপ্তা পর আরেকবার সাহায্য করার চেষ্টা করলাম ওদের। ততদিনে ঘর তৈরি হয়ে গেছে, মাথার ওপর গাছের ছালের ছাত হয়েছে, বেড়ার ফাঁকগুলো কাদা দিয়ে লেপে বাতাস বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছে। জমিতে চাষ দিতে আরম্ভ করেছে ডাটরু। গরুগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে। ওদের কাঁধে জোয়াল জুতে দিয়ে লাঙল চালাচ্ছে মাটির অনেক গভীরে শেকড় গেড়ে বসা, ঘন, ভীষণ শক্ত বাফেলো ঘাসের মধ্যে।

এটাও বোকামি। চমৎকার ওই ঘাস গরুবাছুরের ভাল খাবার। এ ভাবে নষ্ট না করে গরুর খাবার হিসেবে রেখে দিতে পারে। তা ছাড়া এই অমানুষিক পরিশ্রমেরও কোনও মানে হয় না। চাষের

জায়গার তো অভাব নেই। ঘাস যেখানে নেই, কিংবা কম সেখানে চাষ দিলে পরিশ্রম কম হত। কিন্তু তা না করে ওই ঘাসে ঢাকা জমিই চষে, ঘাসের শেকড় উপড়ে ফেলে রাখল শুকিয়ে মরে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্যে। পরের বছর ওখানে ফসল বুনতে পারবে। জমি চাষ ছাড়াও আরও প্রচুর কাজ আছে এখন ওদের, সীমানা ঘিরে বেড়া দিতে হবে, প্রয়োজনীয় ছাউনি তুলতে হবে, আরও কত কী।

আমার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক তৈরি হতে পারত ওদের, একে অন্যকে সাহায্য করতে পারতাম, কারণ অনেক কাছাকাছি রয়েছি আমরা। এতদিন আমার সবচেয়ে কাছের পড়শী ছিল দুই মাইল দূরের কনারিয়া।

যেহেতু আমি এই উপত্যকায় আগে এসেছি, পুরানো লোক, খাতির করার প্রথম চেষ্টা আমারই করা উচিত। এক শনিবারের বিকেলে শহরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম আমি। পোস্ট অফিসে খোঁজ নেব আমার নামে কোনও চিঠিপত্র আছে কিনা, টুকটাক কিছু জিনিস কিনব, চেনা-পরিচিতদের সঙ্গে গল্পগুজব করব। ভাবলাম, ডাটুরুদের তো গাড়ি নেই, আছে একটা গরুর গাড়ি, বড়ই ধীরগতি, ওই জিনিস নিয়ে শহরে বেড়াতে যাওয়া যায় না, তাই আমার গাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাব। গাড়িতে ঘোড়া জুতে গিয়ে হাজির হলাম ওদের ওখানে। সাড়া পেয়ে ঘরের দরজায় মুখ বের করল মহিলা। নীরবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। জমি চষা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ছেলেটা। ঘরের পাশ ঘুরে বেরিয়ে এল ওর বাবা। হাত নেড়ে ছেলেকে তার কাজে ফিরে যেতে ইশারা করে আমার গাড়ির সামনে এসে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়াল।

'শহরে যাচ্ছি,' বললাম, 'যাবেন নাকি? অনেকের সঙ্গে

পরিচয় হবে। কেনাকাটা থাকলেও সেরে নিতে পারবেন।'

'না,' চাঁছাছোলা জবাব। অক্ষিকোটর আমার মুখের দিকে তাক করে কণ্ঠস্বর আরেক ধাপ চড়িয়ে বলল, 'শহর ভর্তি কেবল লোভ আর পাপ। আসার সময় দুটো স্যালুন আর রঙচঙ মাখা একটা মেয়েকে দেখে এসেছি।'

'তাতে কী? ওসবের মধ্যে আপনি না গেলেই হলো। সবখানেই আছে এ জিনিস?'

'হ্যাঁ, আছে। আসার সময় যত শহর দেখেছি, সবখানেই আছে ওরা। সে-জন্যেই তো এখানে এসে থেমে গেলাম। বুঝে গেছি, এগিয়ে লাভ নেই, নিরাপদ জায়গা পাব না। সামনেও শহর পড়বে। এগিয়ে লাভ কী? যেখানেই জড়ো হয় মানুষ, সেখানেই পাপ। আমি ওদের কাছ থেকে আলাদা থাকতে চাই।'

'বুঝলাম, আপনি মানুষ পছন্দ করেন না। কিন্তু আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে, তারা?'

আরও একধাপ চড়ল ওর গলা, গলার গভীর থেকে গুড়ুগুড়ু শব্দ বেরিয়ে এল, 'ওরা আমার আশ্রয়ে আছে, আমি যা-বলব তাই শুনবে,' চিবুক আরেকটু উঁচু করল সে। অক্ষিকোটরের ভিতরে আলো পড়ায় চকচকে জ্বলন্ত একজোড়া চোখ নজরে পড়ল এই প্রথম। বুঝতে পারছি না, এখানে এসে আপনাকে বিরক্ত করছি না তো? করলে বলুন, অন্য কোথাও চলে যাব।'

লাগামে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। শপাং করে চাবুকের বাড়ি মারলাম পিঠে। খাঁড়ি ধরে উড়তে শুরু করল যেন ঘোড়াগুলো।

তিন

সাহায্যের চেষ্টা আর করলাম না। দূর থেকে দেখি সব। পাহাড়ের ওপরে শৈলশিরায় পাথরের ফুট দশেক উঁচু একটা টিলা আছে, ওপরটা সমতল, বড় একটা টেবিলের মত। কয়েক দিন যন্ত্রপাতি নিয়ে ওখানে কাজ করতে দেখলাম ওকে। ওটার গায়ে ধাপ কেটে কেটে সিঁড়ি বানাল। তারপর তার ছেলেকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে, সমস্ত আলগা পাথর ফেলে দিল। রাখল কেবল তিনটা চারকোনা পাথর, একটা বড়, দুটো ছোট। দুই টুকরো কাঠ এনে একটা ক্রুশ বানিয়ে বসিয়ে দিল বড় পাথরটাতে। এরপর থেকে প্রতিদিন খুব ভোরে এবং সন্ধ্যায় রাত নামার আগে ওর ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে ওঠে, হাঁটু গেড়ে বসে যায় প্রার্থনা করতে। এতদূর থেকে শব্দ আসে না, তবে কল্পনা করতে পারি ওর ভারি কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে, ধাক্কা খায় পেছনের পাহাড়ের দেয়ালে। রবিবারে ছুটির দিনে কোনও কাজ করে না, চুলাও জ্বলে না ওদের, চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোয় না, তিনজনেই গিয়ে উঠে বসে থাকে ওই বেদিতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মহিলা আর ছেলেটা বসে ছোট দুটো পাথরে, আর লোকটা বড় পাথরটায়। হাঁটুর ওপরে থাকে একটা খোলা বই। বাইবেল, বুঝতে পারি।

এমনি এক রবিবারের বিকেলে আমার বাড়িতে এসে ঢুকল ছেলেটা। তার ভঙ্গি আর ভয় দেখে মনে হলো, সাংঘাতিক কোনও জানোয়ার যেন ওত পেতে আছে এখানে, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত। বারান্দায় বসা আমি, হাঁটুর ওপর রাখা

আমার উইনচেস্টার রাইফেল। রোদ পোয়াচ্ছি আর নজর রাখছি গোয়ালের দিকে। বেড়ার কাছে গর্ত করেছে একটা গফার, আমার উদ্দেশ্য ওটাকে মারব, মাথা তুললেই দেব দ্রাম করে মেরে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে এল বিচিত্র কালো পোশাক পরা ছেলেটা। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন এক তরুণ। আরও কাছে এলে গলা চড়িয়ে বললাম, 'খবরদার, কাছে এসো না! আমার ঘাড়ের শয়তান তোমার ঘাড়ে ভর করবে তো!'

বোকাটে হাসি হাসল সে। জুতোর ডগা দিয়ে মাটি খোঁচাতে খোঁচাতে সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, 'ঠাট্টা করবেন না। বাবা না আটকালে অনেক আগেই চলে আসতাম।'

'আজ যে এলে?'

'বাবাই আসতে দিল। বলল, লোক আপনি খারাপ নন।'

'তাই নাকি? অনেক ধন্যবাদ। তা পরীক্ষায় যখন পাসই করে ফেললাম, ওপরে উঠে এসো। বসো।'

বারান্দায় উঠে বসল সে। কৌতূহলী চোখে চারপাশে তাকাতে লাগল। বলল, 'বাবা পাঠিয়েছে আপনার কাছে জানতে, জায়গার দলিল-পত্রের ব্যাপারে কীভাবে কী করতে হবে।'

বললাম তাকে।

সব শোনার পরও বসে রইল সে। 'ওটা কি বন্দুক?'

'হ্যাঁ। এটা উইনচেস্টার। খুব ভাল অস্ত্র।'

'দেখতে পারি?'

সেফটি ক্যাচ অন করে রাইফেলটা তুলে দিলাম ওর হাতে। কাঁধে বাঁট ঠেকিয়ে নিশানা করার ভঙ্গি করল সে। সতর্ক রয়েছে। যেন বেশি নাড়াচাড়া করলেই গুলি ছুটে যাবে।

'তোমার বন্দুক আছে?'

'না,' রাইফেলটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে দ্বিধার সঙ্গে

বলল সে, 'নিজের বলতে কোনও জিনিসই নেই আমার। ঘরে যা আছে সব কিছুর মালিক বাবা। পুরনো একটা শটগান আছে তার, ছুঁতেও দেয় না আমাকে।' মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলল, 'নিজের ইচ্ছেমত কিছু কেনার জন্যে কোনওদিন একটা পয়সা পাইনি হাতে।' আরও দুই মিনিট চুপ করে থেকে বলল, 'সারাক্ষণ এত প্রার্থনা করে হবেটা কি, বলতে পারেন আমাকে? যতক্ষণ জেগে থাকে, দুটো কাজই করে বাবা, হয় কোনও কাজ, নয়তো প্রার্থনা। পাপ থেকে মুক্তি চায়। আমার হয়ে আমার পাপের জন্যে ক্ষমা চায়, মা'র জন্যে প্রার্থনা করে। কী পাপ করেছি আমরা, বলুন? কীসের এত ক্ষমা প্রার্থনা?'

'আমি জানি না।'

আরও কিছুক্ষণ বসে রইল সে। গোয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুরুগুলো সুন্দর...'

'হ্যাঁ। ভাল জাতের গরু, এই এলাকায় আমিই প্রথম জন্মিয়েছি।'

'অনেক জিনিস আপনার। কী করে করলেন এতসব?'

'তোমার বয়েসে আমি ছিলাম একটা উড়নচণ্ডী। বাপের জমিয়ে রাখা টাকা সব দু'দিনে উড়িয়ে দিলাম। তারপর হুঁশ হলো। ঠিক করলাম, শয়তানি অনেক করেছি, এবার ভাল হয়ে যাব। এক গরু-ব্যবসায়ীর খামারে চাকরি নিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই বুঝে ফেললাম; ওর চেয়ে ভাল জাতের গুরু উৎপাদন করতে পারি আমি। বেতনের টাকা জমাতে শুরু করলাম।'

'নিজের ব্যবসা শুরু করতে কতদিন লাগল?'

'এগারো বছর।'

'বাপরে, অনেক সময়!'

'তোমার বয়েস কত, জেস?'

'উনিশ। উনিশ বছর চার মাস।'

'তোমার জন্যে এগারো বছর তা হলে কিছু না। কাজ করতে করতে কখন ফুড়ুত করে উড়ে যাবে, টেরই পাবে না।'

'এবং তখনও আমার এমন কিছু বয়েস হবে না,' জ্বলজ্বল করছে ছেলেটার চোখ।

'না, হবে না।'

বসেই রইল সে। হঠাৎ বোকার মত বলে বসলাম,'জেস, বড় কাজের চাপ পড়ে গেছে। দু'একদিন বিকেলে এসে আমার খড়ের গাদাটা তুলতে সাহায্য করবে? উচিত মজুরি দেব। ঘণ্টায় পঁচিশ সেন্ট। অবশ্য তোমাদের কাজ ফেলে আসতে বলছি না।'

দেশলাইয়ের কাঠির মত জ্বলে উঠল তার মুখ। 'কিন্তু বাবা...

'বাধা দেয়ার তো কোনও কারণ দেখি না। কাজ করলে পাপ হয় বলে শুনিনি কখনও।'

চলে গেল জেস। আসতে পারবে কিনা বুঝলাম না। তবে মঙ্গলবার দিন এল সে। সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটল আমার সঙ্গে। ভাল শ্রমিক। কাজ করতে করতে প্রচুর কথা বলল আমার সঙ্গে, একবিন্দু সময় নষ্ট না করে। আমাদের অঞ্চল, লোকজন, গরুবাছুর পালন, ঘোড়ার ব্যবসা, সব কিছুতে তার আগ্রহ। শুক্রবারে আবার এল সে। সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে গোয়াল থেকে বেরিয়ে ওকে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা হলাম, দেখি বারান্দায় বসে আছে ওর বাবা।

'গুড ইভিনিং, নেইবার,' আমাকে বলল সে, 'আমার ছেলে বলেছে, দিন দুই আপনাকে সাহায্য করতে হবে। করেছে। টাকার জন্যে এসেছি আমি।'

'কাজ তো আপনার ছেলে করেছে। মজুরিটা তার পাওয়া উচিত।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না,' গলা চড়তে আরম্ভ করল লোকটার, 'আমার ছেলে এখনও বড় হয়নি। যতদিন আমি তার দায়িত্বে আছি, ওর কাজের ফসল আমার। ওকে শয়তানের কবল থেকে বাঁচানোর গুরুদায়িত্ব আমার ওপর, ঈশ্বরের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। ওর মত একটা ছেলের হাতে টাকা পড়লেই লোভ জাগবে, আর লোভ থেকে পাপ।'

ঘরে ঢুকে জ্যাকেটের পকেট থেকে তিনটে ডলার বের করে এনে জেসের হাতে দিলাম। হাতের তালুতে রাখা টাকাগুলোর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল সে।

'জেস, এদিকে এসো!'

দ্বিধা জড়িত, অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বাবার দিকে এগিয়ে গেল জেস। ওর হাত থেকে টাকাগুলো প্রায় কেড়ে নিল ডাটরু।

'আমি দুঃখিত, জেস,' ওকে বললাম, 'এখানে তোমার কাজ করতে আসার কোনও মানে হয় না।'

চাবুক খাওয়া ঘোড়ার বাচ্চার মত আমার দিকে তাকাল জেস। তারপর হাঁটতে শুরু করল। সোজা থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বেসামাল হয়ে যাচ্ছে পা।

'ডাটরু,' না বলে আর পারলাম না, 'টাকাগুলো জলদি সরান, হাত পুড়ে যাচ্ছে না আপনার? পাপ বাড়ছে তো!'

'নেইবার,' গুড়ুগুড়ু শব্দ বেরোল গলার গভীর থেকে, 'আমার পাপ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। সেই দায়িত্ব ঈশ্বরের। যা করার তিনি করবেন।'

দূর, এর সঙ্গে কী কথা বলে! সোজা ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

মাসখানেক পর এক সকালে আমার বাড়িতে ডাটরু এসে হাজির। কড়া রোদের মধ্যেও পরনে সেই বিচিত্র কালো পোশাক,

মাথায় কালো হ্যাট।

'নেইবার,' জিজ্ঞেস করল, 'আমার ছেলেকে দেখেছেন?'

'না।'

'আশ্চর্য! ঘুম থেকে উঠে দেখি বিছানায় নেই। সকালের প্রার্থনাও করেনি আজ।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর হাত তুলে মোটা একটা আঙুল আমার দিকে তাক করে ভারি গলায় বলল, 'নেইবার, আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যদি অন্য কোথাও পাঠানোর মতলব করে থাকেন, ঈশ্বরের অভিশাপ নামবে আপনার ওপর।'

'নেইবার ডাটরু,' কঠোর স্বরে বললাম, 'আপনার ছেলে কি করছে এখন জানি না। তবে আপনি কী করবেন, বলতে পারি। আপনার ওই বেয়াড়া মুখটা বন্ধ করে জলদি কেটে পড়ুন আমার সীমানা থেকে।'

আমার কথা যেন শুনতেই পায়নি সে। মুখ আর দাড়িতে হাত বোলাল। 'আমাকে মাপ করবেন, মাথার ঠিক নেই, কী বলতে কী বলে ফেলি। সাংঘাতিক চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ছেলেটা।'

আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে। খাঁড়িতে নেমে মোড় নিয়ে শহরের দিকে এগোল। হাঁটার তালে তালে পিছনে বাড়ি খাচ্ছে লম্বা কোটের ঝুল। ছোট হতে হতে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে গেল মূর্তিটা।

শেষ বিকেলে ফিরে আসতে দেখলাম তাকে। একা, ধূলি-ধূসরিত, ক্লান্ত একজন মানুষ। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে পথ চলছে। খাঁড়ি পেরিয়ে অন্য পাশে তার বাড়ির দিকে এগোল। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিতে বেরিয়ে এল তার স্ত্রী। দু'জনে মিলে গিয়ে উঠল শৈলশিরার ওপরে

বেদিতে। হাঁটু গেড়ে সেই যে প্রার্থনা শুরু করল, আর ওঠে না। ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার গ্রাস করে নিল ওদেরকে, তখনও ওরা ওখানেই।

চার

পরদিন বিকেলে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনলাম। বেরিয়ে গিয়ে দেখি মার্শাল ইয়াকিন আসছে। আমাদের শেরিফের দায়িত্ব পালন করে সে। আমার গোলাঘরের সামনে এসে থামল। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। কলারের কাছে শার্টের দুটো বোতাম খোলা থাকায় বাঁ কাঁধের ব্যাণ্ডেজ দেখতে পেলাম।

'আফটারনুন, জন,' আমাকে বলল, 'এক কাপ কফি খাওয়াবে?'

ঘরে ঢুকে স্টোভ জ্বেলে কফির পানি চড়িয়ে দিলাম। ওর কাঁধের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে হলো? ডাকাত ধরতে গিয়েছিলে নাকি?'

'না, একটা আনাড়ি ছেলে। বদ্ধ উন্মাদ।'

কফি এনে দিলাম। কাপে চুমুক দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল সে।

'খাঁড়ির ও মাথায় ওটা ডাটকদের বাড়ি, না?'

'হ্যাঁ।'

'ওদের ছেলেটাই জখম করেছে আমাকে।'

চার চুমুকে কাপের কফি শেষ করে আরও নেয়ার জন্যে কেটলির দিকে হাত বাড়াল সে। 'গতকাল শহরে গিয়েছিল ওর

বাপ। বলল, তার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেটা করেছে কী; রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে ওয়ালটনের দোকানের জানালা ভেঙে ঢুকে এক প্যাকেট খাবার, একটা রাইফেল আর এক বাক্স গুলি চুরি করেছে। তারপর আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে।'

'ও তো ঘোড়ায় চড়তে জানে না,' বললাম।

'আমারও তাই মনে হয়েছে। একেবারে আনাড়ি। কী করে যে গেল এতটা পথ, সেটাই আশ্চর্য! ঘোড়াটা শান্ত বলেই বোধহয় পেরেছে। ওকে ধরতে বেরোলাম। সহজ চিহ্ন রেখে গেছে। আমার সঙ্গে ছিল প্যাটন। আমাদের কয়েক ঘণ্টা আগে গেলেও ওকে ধরতে সময় লাগল না। সকাল দশটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম কতগুলো পাথরের কাছে। বোঝা গেল, ওগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সে। চেঁচিয়ে বললাম, বন্দুক ফেলে দিয়ে যদি হাত তুলে বেরিয়ে আসে, কিছু বলব না। তার প্রথম অপরাধ মাপ করে দেয়া হবে। কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে গেল যেন ওর। পাপের কথা কী যেন বলে গুলি করতে করতে বেরিয়ে এল।'

'আমি তো জানতাম গুলি করতে জানে না ও।'

'আসলেও জানে না। যা করেছে ওটাকে গুলি করা বলে না। আমাদের দিকে নল তুলে ট্রিগার টিপতে লাগল। প্যাটন ছিল সামনে। তার একেবারে বুকে লাগল গুলি। আমার কাঁধে।'

কফির কাপে চুমুক দিল ইয়াকিন।

'তারপর?' জানতে চাইলাম।

'তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিলাম। পাগলামি থামে না দেখে দু'চারটা চড়-চাপড়ও মারতে হয়েছে। প্যাটনকে পড়ে যেতে দেখে মাথাটা বোধহয় আমারও বিগড়ে গিয়েছিল, তাই খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি ছেলেটার সঙ্গে।'

কফি শেষ করে কাপটা রেখে দিল সে। 'ওদের বাড়িতে খবর দিতে হবে। ওর মা যদি বেরিয়ে আসে! মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি লাগে আমার। তুমি একটু আসবে আমার সঙ্গে?' এক আঙুলে ঠেলে কাপটা আরেকটু সরাল সে। 'সময় কম। শহরে ফিরে যেতে হবে। কাল ওর বিচার।'

ইয়াকিনের সঙ্গে গেলাম। 'ডাক দিতে দরজা খুলে দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল মহিলা। ঘরের পাশ থেকে বেরিয়ে এল ডাটরু। গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল আমাদের। চিবুক উঁচু করে তাকাল। কোটরের গভীরে দেখা গেল একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। গুড়ুগুড়ু শব্দ বেরোল গলা থেকে, 'আমার ছেলেকে পাওয়া গেছে?'

'গেছে,' জবাব দিল ইয়াকিন, 'আপনার ছেলেকে খুঁজে বের করেছি আমরা।' আমার দিকে তাকাল সে, উসখুস করল, তারপর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে ডাটরুর দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করে বলল, 'মানুষ খুন করেছে ও। কাল সকাল দশটায় ওর বিচার হবে। ওর পক্ষে ওকালতি করার জন্যে একজন উকিল নিয়োগ করা হয়েছে। আমার হাতে আর এখন কিছু নেই। যা করার জজ সাহেব করবেন।'

ধপ করে বসে পড়ল ডাটরু, মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর। ঢোলা পোশাকের ভিতরে ধসে গেল যেন তার দেহটা। ফিসফিস করে বলল, 'পাপের ফল!'

দরজায় দাঁড়িয়ে স্বামীর দিকে হাত তুলে চিৎকার করে উঠল মহিলা, এই প্রথম তাকে কথা বলতে শুনলাম, 'কীসের পাপ! কখন পাপ করল ও! সব দোষ তোমার, তুমি নষ্ট করেছ ওকে। পাপের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে পাগল বানিয়ে দিয়েছ! সারাক্ষণ খালি ঈশ্বর আর ঈশ্বর! প্রার্থনা তো অনেক করলে, তোমার কোন্

ভালটা করল এখন তোমার ঈশ্বর?'

আগুন জ্বলতে লাগল যেন মহিলার চোখে। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারা আরও ফ্যাকাসে লাগছে।

জবাব দিল না ডাটরু। মাথাটা কেবল আরও খানিকটা ঝুলে পড়ল, লম্বা দাড়ি বুক ছুঁয়েছে।

আমাদের উপস্থিতি ভুলেই গেছে যেন ওরা। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল ইয়াকিন। আমার দিকে তাকাল। মাথা ঝাঁকালাম।

চুপচাপ ওখান থেকে সরে এলাম আমরা। বাড়ি ফিরলাম। গোলাঘরের কাছে বাঁধা ঘোড়াটা খুলে নিয়ে শহরে রওনা হয়ে গেল ইয়াকিন।

পাঁচ

পরদিন সকালে ঘোড়ায় চেপে ডাটরুর বাড়িতে এলাম আমি। ভাবলাম ওরা যদি শহরে যায়, আমার গাড়িটা নিয়ে যেতে বলব। কিন্তু কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই, কোনও নড়াচড়া নেই। মানুষ আছে বলে মনে হয় না। ঘরের দরজা খোলা। উঁকি দিয়ে দেখি নিভে যাওয়া ফায়ারপ্লেসের সামনে পিঠ খাড়া একটা অতি সাধারণ চেয়ারে বসে আছে মহিলা। কোলের ওপর ফেলে রাখা দুই হাতের দিকে তাকিয়ে আছে চুপচাপ। একেবারে স্থির।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সাহেব কোথায় গেছে?'

মাথা কাত করে আমার দিকে তাকাল মহিলা। কোনও ভাবান্তর হলো না চেহারায়।

'আছে বাড়িতে?' আবার জিজ্ঞেস করলাম।

এদিক ওদিক অতি সামান্য একটু নড়ল মাথাটা, ফিরে গেল আগের ভঙ্গিতে।

ঘোড়ায় চেপে শহরে রওনা হলাম। পথে দেখা হলো না ডাটরুর সঙ্গে।

যে বাড়িটাকে আদালত বানিয়েছি আমরা, সেটার কাছে পৌঁছে দেখলাম, ভিতরে অনেক লোক জমে গেছে। মঞ্চে বসেছেন জজ কাটলার। লম্বা, ব্যক্তিত্ববান, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এই ভদ্রলোককে আমরাই জজ বানিয়েছি। বিচারের কাজে তিনি দক্ষ।

জেস ডাটরুকে এনে বিচারকের একপাশে আসামীর চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো। অন্য পাশে সাক্ষির চেয়ার জুরির প্রয়োজন নেই। উকিল একাই আসামীর পক্ষে সাফাই গাইতে লাগল বলার তেমন কিছু নেই তার, তবু নিয়োগ করা হয়েছে যখন কিছু তো বলতে হয়। আসামীর কম বয়েস, আর যে কঠোরতার মাঝে সে বড় হয়েছে, সেটা উল্লেখ করে ইনিয়ে-বিনিয়ে কয়েক কথা বলল। তারপর এল সাক্ষির কথা বলার পালা। মার্শাল ইয়াকিনকে বলার জন্যে অনুরোধ করলেন বিচারক। যা যা ঘটেছে বিস্তারিত জানাল ইয়াকিন। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ছেলেটাকে আমি চিনি কিনা। বললাম, চিনি। ওর নাম জেস ডাটরু কিনা; বললাম, জেস ডাটরুই। আবার উকিলের বলার পালা এল। দোষ করেছে ছেলেটা, এ ব্যাপারে উকিলেরও কোনও দ্বিমত নেই, কিন্তু বয়েস বিবেচনা করে আসামীর শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানাল সম্মানিত বিচারককে।

এই সময় গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। এক এক করে সবগুলো মাথা ঘুরে যেতে শুরু করল দরজার দিকে।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটার বাবা। পরনে সেই কালো পোশাক। তাতে মাটি লেগে আছে। আমার মনে হলো, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করে এসেছে ও। হ্যাটটা নেই মাথায়। উসকো-খুসকো লম্বা চুল আর দাড়ি জট পাকিয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। এক রাতেই উঁচু হয়ে গেছে চোয়ালের হাড়। সারারাত জেগে ছিল বোধহয়। কী করেছিল? আমার ধারণা, প্রার্থনা করেছে। কথা বলল ভারি স্বরে, 'থামুন! ভুল লোকের বিচার করছেন আপনারা।'

এগিয়ে এসে বিচারকের মঞ্চের সামনে দাঁড়াল সে। মুখ তুলে জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার ছেলের বয়েস এখনও কুড়িও হয়নি। এখনও তার সমস্ত কিছুর দায়-দায়িত্ব আমার। তাকে দেখেশুনে রাখার ভার আমার ওপর অর্পণ করেছিলেন ঈশ্বর, লোভ আর পাপের রাস্তা থেকে তাকে পাহারা দিয়ে সরিয়ে রাখতে বলেছিলেন, আমি সে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। লোভ জেগেছে ওর মনে, পাপ করেছে, সেই পাপের দোষ আমার ঘাড়েই বর্তায়। বিচার যদি কারও করতেই হয়, আমার বিচার করা হোক, আমাকে শাস্তি দেয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

সামনে ঝুঁকে সহানুভূতির সুরে জজ কাটলার বললেন, 'মিস্টার ডাটরু, আপনার জন্যে দুঃখ হচ্ছে না এমন একজনকেও পাবেন না আজ এখানে। আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু একজনের দোষ তো আরেকজনের ঘাড়ে চাপাতে পারি না আমরা। মানুষের আইনে আঠারো বছরেই সাবালক হয়ে যায় পুরুষমানুষ। পূর্ণ শাস্তিযোগ্য হয়। আপনার ছেলের বয়েস উনিশ পেরিয়ে গেছে। বড় মানুষের মতই ওর বিচার হবে।'

মাথা উঁচু করে দাঁড়াল নোংরা কালো কোট পরা মানুষটা। এক হাত লম্বা করে এক পাশ থেকে আরেক পাশে ঘুরিয়ে এনে

বাইবেলের শ্লোক পাঠ করার ভঙ্গিতে বলল, 'মানুষকে শাস্তি দেয়ার কোনও অধিকার মানুষের নেই। আমি আপনাকে সাবধান করছি, ঈশ্বরের কাজ নিজের হাতে তুলে নিতে গিয়ে অনধিকার চর্চা করছেন আপনি। এর ফল ভাল হবে না!'

মাথাটা আরেকটু সামনে বাড়িয়ে দিলেন জজ কাটলার। 'মিস্টার ডাটরু,' কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হলো না তাঁর, 'শান্ত হয়ে যদি থাকতে পারেন, থাকুন; নয়তো আপনাকে ঘর থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব আমি।'

নীরব হয়ে গেল বাবা। কালো পোশাকের ভিতরে বাতাসের ঝাপটায় মোমের আলোর মত দুলে উঠল তার দেহটা। আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল। সামনের সারির একজন উঠে জায়গা করে দিল তাকে চুপচাপ গিয়ে সেখানে বসে পড়ল সে। বুকের ওপর ঝুলে পড়ল মাথা।

'জেস ডাটরু,' জজ কাটলার বললেন, 'উঠে দাঁড়াও। সোজাসুজি জবাব দাও। তোমার কিছু বলার আছে?'

উঠে দাঁড়াল জেস। পা কাঁপছে ওর। জোর করে বন্ধ করল কাঁপুনি। চাবুক খাওয়া অশ্বশাবকের দৃষ্টি ফুটল চোখে। কথা বলল চড়া স্বরে, 'আছে। কাজটা আমি করেছি, এবং এই একটা জিনিস আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা নেই ওর!' বাবাকে দেখাল সে। 'আমার সম্পর্কে যা যা অভিযোগ আনা হয়েছে, সব সত্যি। কোনও কিছুই অস্বীকার করছি না। আপনাদের যা করার আছে, করতে পারেন।'

জজ কাটলার বললেন, 'অভিযোগ অনেক। ওয়ালটনের দোকান থেকে জিনিসপত্র চুরি করেছ, তার আস্তাবল থেকে ঘোড়া চুরি করেছ, এগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারপর একজন কর্তব্যরত আইনের লোককে গুলি করে মেরেছ, আরেকজনকে

জখম করেছ। এসব তুমি করেছ বিনা প্ররোচনায়। কেউ তোমার ওপর আগে গুলি চালায়নি, আত্মরক্ষার জন্যে এসব করোনি তুমি, এগুলো কোনও দুর্ঘটনাও নয়। ইচ্ছে করে মানুষ খুন ছাড়া আর কিছু বলা যাচ্ছে না এটাকে। অতএব তোমার ফাঁসির হুকুম দেয়া হলো। কাল সকাল দশটায় এই আদালতের ঘড়ির সময় মোতাবেক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।'

জেসের দিকে তাকানোর চেয়ে তার বাবার দিকেই বেশি নজর দিল শ্রোতারা। জজ কাটলারের রায় ঘোষণার পর কয়েকটা সেকেণ্ড একই ভঙ্গিতে বসে রইল সে। তারপরে নিঃশব্দে উঠে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে। মাথাটা বুকের ওপর ঝোলানো বেরিয়ে গেল নীরবে।

ঘণ্টাখানেক পর বাড়ি ফেরার পথে ওর সঙ্গে দেখা হলো আমার। সেই একই ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে। আস্তেও নয়, জোরেও নয়, একতালে, দৃঢ় পদক্ষেপ। তাকে ডাকলাম আমি। জবাব দিল না সে। এমনকী মুখ তুলেও তাকাল না।

ছয়

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল আমার। চুপচাপ পড়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম, ঘুমটা কী কারণে ভাঙল। কানে এল ওয়াগনের চাকার ক্যাঁচকোচ শব্দ। দরজায় গিয়ে উঁকি দিলাম। ঊষার লালচে আলোয় দেখলাম খাঁড়ি ধরে চলেছে ও। বিশাল ওয়াগনটায় গরু জুতে জোয়ালে বাঁধা চামড়ার ফিতে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল আমার।

দরজা বন্ধ করে দিলাম।

বিকেলে ফিরে এল সে। সেই একই ভাবে চামড়ার ফিতে ধরে টেনে আনছে গরুগুলোকে। পিছনের ওয়াগনে বিশেষ আকৃতির একটা লম্বা বাক্স। ওর দিকে তাকাতে পারছি না। খাঁড়ির ওপারে ওর বাড়ির দিকে তাকালাম। কেউ নেই। মনটা কেমন করে উঠল। তাড়াতাড়ি কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

ঘরের সামনে গিয়ে গাড়ি রাখল সে। ভিতরে চলে গেল। খানিক পর ফিরে এল দরজায়, দু'হাত ওপরে তুলে তাকিয়ে রইল। দূর থেকে ঠিক বুঝলাম না ও কী করছে, তবে মনে হলো আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে চিৎকার করছে। তারপর শৈলশিরার দিকে চলে গেল কবর খোঁড়ার জন্যে।

একটা কবর খোঁড়া শেষ করে আরেকটা যখন খুঁড়তে শুরু করল, চমকে গেলাম। অন্য কিছু করছে না তো? ভাল করে তাকালাম। না, কবরই খুঁড়ছে। খড় গোছানোর কাঁটাটা গোলাঘরের বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে রওনা হলাম পাহাড়ের দিকে। ঢাল বেয়ে নেমে, পাথর আর খাঁড়ি পেরিয়ে সোজা উঠে এলাম ওর কাছাকাছি। চিৎকার করে দু'বার ডাকার পর শুনতে পেল সে।

মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। দেখল আমাকে। কেমন হয়ে গেছে চেহারা! চিবুকের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেছে মুখের মাংস। কথা বলল, কোমল, মৃদু স্বরে, 'কী, নেইবার?' কণ্ঠের সেই ভারিক্কি ভাবটা নেই আর, গলার গভীর থেকে গুড়গুড়ও উঠে এল না।

'কী করছেন?'

'কবর খুঁড়ছি।'

'একটা তো খুঁড়লেন...

'এটা আমার স্ত্রীর,' কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন নেই, 'আত্মহত্যা করেছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, শব্দ হলো না তাতে, 'আমার গরু কাটার ছুরিটা দিয়ে।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কথা আটকে গেছে আমার। অনেকক্ষণ পর বললাম, 'আপনার আর কিছু করতে হবে না, বসে থাকুন। আমি এখুনি শহরে গিয়ে লোক নিয়ে আসছি।'

'করতে চাইছেন করুন, বাধা দেব না। তবে এর বোধহয় প্রয়োজন নেই। আমার কথা ভেবে কষ্ট পাবেন না। মানুষের ইচ্ছায় তো আর কিছু ঘটে না, ঈশ্বর যা ঠিক করে রেখেছেন তাই হবে। জীবন-মৃত্যুর মালিক তো তিনিই। একটা কথা জেনে যান, এই কাজটা শেষ করার সুযোগও তিনি আমাকে দেবেন। তারপর আমার ব্যবস্থা করবেন।'

আবার কবর খোঁড়ায় মন দিল সে। কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আর তাকাল না আমার দিকে। ঘরের কাছে গিয়ে দরজা থেকেই উঁকি দিলাম একবার ভিতরে, তারপর বাড়ি ফিরে ঘোড়া নিয়ে শহরে রওনা হলাম। যখন ফিরে এলাম, গোধূলির শেষ ছায়াটুকুও তখন মুছে যাচ্ছে। আবছা আলোয় শৈলশিরায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ওকে। কাজ শেষ করে ফেলেছে। কবর দেয়া শেষ। ডাল দিয়ে দুটো ক্রুশ বানিয়ে বসিয়ে দিয়েছে মাথার কাছে।

তিনটে দিন ওখানেই রইল সে। তৃতীয় দিন মাঝরাতের দিকে বৃষ্টি শুরু হলো। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, বাজ পড়ল বিকট শব্দে। ভোরের দিকে মাটির নীচে অদ্ভুত এক গুমগুম আওয়াজ শুরু হলো। এই আওয়াজ আরও একবার শুনেছি আমি বহুদিন আগে শিকারে গিয়ে। পর্বতের একটা বিরাট অংশ সেদিন ধসে পড়েছিল নীচের গিরিখাতে।

ভোরের আলো ফুটলে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। শৈলশিরার

দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেলাম। ধসে গেছে চূড়াটা। পাথরের স্তূপ জমে আছে নীচের খাঁড়িতে।

পাথরের নীচে ওর মৃতদেহ খুঁজে পেলাম আমরা। বেঁকেচুরে পড়ে আছে। লাশের কাছে পড়ে আছে বড় সেই চৌকোনা পাথরটা। তাতে বসানো ক্রুশ ভেঙে টুকরো টুকরো। মুখটা অবিকৃত। গভীর অক্ষিকোটরের অনেক ভিতরে খোলা চোখ দুটোতে আলো নেই আর এখন। অবশেষে ওর কেসটা বিবেচনা করেছেন ঈশ্বর। খিলান আকৃতির আকাশের বহু ওপরে স্বর্গ থেকে ঘোষিত হয়েছে তাঁর রায়, কার্যকরীও হয়েছে।

(জ্যাক শীফারের কাহিনি অবলম্বনে)

রকিব হাসান

কেরোসিনের গন্ধ

গুলেরির বাবা-মা বাস করে চাম্বায়। স্বামীর বাড়ি থেকে মাইল কয়েক দূরে, রাস্তাটা এঁকেবেঁকে খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে গেছে। পাহাড় থেকে পরিষ্কার দেখা যায় চাম্বা। গুলেরির বাড়ির জন্য মন কেমন করলেই স্বামী মানককে নিয়ে সে পাহাড়চুড়োয় গিয়ে দাঁড়ায়। চাম্বার বাড়িঘরের ছাদে সূর্যরশ্মি পড়ে ঝকঝক করে জ্বলতে থাকে, মন ভরে দেখে গুলেরি। বুক ভরা খুশি আর গর্ব নিয়ে ফিরে আসে স্বামীর ঘরে।

প্রতি বছর ফসল তোলার সময় গুলেরি তার বাপের বাড়ি যায়। বাবা মা লাকারমান্ডিতে লোক পাঠিয়ে দেয় মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য। গুলেরির আরও দুই বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে চাম্বার বাইরে। বছরের এ সময়ে তারাও বেড়াতে আসে। বিশেষ এই দিনটির জন্য সারাটা বছর তারা চাতক পাখির তৃষ্ণা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গোণে। তিন বান্ধবী মিলে মেতে ওঠে জম্পেশ আড্ডায়, নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্পে কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দল বেঁধে রাস্তায় নেমে পড়ে। তারপর প্রধান আকর্ষণ শস্য তোলার উৎসব তো আছেই। এ অনুষ্ঠানের জন্য মেয়েরা নতুন জামা বানায়। দোপাট্টায় রঙ করে, মাড় দেয়, অভ্র লাগায়। কেনে কাঁচের চুড়ি আর রূপোর কানের দুল।

উৎসব কবে আসবে সে জন্য সবসময় দিন গুনতে থাকে

গুলেরি। যখন শরতের বাতাস আকাশের বুক থেকে সরিয়ে দেয় বর্ষার কালো মেঘ, চাম্বার কথা মনে পড়তে থাকে গুলেরির। দৈনন্দিন কাজগুলো নিয়মিত করে যায় সে–গরু-বাছুর খাওয়ানো, শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য রান্না, তারপর হিসেব করতে বসে আর ক'দিন পরে বাপের বাড়ি থেকে লোক আসবে তাকে নিয়ে যেতে।

আবার বাবার বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে। ঘোটকীটাকে আদর করে গুলেরি, বাপের বাড়ির চাকর নাটুকে উৎফুল্ল মুখে স্বাগত জানায়, পরদিন যাত্রা করার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

গুলেরির চেহারা খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

ওর স্বামী, মানক হুঁকাটা হাতে নিয়ে চোখ বুজে টানতে লাগল। তার মুখ গম্ভীর। কেন, বোঝা যাচ্ছে না।

'চাম্বার মেলায় তুমি যাবে না?' জানতে চাইল গুলেরি। মিনতি ফুটল কণ্ঠে, 'অন্তত একটা দিনের জন্যে হলেও এসো।' মানক হুঁকার কলকি নামিয়ে রাখল, কিছু বলল না।

'আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?' ঝাঁঝিয়ে উঠল গুলেরি।

'তোমাকে একটা কথা বলি?'

'তুমি কী বলবে তা জানাই আছে।'

'বাপের বাড়ি যাবে। সে প্রতিবছরই তো যাচ্ছ।'

'তা হলে এবার যেতে মানা করছ কেন?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠ গুলেরির।

'শুধু এবারে যেয়ো না।'

'তোমার মা তো কিছু বললেন না। তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?' ভুরু কোঁচকাল গুলেরি।

'আমার মা...' কথাটা শেষ করল না মানক, চুপ করে রইল।

পরদিন সকালের আলো ফোটার আগেই সেজেগুজে তৈরি হয়ে গেল গুলেরি। তার সন্তান নেই। ফলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কিংবা শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে বাচ্চাকাচ্চা রেখে যাওয়ার ঝামেলা

থেকে সে মুক্ত। নাটু ঘোটকীর পিঠে জিন চাপাল। গুলেরি মানকের বাবা-মা'র কাছ থেকে বিদায় নিল। তাঁরা পুত্রবধূর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

'তোমাকে কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দিতে যাব আমি,' বলল মানক। উৎফুল্ল মনে বেরিয়ে পড়ল গুলেরি। দোপাট্টার আড়ালে মানকের বাঁশি নিতে ভোলেনি।

খাজ্জার গ্রামের পর, রাস্তা ঢাল বেয়ে নেমে গেছে চাম্বার দিকে। এখানে এসে দোপাট্টার নীচে থেকে বাঁশি বের করে মানককে দিল গুলেরি। মানকের হাত ধরে বলল, 'এবার তোমার বাঁশি বাজাও!' কিন্তু মানক গভীর চিন্তায় মগ্ন, গুলেরির কথা কানে যায়নি। 'তুমি বাঁশি বাজাচ্ছ না কেন?' বিরক্ত হলো গুলেরি। মানক ম্লান চোখে একবার তাকাল স্ত্রীর দিকে, তারপর ঠোঁটে তুলল বাঁশি। করুণ একটা সুর তুলল।

'গুলেরি, যেয়ো না,' অনুনয় করল মানক। 'আবারও বলছি এবার যেয়ো না।' বাঁশিটি স্ত্রীকে ফেরত দিল সে, বাজাতে পারছে না।

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল গুলেরি। 'তুমি তো মেলার দিন আসছই। তখন এক সঙ্গে বাড়ি ফিরব আমরা। কসম, আরেকটা দিন থাকার জন্য বায়না ধরব না।'

মানক আর অনুরোধ করল না।

রাস্তার পাশে থামল ওরা। নাটু ঘোটকীটিকে নিয়ে কয়েক কদম সামনে বাড়ল দম্পতিটিকে একা কথা বলার সুযোগ দিয়ে। মানকের মনে পড়ে গেল সাত বছর আগে, এই রাস্তা দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে চাম্বায় যাচ্ছিল সে উৎসব দেখতে। মেলায় সাক্ষাৎ হয় গুলেরির সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই প্রেমের মত ব্যাপারটি ঘটে যায় তাদের মধ্যে। তারপর, একা কথা বলার সুযোগ করে নিয়ে মানক

গুলেরির হাত ধরে বলেছিল, 'তুমি যেন অপক্ক শস্য–দুধে ভর্তি।'

'মোষের দল অপক্ক শস্য খেতেই ভালবাসে,' এক ঝটকায় নিজের হাত ছুটিয়ে নিয়ে বলেছিল গুলেরি। 'সম্পন্ন খায় সিদ্ধ করে। আমাকে পেতে চাইলে আমার বাবার কাছে যাও। গিয়ে বলো আমার হাত ধরতে চাও।'

মানকদের গোত্রে বিয়ের আগে কন্যাপক্ষকে যৌতুক দিতে হয়। মানক চিন্তিত ছিল গুলেরির বাবা তাঁর মেয়ের জন্য কত টাকা দাবি করে বসেন ভেবে। গুলেরির বাবা সম্পন্ন গৃহস্থ, শহরে থেকেছেন অনেকদিন, যৌতুক প্রথায় বিশ্বাসী নন। মেয়েকে একটি ভাল পরিবারের সুপাত্রের হাতে তুলে দিতে পারলেই তাঁর চাইবার কিছু ছিল না। আর মানকের মাঝে সে সব গুণ ছিল। ফলে গুলেরির গলায় মালা পরাতে বেশি সময় লাগেনি। সেই সব দিনের কথা ভাবছিল মানক, কাঁধে গুলেরির হাতের স্পর্শ পেয়ে চমক ভাঙল।

'এতক্ষণ কোন্ স্বপ্নের মধ্যে ডুবে ছিলে?' ঠাট্টা করল গুলেরি। জবাব দিল না মানক। ঘোটকী চিঁহিঁহিঁ করে উঠল অধৈর্য ভঙ্গিতে। গুলেরি বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

'নীলঘণ্টার মঙ্গলের কথা শুনেছ, না?' জিজ্ঞেস করল সে। 'এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে। ওখানে যে যায় সে নাকি আর কানে শুনতে পায় না।'

'শুনেছি।'

'তোমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সেই জঙ্গল থেকে ঘুরে এসেছ; আমি যা বলছি কোনকিছুই তোমার কানে যাচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেছ, গুলেরি। তুমি কী বলছ কিছুই শুনতে পাইনি আমি,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মানক।

ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল। কেউ জানে না অপরজন

কী ভাবছে। 'আমি এখন যাব। তুমি বাড়ি যাও। অনেকখানি রাস্তা এসেছ।' মৃদু গলায় বলল গুলেরি।

'এতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে এলে। বাকিটুকু ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাও।' বলল মানক।

'এই নাও তোমার বাঁশি।'

'তুমি এটা নিয়ে যাও।'

'মেলার দিন এসে বাজাবে তো?' হাসিমুখে জানতে চাইল গুলেরি। সূর্যরশ্মি ঝিকমিক করছে ওর কালো চোখের তারায়। মানক অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। অবাক হলো গুলেরি, কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর চাম্বার রাস্তা ধরল। মানক ফিরে এল নিজের বাড়ি। ঘরে ঢুকে ধপ করে বসে পড়ল চারপাইতে।

'এতক্ষণ পরে এলি,' খেঁকিয়ে উঠলেন মা, 'চাম্বা পর্যন্ত গিয়েছিলি নাকি?'

'না। শুধু পাহাড় পর্যন্ত।' ভারী গলা মানকের।

'বুড়িদের মত অমন গোমড়ামুখো হয়ে আছিস কেন?' ধমক দিলেন মহিলা। 'হাসিখুশি থাকতে পারিস না?'

মানক বলতে চাইল হাসিখুশি থাকার মত অবস্থা তো তুমি তৈরি করোনি, তা হলে থাকতাম। কিন্তু কিছু বলল না সে। নিশ্চুপ হয়ে রইল।

মানক আর গুলেরির বিয়ে হয়েছে সাত বছর। এখনও মা হতে পারেনি গুলেরি। মানকের মা কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এরকম অবস্থা তিনি চলতে দেবেন না। ঘরে নাতি দেখতে চান তিনি। দেখবেনই।

কিছু দিনের মধ্যে আট বছরে পড়বে মানকের দাম্পত্য জীবন। মানকের মা ছেলেকে পাঁচশো রুপী দিয়েছেন আরেকটি

বিয়ে করার জন্য। তিনি আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। অপেক্ষা করছিলেন কখন গুলেরি তার বাপের বাড়ি যাবে আর তিনিও নতুন পুত্র বধূ ঘরে নিয়ে আসবেন।

মা ও সামাজিক প্রথার একান্ত অনুগত মানকের শরীর সাড়া দিল নতুন নারীটির জন্য, তবে মন নয়।

এক সকালে হুঁকা ফুঁকছে মানক দাওয়ায় বসে, দেখল তার পুরানো এক বন্ধু যাচ্ছে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। 'ওহে, ভবানী,' হাঁক ছাড়ল সে। 'এত সকাল সকাল চললে কোথায়?'

দাঁড়াল ভবানী। কাঁধে ছোট একটি পুঁটুলি। 'তেমন কোথাও না।' নিরুত্তাপ কণ্ঠ তার।

'তা হলে আর তাড়া কীসের? এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাও,' আমন্ত্রণ জানাল মানক।

ভবানী দাওয়ায় এসে হাঁটু গেড়ে বসল, হুঁকাটা নিল মানকের হাত থেকে। কিছুক্ষণ হুঁকা ফুঁকে শেষে বলল, 'আমি চাম্বার মেলায় যাচ্ছি।'

ছোরার খোঁচা খেল যেন মানক হৃৎপিণ্ডে।

'আজ মেলা নাকি?'

'প্রতি বছর এ সময়ই মেলা হয়,' শুকনো গলায় জবাব দিল ভবানী। 'মনে নেই সাত বছর আগে আমরা একসঙ্গে মেলায় গিয়েছিলাম?' ভবানী আর কিছু বলল না তবে মানক ওর নিরুত্তাপ আচরণের কারণ ঠিকই বুঝতে পারছে। অস্বস্তি লাগছে। ভবানী কল্কে নামিয়ে রাখল মাটিতে, পুঁটুলি তুলে নিল কাঁধে। পুঁটুলির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে একটি বাঁশি। মানককে বিদায় জানিয়ে সে নিজের রাস্তা ধরল। ওকে যতক্ষণ দেখা গেল, বাঁশির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল মানক।

পরদিন বিকেলে মাঠে কাজ করছে মানক, ভবানীকে দেখতে পেল। আসছে এদিকেই। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল মানক। ভবানীর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। তবে ভবানী সোজা ওর সামনে চলে এল, বসল। চেহারা ম্লান।

'গুলেরি মারা গেছে,' বিষণ্ন গলায় বলল ভবানী।

'কী?'

'তোমার দ্বিতীয় বিয়ের কথা শুনে মেয়েটা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

মানকের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল, বিস্ফারিত চোখে শুধু তাকিয়ে রইল ভবানীর দিকে। মুখে রা ফুটল না। বুকের ভিতরটা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

দিন যায়। মানক মাঠে কাজ করে ফিরে আসে বাড়িতে। চুপচাপ খেয়ে উঠে যায়। একটি কথাও বলে না। মরা মানুষের মত হয়ে গেছে সে। চেহারা অভিব্যক্তিশূন্য, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। 'আমি যেন ওর বউ নই,' অনুযোগ করে মানকের দ্বিতীয় স্ত্রী। 'যেন জোর করে ওর কাছে গছিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাকে।' তবে কিছুদিনের মধ্যে গর্ভবতী হয়ে পড়ল সে, মানকের মা'র খুশি আর ধরে না। নতুন পুত্রবধূর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তিনি। ছেলেকে জানালেন ঘরে নতুন অতিথি আসছে, কিন্তু মানকের চেহারা ভাবলেশহীন হয়ে রইল, চোখের ফাঁকা চাউনিরও কোনও পরিবর্তন ঘটল না।

শাশুড়ি পুত্রবধূকে সাহস যোগালেন। বললেন সন্তান জন্ম নেওয়ার পরে বাচ্চাকে বাপের কোলে বসিয়ে দিলেই মানকের মন-মেজাজের পরিবর্তন হবে।

যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল মানকের স্ত্রী। মানকের মা অত্যন্ত খুশি মনে নাতিকে স্নান করালেন, সুন্দর জামা

কাপড় পরিয়ে বসিয়ে দিলেন ছেলের কোলে। স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকল মানক পাথর মুখ নিয়ে। হঠাৎ তার শূন্য চোখে ফুটল আতঙ্ক, চিৎকার করতে লাগল সে মৃগী রোগীর মত, 'ওকে নিয়ে যাও! ওর গা থেকে কেরোসিনের গন্ধ আসছে!'

মূল: অমৃতা প্রীতম

অনুবাদ: অনীশ দাস অপু

মহানগর

মহানগরটি অপেক্ষা করছে কুড়ি হাজার বছর ধরে। মহাশূন্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে গ্রহটি, মাঠে ফুটছে ফুল আবার ঝরে যাচ্ছে, তবু অপেক্ষা করে রয়েছে মহানগর। গ্রহটির নদীগুলো কুলুকুলু ধারায় বইছে, শুকিয়ে যাচ্ছে একসময়, মিশে যাচ্ছে ধুলোয়।

তবুও অপেক্ষার পালা শেষ হয় না মহানগরটির। তাজা বাতাস হয়ে আসছে আঁশটে, আকাশের ছেঁড়া মেঘগুলো একাকী ভেসে বেড়ায় অলস সাদায়। তবু প্রতীক্ষার প্রহর গুণে চলে মহানগর।

মহানগরটি অপেক্ষা করছে তার জানালা, কালো আগ্নেয় শিলার দেয়াল আর আকাশ ছোঁয়া উঁচু ইমারত নিয়ে। তার রাস্তা সর্বদা জনমানবশূন্য, দরজার হাতলে বহু কাল কারও হাতের স্পর্শ পড়েনি। মহানগর অপেক্ষা করছে তখনও যখন গ্রহটি তার নীলচে-সাদা সূর্যের কক্ষপথে আবর্তন করছে, পার হয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঋতু, বরফ রূপান্তরিত হচ্ছে আগুনে, আবার ফিরে যাচ্ছে বরফের চেহারায়, তারপর পরিণত হচ্ছে সবুজ মাঠে এবং হলুদ গ্রীষ্মের তৃণভূমিতে।

কুড়ি হাজার বছর পরে, এক গ্রীষ্মের বিকেলে অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটল মহানগরের।

আকাশের পটভূমে উদয় হলো একটি রকেট।

মাথার অনেক ওপরে ভেসে বেড়াল রকেট, পাক খেল, আবার ফিরে এল, অবতরণ করল আগ্নেয় পাথরের তৈরি দেয়াল থেকে পঞ্চাশ গজ দূরের নরম শিলার জমিনে।

পাতলা ঘাসে শোনা গেল বুট পরা জুতোর শব্দ এবং মনুষ্য কণ্ঠ। কেউ কাউকে ডাকছে।

'রেডি?'

'অলরাইট, মেন। সাবধান! সবাই শহরে প্রবেশ করবে। জেনসেন, তুমি এবং হাচিসন সবার আগে থাকবে। পাহারা দেবে, চোখ-কান খোলা রেখো।'

কালো দেয়ালের মাঝে মহানগরের লুকানো নাক খুলে গেল, শরীরের গভীরে কোথাও গুপ্ত একটি সাকশন ভেন্ট থেকে ফুউউশ করে বেরিয়ে এল বাতাস। মিশে গেল বাইরের গরম হাওয়ায়।

'আগুনের গন্ধ, ছিটকে পড়া ধূমকেতুর মত গন্ধ, গরম ধাতব। অন্যভুবন থেকে একটি জাহাজ এসেছে। পিতলের গন্ধ, পোড়া পাউডারের গন্ধ, সালফার, রকেটের গন্ধকের গন্ধ।'

এ তথ্যগুলো টেপে ফুটল। টেপ আটকানো চাকাঅলা স্লটের সঙ্গে। হলুদ চাকাঅলা খাঁজ বেয়ে খবর পৌঁছে গেল অন্যান্য মেশিনে।

(ক্লিক-ক্লিক-চাক-চাক)

একটি ক্যালকুলেটর মেটরনম বা তাল নির্দেশ করার যন্ত্রের মত শব্দ করল। পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়। ন'জন লোক! একটি টাইপরাইটার তাৎক্ষণিকভাবে এ মেসেজটি ফুটিয়ে তুলল টেপে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল টেপের লেখা।

(ক্লিকিটি-ক্লিক-চাক-চাক)

ওদের রাবারের বুটের শব্দ শোনার অপেক্ষা করছে মহানগর।

মহানগরের নাকের ফুটো আবার প্রসারিত হলো।

মাখনের গন্ধ। মহানগরের মনে পড়ে গেল কুড়ি হাজার বছর আগে সে গন্ধ পেত দুধ, পনির, আইসক্রিম এবং মাখনের।

(ক্লিক-ক্লিক)

'সবাই, সাবধান!'

'জোনস, তোমার অস্ত্র বের করে রাখো। বোকামি কোরো না।'

'শহরটা তো মৃত; তা হলে ভয় কীসের?'

'কে জানে এটা জীবিত নাকি মৃত!'

লোকের কথা কানে যেতে কান খাড়া করল মহানগর। শতাব্দীর পর শতাব্দী সে শুধু শুনেছে বাতাস বইবার আবছা শব্দ, গাছ থেকে পাতা খসে পড়ার আওয়াজ। এবারে মানুষের গলা শুনতে পেয়ে জং ধরা কানে তেল লাগাল মহানগর যাতে কণ্ঠগুলো পরিষ্কার শুনতে পায়। কান কথা শুনছে, নাক গন্ধ নিচ্ছে।

বাতাসে ভীত মানুষের ঘামের গন্ধ। বগলে ঘামের গন্ধ। তাদের হাতে ধরা অস্ত্রের ঘাম।

নাক গন্ধ শুঁকছে।

ক্লিক-ক্লিক-চাক-ক্লিক

তথ্য পৌঁছে গেল প্যারানাল চেক টেপে। ঘাম; ক্লোরাইড, সালফেট, ইউরিয়া, নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন—আর নানান কিসিমের গন্ধ।

অকস্মাৎ ঘণ্টা বাজার শব্দে চমকে উঠল ছোট দলটি। বিরাট কানজোড়া শুনল:

'আমাদের বোধহয় রকেটে ফিরে যাওয়া উচিত, ক্যাপ্টেন।'

'অর্ডার আমি দেব, মি.স্মিথ।'

'জ্বী, সার।'

'এই যে, তুমি! পেট্রিন! কিছু চোখে পড়ল?'

'না, সার। মনে হচ্ছে এখানকার সবকিছু বহু আগেই মরে সাফ হয়ে গেছে।'

'দেখলে তো, স্মিথ! ভয়ের কিছু নেই।'

'কিন্তু আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তবে জানি না কেন। এরকম ভুতুড়ে জায়গা আর কখনও দেখেছেন? শহরটাও কেমন পরিচিত ঠেকছে। মনে হচ্ছে এর ছবি আগে কোথায় যেন দেখেছি!'

'বোকার মত কথা বোলো না। এ গ্রহ পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে। এখানে এর আগে কোনদিন আসিনি আমরা।'

'কিন্তু আমার গা-টা কেমন ছমছম করছে, সার। মনে হচ্ছে রকেটে ফিরে গেলেই ভাল হত।'

মিলিয়ে এল পায়ের শব্দ। বাতাসে কেবল অনুপ্রবেশকারীদের নিঃশ্বাসের শব্দ।

কান শব্দগুলো শুনল এবং মহানগরের শরীর কাজ শুরু করে দিল দ্রুত। ঘুরতে শুরু করল রোটর ব্লেড, ভালব এবং ব্লোয়ারের মাঝ দিয়ে ঢুকল তরল পদার্থ। একটু পরে শহরের মস্ত দেয়ালের বিরাট ফুটো অর্থাৎ নাক এবং কানের ছিদ্র দিয়ে বের করে দিল তাজা বাতাস।

'গন্ধ পাচ্ছ, স্মিথ! আহ্, সবুজ ঘাসের গন্ধ! ইস্, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু গন্ধ নিতে ইচ্ছে করছে।'

অদৃশ্য ক্লোরোফিল প্রবাহিত হলো লোকগুলোর গায়ে।

'আহ্হ!'

পায়ের শব্দ আগের মতই শোনা যাচ্ছে।

'গন্ধটা খারাপ নয়, কী বলো, স্মিথ? এসো।'

মহানগরের কান এবং নাকের পেশীতে ঢিল পড়ল। উদ্দেশ সফল হয়েছে। দাবার গুটি পছন্দসই জায়গায় এগোচ্ছে।

এবারে মহানগরের চোখে জমে থাকা কুয়াশা আর বাষ্পের মেঘ উড়ে গেল।

'ক্যাপ্টেন, জানালা!'

'কী?'

'ওই জানালাগুলো। ওগুলোকে আমি নড়তে দেখেছি।'

'কই আমি তো কিছু দেখলাম না!'

'জানালাগুলো নড়াচড়া করেছে। বদলে ফেলেছে রং। গাঢ় থেকে হালকা হয়েছে রং।'

'কিন্তু আমার কাছে তো এগুলো সাধারণ চৌকোনা জানালা বলেই মনে হচ্ছে।'

আবছা জিনিসগুলোর ওপর দৃষ্টি দিল মহানগর। শহরের মেকানিক্যাল খাদের মধ্যে পড়ে থাকা অয়েল শ্যাকগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠল, ব্যালান্স হুইল ডুব দিল সবুজ তেলের পুকুরে। জানালার ফ্রেমগুলো ফুলে উঠল। চকচক করে উঠল জানালা।

নীচে, রাস্তায়, দু'জন লোক হাঁটছে। তাদের পেছনে আরও সাতজনের একটা দল। এদের পরনের ইউনিফর্মের রঙ সাদা, মুখগুলো গোলাপি, যেন চড় মেরে রাঙিয়ে দেয়া হয়েছে; চোখের রঙ নীল। শিরদাঁড়া টানটান করে, পেছনের পায়ে ভর করে হাঁটছে তারা, হাতে ধাতব অস্ত্র। পায়ে বুটজুতো। এরা সবক'টা পুরুষ।

কেঁপে উঠল জানালা। সরু হয়ে এল জানালা। যেন অগ্নিগোলকের মধ্যে মোচড় খেল অসংখ্য চোখ।

'ক্যাপ্টেন, বিশ্বাস করুন, ওগুলো সত্যিকারের জানালা নয়!'

'আহ্, হাঁটো তো।'

'আমি ফিরে যাচ্ছি, সার।'

'কী?'

'আমি রকেটে ফিরছি।'

'মি. স্মিথ?'

'আমি কোনও ফাঁদে পা দিতে চাই না!'

'একটা শূন্য শহরকে ভয় পাচ্ছ?'

অন্যরা হেসে উঠল। তবে নিষ্প্রাণ হাসি।

'হাসো, হাসো!'

পাথরের রাস্তা। তিন ইঞ্চি চওড়া, ছয় ইঞ্চি লম্বা পাথুরে ব্লক কেটে তৈরি করা হয়েছে রাস্তা। রাস্তাটি অনুপ্রবেশকারীদের শরীরের ওজন মাপল।

একটি মেশিন সেলারে একটি লাল লাঠি স্পর্শ করল একটি সংখ্যাঃ ১৭৮ পাউণ্ড...২১০, ১৫৪, ২০১, ১৯৮—প্রতিটি লোকের গায়ের ওজন রেকর্ড হয়ে গেল যন্ত্রে।

মহানগর এখন পুরোপুরি জেগে উঠেছে!

ভেন্ট বা ফোকর এখন বাতাস টানছে এবং বের করে দিচ্ছে। বাতাসে অনুপ্রবেশকারীদের মুখের তামাকের গন্ধ, হাতে সাবানের গন্ধ। এমনকী তাদের চোখের মণিরও রয়েছে সূক্ষ্ম গন্ধ। মহানগর গন্ধগুলো চিহ্নিত করতে পারছে, এবং এ তথ্য দিয়ে লোকগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যাচ্ছে। চকচকে জানালাগুলো চমকাচ্ছে। মহানগরের শ্রবণেন্দ্রিয় এড়িয়ে যেতে পারছে না সূক্ষ্মতম কোনও আওয়াজও। লোকগুলোর হৃদস্পন্দন পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে সে। ওদেরকে সে দেখছে, পরীক্ষা করছে।

রাস্তাগুলো যেন মহানগরের জিভ, লোকগুলো হেঁটে যাচ্ছে, তাদের জুতোর স্বাদ গ্রহণ করছে রাস্তা, পাথরের সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মাঝ দিয়ে ঢুকে গেল ওটা, লিটমাস পেপারে পরীক্ষা করা হলো স্বাদের নমুনা। এই নমুনার সঙ্গে মানুষগুলোর অন্যান্য নমুনা যোগ

করা হলো। এখন চূড়ান্ত বিশ্লেষণের অপেক্ষা।

পায়ের শব্দ আসছে। দৌড়াচ্ছে কেউ।

'ফিরে এসো, স্মিথ!'

'না, জাহান্নামে যান আপনি।'

'ওকে তোমরা ধরো।'

ছুটে আসছে পায়ের আওয়াজ।

এবারে চূড়ান্ত পরীক্ষা। মহানগর শুনেছে, দেখেছে, স্বাদ নিয়েছে, অনুভব করেছে, ওজন মেপেছে, ব্যালান্স করেছে, এখন শেষ কাজটি বাকি।

রাস্তার মাঝখানটায় হঠাৎ একটা গর্তের সৃষ্টি হলো। ক্যাপ্টেন ছুটতে গিয়ে সেই গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। কেউ দেখল না তাঁকে গ্রাস করেছে রাস্তা।

একটা ধারাল ফলা এগিয়ে এল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে, আরেকটা ঢুকে গেল তাঁর বুকে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর পেট ফেড়ে বের করে আনা হলো নাড়িভুঁড়ি। রাস্তার নীচে, লুকানো একটি প্রকোষ্ঠে, টেবিলের ওপর শুইয়ে দেয়া হলো ক্যাপ্টেনের লাশ। ক্রিস্টালের প্রকাণ্ড মাইক্রোস্কোপ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রক্তাক্ত পেশীর দিকে, আঙুল ঢুকে গেল তখনও ধক্ ধক্ করতে থাকা হৃৎপিণ্ডে। ক্যাপ্টেনের গা থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হলো ছাল-চামড়া, টুকরো টুকরো করে কাটা হলো দেহ।

রাস্তার ওপরে লোকগুলো তখনও ছুটছে। দৌড়াচ্ছে স্মিথ, চেঁচাচ্ছে তার সঙ্গের লোকগুলো। স্মিথও পাল্টা চিৎকার দিল। আর রাস্তার নীচের গোপন কক্ষে বিভিন্ন মাইক্রোস্কোপের স্লাইডের নীচে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ক্যাপ্টেনের খণ্ডিত লাশ। মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষা করে দেখছে ওগুলো। ক্যাপ্টেনের রক্ত নেয়া হচ্ছে ক্যাপসুল ভর্তি করে। কাউন্ট করা হচ্ছে, মাপা হচ্ছে

শরীরের তাপমাত্রা, সতেরোটি খণ্ডে টুকরো করা হলো হৃৎপিণ্ড, দ্বিখণ্ডিত হলো লিভার এবং কিডনি। মগজের মধ্যে ঢোকানো হলো ড্রিল মেশিন, বের করে আনা হলো ব্রেন। সুইচবোর্ডটা থেকে নষ্ট তার টেনে বের করার মত ক্যাপ্টেনের শরীরের শিরাগুলো বের করে আনা হলো। অবশেষে অবসান ঘটল পরীক্ষার।

এরা মানুষ। এরা বহু দূরের এক জগৎ থেকে এসেছে, নির্দিষ্ট একটি গ্রহে এদের নিবাস, এদের রয়েছে নির্দিষ্ট চোখ, কান, তারা পায়ের ওপর ভর করে বিশেষ একটি ভঙ্গিমায় হাঁটে এবং সঙ্গে বহন করে অস্ত্র। তারা চিন্তা করতে পারে, পারে লড়াই করতে এবং এদের বিশেষ হৃৎপিণ্ডসহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যা আছে এসব কিছুই বহুদিন আগে রেকর্ড করা হয়েছে।

রাস্তার ওপরে লোকগুলো রকেটের দিকে ছুটছে।

দৌড়াচ্ছে স্মিথ।

এরা আমাদের শত্রু। এদেরকে নাগালে পাবার জন্যই গত কুড়ি হাজার বছর ধরে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এ লোকগুলোর ওপর প্রতিশোধ নিতে আমরা আকুল হয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছিলাম। সব খাপে খাপে মিলে গেছে। এ লোকগুলো এসেছে পৃথিবী নামের একটি গ্রহ থেকে। এরা কুড়ি হাজার বছর আগে টাওলানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এরা আমাদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিল এবং এক মহামারী ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ মহামারীর কবল থেকে বাঁচার জন্য তারা আরেকটি গ্যালাক্সিতে পালিয়ে যায়। ততদিনে আমাদের গ্রহটি পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। কারণ মানুষগুলো আমাদের সব কিছু লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা ওই যুদ্ধ এবং ওই সময়টাকে ভুলে গেছে, বিস্মৃত হয়েছে আমাদের কথা। কিন্তু আমরা ওদেরকে

ভুলিনি। এরা আমাদের শত্রু। আমরা ওদেরকে অবশেষে বাগে পেয়েছি। আমাদের অপেক্ষার পালা সাঙ্গ হয়েছে।

'স্মিথ, ফিরে এসো!'

রাস্তার নীচের গোপন কুঠরির লাল টেবিলের ওপর ক্যাপ্টেনের খণ্ড বিখণ্ড লাশে প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে। দেহের দুই পাশে গজিয়ে গেল একজোড়া নতুন হাত। শরীরের ভেতরে তামা, পিতল, রূপা, অ্যালুমিনিয়াম, রাবার এবং সিল্ক দিয়ে অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গগুলো দ্রুত তৈরি হয়ে গেল। মাকড়সার জাল দিয়ে শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হলো ছাল ছাড়ানো চামড়া, স্থাপিত হলো নতুন হৃৎপিণ্ড, খুলির মধ্যে বসল প্লাটিনাম ব্রেন। এ ব্রেন বা মগজ থেকে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে নীলচে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তার দিয়ে হাত এবং পা সেলাই করে দেয়া হলো। সেলাই করা হলো ঘাড়, গলা এবং খুলি–নিখুঁত নতুন একটি শরীর তৈরি হয়ে গেল অবিশ্বাস্য দ্রুততম সময়ে।

টেবিলে উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন, হাতের পেশি ফোলালেন।

'থামো!'

রাস্তায় আবার হাজির হয়েছেন ক্যাপ্টেন, পিস্তল তুলেই তিনি গুলি করলেন।

গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় কলজে নিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল স্মিথ।

অন্যরা ঘুরে দাঁড়াল।

ক্যাপ্টেন ওদের দিকে দৌড়ে গেলেন।

'ওটা একটা গাধা! শব্দের ভয় পায়!'

ওরা পায়ের নীচে পড়ে থাকা স্মিথের নিথর শরীরে তাকাল।

তারপর তারা তাদের ক্যাপ্টেনের দিকে মুখ তুলে চাইল। সরু হয়ে এল চাউনি।

'আমার কথা শোনো,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'তোমাদের সঙ্গে আমার খুব জরুরী কিছু কথা আছে।'

মহানগর তার সমস্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্য ব্যয় করেছে একজনকে রক্ষা করার জন্য, তাকে দিয়ে কথা বলানোর ক্ষমতা দিতে। তবে ভেতরে পুঞ্জীভূত ঘৃণা এবং ক্রোধ থাকলেও সে শান্তস্বরে কথা বলল।

'আমি আর তোমাদের ক্যাপ্টেন নই,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'এমনকী আমি মানুষও নই।'

এক কদম পিছিয়ে গেল লোকগুলো।

'আমি মহানগর,' বলে হাসলেন তিনি।

'আমি দুশো শতক ধরে অপেক্ষা করেছি,' বললেন তিনি। 'আমি অপেক্ষা করেছি পুত্রদের পুত্রদের পুত্ররা কবে ফিরে আসবে সে জন্য।'

'ক্যাপ্টেন, সার!'

'আমাকে বলতে দাও। আমাকে অর্থাৎ এ মহানগরকে কে তৈরি করেছে? আমাকে যারা তৈরি করেছে তারা মারা গেছে। সেই প্রাচীন জাতি একসময় এখানে বাস করত। আর এই মানুষগুলোকে পৃথিবীর লোকেরা ভয়ংকর এক মহামারীর মধ্যে ফেলে রেখে চলে যায়। সেই প্রাচীন জাতি স্বপ্ন দেখত পৃথিবীর মানুষ আবার ফিরে আসবে, তাদেরকে উদ্ধার করবে। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। এই মহানগরকে তৈরি করা হয়েছিল ব্যালান্সিং মেশিন হিসেবে, এর আছে লিটমাস পেপার এবং একটি অ্যান্টেনা যার সাহায্যে ভবিষ্যতের সব মহাশূন্য ভ্রমণকারীকে সে পরীক্ষা করে দেখতে পারত। গত কুড়ি হাজার বছরে মাত্র দু'টি রকেট এসে এখানে অবতরণ করে। একটি বহু দূরের গ্যালাক্সি ইনট থেকে। ওই স্পেস ক্রাফটের অভিযাত্রীদের পরীক্ষা করা হয়

ওজন নেয়া হয়। কিন্তু মহানগরের মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে না দেখে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় শিপের অভিযাত্রীরাও এভাবে রেহাই পেয়ে যায়। কিন্তু আজ! দীর্ঘদিন বাদে তোমরা এলে! এবারে প্রতিশোধ গ্রহণের পালা। দুইশো শতক আগে এ শহরের মানুষগুলো মারা গেছে, কিন্তু তারা একটি মহানগর রেখে গেছে তোমাদেরকে স্বাগত জানাতে।

'ক্যাপ্টেন, সার, আপনার শরীর বোধহয় ঠিক নেই। আপনি বরং শিপে এসে একটু বিশ্রাম করুন, সার।'

দুলে উঠল মহানগর।

দুই ভাগ হয়ে গেল রাস্তা। প্রকাণ্ড গর্তের মধ্যে ঝুপঝুপ করে পড়ে গেল লোকগুলো চিৎকার করতে করতে। গর্তের মধ্যে ছিটকে পড়ছে, দেখল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ধারাল ফলা ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে। রোল কল শুরু হলো:

'স্মিথ?'

'এই যে আছি।'

'জেনসেন?'

'হাজির।'

'জোনস, হাচিসন, স্প্রিগার?'

'হাজির, হাজির, হাজির।'

সবাই মিলে দাঁড়াল রকেটের দরজায়।

'আমরা এক্ষুণি ফিরে যাব পৃথিবীতে।'

'জ্বী, সার!'

এদের সবার ঘাড়ের পেছনে প্রায় অদৃশ্য একটা করে কাটা দাগ আছে, তাদের হৃৎপিণ্ড পেতলের তৈরি, প্রত্যঙ্গগুলো রুপোর

এবং শিরাগুলো বানানো হয়েছে সোনালি, সূক্ষ্ম তার দিয়ে। তাদের মগজে মৃদু ইলেকট্রিক গুঞ্জন চলছে।

'ডাবল মার্চ!'

নয়জন লোক দ্রুত মহামারীর সোনালি রঙের বোমাগুলো এনে ঢোকাল রকেটে।

'এগুলো পৃথিবীতে ফেলতে হবে।'

'জ্বী, সার!'

রকেটের ভালভ সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। রকেট লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শূন্যে।

রকেটের গর্জন প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে, মহানগর শরীর এলিয়ে দিল সমভূমির গায়ে। তার কাচের মত চোখগুলোর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল। শিথিল হলো শ্রবণেন্দ্রিয়, নাকের প্রকাণ্ড ছিদ্রগুলো বুজে এল, রাস্তাগুলোকে আর কারও ওজন নিতে হবে না। আর লুকানো যন্ত্রপাতিগুলো ডুব দিল তেলের মধ্যে।

আকাশে রকেটটা এখন ফুটকির মত লাগছে।

ধীরে ধীরে, আনন্দের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে করতে মহানগর ভাবল, 'আহ্, মরণ কত সুখের!'

মূল: রে ব্রাডবারি
রূপান্তর: অনীশ দাস অপু

আয়ারল্যাণ্ডে সাপ নেই

ঘড়িতে তখন সকাল ছ'টা বেজে বিশ মিনিট। আয়ারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্গর শহরের স্টেশন চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে হরেকৃষ্ণ রামলাল। খানিকক্ষণ আগে একটি লক্কর-ঝক্কড় মার্কা ট্রাক এসে থেমেছে সেখানে, তার চারদিকে এসে জড়ো হয়েছে ডজন খানেক শ্রমিক। সম্ভবত ওই লোকগুলোই তার সহকর্মী। রামলাল নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই দলের ফোরম্যানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

রামলাল ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের অধিবাসী। এখানকার বেলফাস্ট শহরের রয়েল ভিক্টোরিয়া মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র সে। শুধুমাত্র স্কলারশিপের টাকায় থাকা-খাওয়া, পড়াশোনা, জামা-কাপড় এতসব খরচ চালানো তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এই গ্রীষ্মের ছুটিতে সে ম্যাক কুইনের কর্মীবাহিনীতে শ্রমিকের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। বেলফাস্ট থেকে বেশ দূরে, ব্যাঙ্গর শহরের এক ঘিঞ্জি গলিতে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে অনেকটা লুকিয়েই ডেমোলিশন কন্ট্রাক্ট-এর ব্যবসা চালাচ্ছেন ম্যাক কুইন। অ্যাসেট বলতে আছে সেই লক্কড়-ঝক্কড় ট্রাক, মান্ধাতার আমলের ভারি কিছু শাবল আর স্লেজ হ্যামার। এসবের সাহায্যে তার কর্মী বাহিনী পিটিয়ে পিটিয়ে পুরানো বিল্ডিং ভেঙে ফেলার কাজ করে। রামলাল জানে, কাজটি খুব শ্রমসাধ্য, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছে সে।

কোথাও চাকরি পায়নি। কেউ মুখ ফুটে না বললেও রামলাল জানে যে তার চামড়ার রঙের কারণেই তাকে চাকরি দেয়া হয়নি। ঠিক একই কারণে ব্যাঙ্গর শহরে থাকার জায়গা পেতেও তাকে যথেষ্ট ঘুরতে হয়েছে। জুলাইয়ের কড়া রোদে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে রেইল স্টেশনের কাছেই একটি মেসে ঘর পেয়েছে সে। গতকাল সকালের মধ্যে বেলফাস্ট থেকে সব জিনিসপত্র এনে সব গোছগাছ করা হয়ে গেছে। ডাক্তারী পাস করে ইন্টার্নী শেষে দেশে ফিরে সাধারণ লোকদের সেবা করবে—একটিই রামলালের স্বপ্ন। যত কষ্টই হোক না কেন এ স্বপ্নকে সে বাস্তবে পরিণত করবেই।

রোজ সকালে দলের ফোরম্যান বিগ বিলি ক্যামেরন স্টেশন চত্বরের এই স্থানটি থেকে সবাইকে নিয়ে কর্মস্থলে চলে যায়। মিনিট দশেক পর বিগ বিলি নিজের গাড়ি চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। বিগ বিলি লম্বায় প্রায় ছ'ফিট তিন ইঞ্চি। তার চওড়া কাঁধের দু'পাশে ঝুলে আছে থামের মত বিশাল বলিষ্ঠ দুটো হাত। রামলাল তার দিকে এগিয়ে গেল।

বিগ বিলি তার দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সাথে প্রশ্ন করল, 'তুমিই সেই কাল্লু, যাকে ম্যাক কুইন চাকরি দিয়েছে?'

রামলাল মাঝপথে থমকে দাঁড়াল। ভেতরে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছে সে। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'হ্যাঁ। আমার নাম রামলাল, হরেকৃষ্ণ রামলাল।'

গালের মাংসের চাপে প্রায় বন্ধ হয়ে আসা চোখ দুটোতে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল বিগ বিলির। মাটিতে থক্ করে এক দলা থুথু ফেলে বলল, 'যাই হোক, ট্রাকে উঠে পড়ো।'

শ্রমিকরা সবাই ট্রাকের পিছনে গিয়ে বসল। ট্রাক ছেড়ে দিল। পথে টমি বার্নস নামে একজন শ্রমিকের সাথে পরিচয় হলো

রামলালের। লোকটি একদম সহজ-সরল। রামলাল হিন্দু শুনে সে আকাশ থেকে পড়ল। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখো, দেখো, এই লোক খিস্টান নয়।' রামলাল হেসে দিল। এই সময় সামনের সীট থেকে বিগ বিলি ঘাড় ঘুরিয়ে তিক্ত স্বরে বলে উঠল, 'হ্যা, হ্যাঁ, বুঝেছি। ব্যাটা পৌত্তলিক।'

রামলালের মুখ থেকে হাসি মুছে গেল।

ট্রাক ছুটে চলল দক্ষিণ দিকে। একসময় তা পাকা রাস্তা ছেড়ে এবড়োখেবেড়ো মেঠো পথ পেরিয়ে এসে থামল নদীর তীরে পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় এক ভবনের সামনে। দুর্ঘটনার ভয়ে কাউণ্টি কাউন্সিল ভবনের মালিককে ভবনটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। ভবনের মালিক কম খরচে কাজ চালানোর জন্যে ম্যাক কুইনকে এ কাজের কণ্ট্রাক্ট দিয়েছে।

বিগ বিলির নির্দেশে সবাই ভারি যন্ত্রগুলো নিয়ে কাজে লেগে গেল। প্রায় চারতলা উঁচু ভবনটি দেখেই রামলাল ঢোক গিলল। বেশি ওপরে কাজ করতে সে ভীষণ ভয় পায়। কিন্তু উপায় নেই; তার অর্থের খুবই প্রয়োজন।

পরবর্তী এক সপ্তাহে ভবনের কাঠামো ছাড়া প্রায় পুরোটাই ভাঙা হয়ে গেল। এই এক সপ্তাহে বিগ বিলি রামলালকে যতভাবে সম্ভব অপমান করেছে। তাকে দিয়ে সবচেয়ে উঁচু জায়গার কঠিন কাজগুলো করিয়েছে। শুধুমাত্র টাকার কথা চিন্তা করে রামলাল এতদিন মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করেছে। কিন্তু আর পারা গেল না।

ঘটনার দিন বিগ বিলি রামলালকে ভবনের সবচেয়ে ওপরের একটি দেয়াল ভাঙার নির্দেশ দিল। কিন্তু সেখানকার মেঝেতে একটি বড় ফাটল লক্ষ্য করে রামলাল তাকে বলল যে সেখানে একা দাঁড়িয়ে কাজ করা মোটেও নিরাপদ হবে না।

শুনেই খ্যাঁক করে উঠল বিগ বিলি, আমাকে কাজ বোঝাতে এসো না। তোমাকে যা বলব তাই করবে, ইউ স্টুপিড নিগার!'

রামলালের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে থমথমে গলায় বলল, 'একটি কথা তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, ক্যামেরন। আমি একজন ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা গোত্রের সদস্য। আমি গরিব হতে পারি, তবে এ কথা জেনে রেখো যে দু'হাজার বছর আগে যখন তোমরা শরীরে পশুর চামড়া জড়িয়ে হামাগুড়ি দিতে তখন আমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন একেকজন বড় বড় যোদ্ধা, শাসক আর জ্ঞানী ব্যক্তি। দয়া করে আমাকে আর অপমান করতে এসো না।'

বিগ বিলির চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠল। নীচু স্বরে বলল, 'তাই নাকি? এখনও আছে নাকি সেইসব দিন? ইউ ব্ল্যাক বাস্টার্ড! কী করবি তুই, কী করবি?' বলেই সে প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিল রামলালের ডান গালে। ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে মাটিতে পড়ে গেল রামলাল।

টমি বার্নস তার কাছে দৌড়ে এসে বলল, 'কিছু করতে যেয়ো না বাছা, তা হলে বিগ বিলি তোমাকে মেরেই ফেলবে।'

রামলাল মাটিতেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। আপ্রাণ চেষ্টা করে চোখ চেপে অশ্রু সংবরণ করল সে। কল্পনায় দেখল তার যোদ্ধা পূর্বপুরুষরা তার সামনে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে আর সকলে একটি শব্দই উচ্চারণ করছে—প্রতিশোধ।

দিনের বাকি সময়টুকু নিঃশব্দে কাজ করল সে। যা হবার হয়েছে, কিন্তু এর প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে।

রাতে দোকান থেকে কিছু ফুল কিনে বাড়ি ফিরে সুটকেস থেকে শক্তি দেবীর ছবি আর কতগুলো ধুপ কাঠি বের করল

রামলাল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের আয়না সরিয়ে সেখানে দেবীর ছবি টাঙিয়ে তার সামনে ধুপ জ্বেলে একটি ছোটখাট মন্দিরের মত তৈরি করে ফেলল। এবার দেবীর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রার্থনা শুরু করল রামলাল। বাইরে প্রকৃতি ক্রমে অশান্ত হয়ে উঠল; ব্যাঙ্গর শহরে ঝড় বয়ে গেল।

এক ঘণ্টা পর প্রার্থনা শেষ করে উঠে ঘরের বাতি জ্বেলে দিল সে। প্রতিশোধের উপায় সম্পর্কে দেবীর কাছ থেকে একটি ইঙ্গিত সে আশা করছে। রামলাল এ সময় লক্ষ করল যে বৃষ্টির পানি জানালা দিয়ে ঢুকে মেঝেতে একটি চিকন নালা সৃষ্টি করে এঁকেবেঁকে ঘরের এক কোণে চলে গেল। সেখানে দেয়ালে ঝোলানো একটি ড্রেসিং গাউনের ফিতা খুলে মেঝেতে সাপের মত পেঁচিয়ে আছে। রামলাল তার ইঙ্গিত বুঝে নিল।

পরদিন রোববার সকালে বেলফাস্টগামী ট্রেনে চেপে সে সোজা গিয়ে উঠল তার ক্লাসমেট রঞ্জিত সিং-এর রুমে। রঞ্জিত উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। পিতার অসুখের কথা বলে রামলাল তার কাছ থেকে প্লেনের ভাড়ার টাকা ধার নিল। সন্ধ্যায় একই কারণ দেখিয়ে সে ম্যাক কুইনের কাছ থেকে এক সপ্তাহের ছুটি চেয়ে নিল। সেই রাতটা হোস্টেলে নিজের রুমের মেঝেতে পার করে পরদিন সকালে রওনা হয়ে এক দিনের মধ্যেই ভারত পৌঁছে গেল সে।

বুধবার বিকেলে সরীসৃপ বিষয়ের একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিদের লেখা একটি টেক্সট বই সাথে নিয়ে রামলাল গ্র্যাণ্ড রোড ব্রিজের পাশের বাজারে গুজরাটি ব্যবসায়ী মি. চ্যাটার্জির দোকানে উপস্থিত হলো। মি. চ্যাটার্জির ট্রপিক্যাল ফিশ অ্যাণ্ড রেপটাইল এমপোরিয়াম অনেক দিন থেকেই দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল সেন্টারে গবেষণা আর ডিসেক্‌শনের জন্যে নমুনা

সরবরাহ করে আসছে। দেশের বাইরে থেকেও মাঝে মাঝে বড় বড় অর্ডার আসে এখানে।

রামলাল খুঁজছিল একটি বিশেষ ধরনের সাপ। বইয়ে দেয়া তথ্য অনুসারে সাপটির বৈজ্ঞানিক নাম Echis carinatus. প্রায় এক ফুট লম্বা এ সাপ যে কোনও আবহাওয়ায় চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। ছিপছিপে সরু এ সাপটি কোবরার চেয়েও বিপজ্জনক। কোনও প্রকার পূর্ব সঙ্কেত ছাড়াই অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে এটি শিকারকে আঘাত করে। এর দাঁত খুব ছোট আর সরু হওয়ায় কামড়ের চিহ্ন খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না। অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে, ছোবল হানার সময় এটি কোনও ব্যথার সৃষ্টি করে না, কিন্তু চার থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে শিকারের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিষের প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং সে কারণেই মৃত্যু ঘটে থাকে।

মি. চ্যাটার্জিকে সাপের বর্ণনা দিতেই তিনি তাকে একটি কাচের বাক্সের কাছে নিয়ে গেলেন। পুরো দোকানে ওই প্রজাতির সাপ একটিই ছিল।

রামলাল প্রশ্ন করল, 'হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট ফর হিম?'

মি. চ্যাটার্জি পাঁচশো রুপী চাইলেন। দরদাম করে তিনশো পঞ্চাশে রামলাল সাপটি কিনে নিল।

এরপর রামলাল বাজার থেকে একটি সিগার বক্স কিনে সেটি খালি করে ঢাকনায় কতগুলো ছিদ্র করে খুব সতর্কতার সাথে সাপটি বাক্সে ঢুকিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিল। এবার বাক্সটি একটি তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে সেটি সুটকেসে ভরে হোটেলে ফিরে সবকিছু গোছগাছ করে আয়ারল্যাণ্ডের পথে রওনা দিল।

হিথরো বিমান বন্দরে সুটকেস নিয়ে বাথরুমে ঢুকে বাক্সটি সে হ্যাণ্ডব্যাগে ভরে ফেলল। নাথিং টু ডিক্লিয়ার চ্যানেল দিয়ে পার

হবার সময় তার শুধুমাত্র সুটকেসটি খুলে দেখা হলো। শুক্রবার বিকেলের দিকে সে তার ব্যাঙ্গরের বাড়ি পৌছে সাপটিকে একটি কৌটোয় ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিল।

রামলালের পরিকল্পনাটি ছিল একেবারে ছিমছাম, নিরাপদ। সে লক্ষ করেছে বিগ বিলি প্রতিদিন কাজে এসেই তার জ্যাকেটটি খুলে এক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে। লাঞ্চ শেষে সে জ্যাকেটের ডান পকেট থেকে পাইপ আর দেশলাই বের করে, আর ধূমপান শেষে পাইপটি আবার সেই ডান পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। রামলালের প্ল্যান হলো, কাজের ফাঁকে একসময় সবার অলক্ষে সে জ্যাকেটের ডান পকেটে সাপটি রেখে দেবে। সাপটি যখন বিগ বিলির হাতে দাঁত বসিয়ে নিস্তেজ হয়ে ঝুলতে থাকবে তখন রামলাল সেটিকে মাটিতে ফেলে পায়ের চাপে পিষ্ট করে পাশের নদীতে ফেলে দেবে। হত্যাকাণ্ডের কোনও চিহ্নই আর থাকবে না।

পরদিন শনিবার সবকিছুই ঠিকঠাক মত এগোল। কিন্তু লাঞ্চের পর বিগ বিলি যখন পকেট থেকে একে একে পাইপ, দেশলাই আর তামাকের কৌটো বের করল তখন কিছুই ঘটল না। বিগ বিলি পাইপ জ্বালিয়ে দেশলাইটি আবার পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত মনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দূরে সরে গেল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না রামলাল। শক্তি দেবীর ইঙ্গিত, তার এত পরিশ্রম—সবকিছুই মিথ্যে হয়ে গেল? জ্যাকেটটির দিকে ভালমত তাকিয়ে রামলাল দেখল সেটির একদম নীচের অংশে কী যেন সামান্য নড়ে আবার থেমে গেল। তার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, সাপটি পকেটের কোনও ছিদ্রপথে বের হয়ে জ্যাকেটের লাইনিং-এ স্থান করে নিয়েছে। পুরো ব্যাপারটি তার কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হলো।

সেদিন কাজ শেষে বিগ বিলি যথারীতি তার জ্যাকেটটি সাথে

নিয়ে গেল। এদিকে রামলালের মনে নতুন দুশ্চিন্তা দেখা দিল—সাপটি যদি বিগ বিলির বাড়িতে তার নিরপরাধ স্ত্রী-সন্তানদের কোনও ক্ষতি করে, তখন কী হবে?

টমি বার্নসকে প্রশ্ন করে রামলাল বিগ বিলির ঠিকানা জেনে নিল। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার দিকে এবার সে অস্থির পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বিগ বিলির এলাকায় উপস্থিত হলো। কী করবে সে? কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না রামলাল, বাড়ি ফিরে আবার পায়চারি শুরু করল। পরদিন রোববার, ছুটির দিন; অর্থাৎ সমস্ত দিন সাপটি বিগ বিলির বাড়িতেই থাকবে। রামলাল তো প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল বিগ বিলির ওপর, তার নির্দোষ স্ত্রী-সন্তানের ওপর নয়। শক্তি দেবী তাকে এ কেমন পরিস্থিতে ফেলেছে! রাতে রামলালের ঘুম হলো না।

পরদিন সকালে আবার চলে গেল সে বিগ বিলির এলাকায়। একবার ভাবল সবকিছু খুলে বলবে বিগ বিলিকে। কিন্তু তারপর ওই দানবটি তার কী অবস্থা করবে তা চিন্তা করে সাহস হারিয়ে ফেলল। প্রচণ্ড দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে সব কিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল রামলাল। পার হয়ে গেল আরও একটি নিদ্রাহীন রাত।

সোমবার, সকাল ছ'টা বেজে বিশ মিনিট। বিগ বিলি ক্যামেরনের বাড়ির ডাইনিং স্পেস। পোশাক পরে তৈরি হয়ে ব্রেকফাস্ট করছে বিগ বিলি। তার জ্যাকেটটি শনিবার থেকে ক্লজেটেই পড়ে আছে। সে তার ছোট মেয়ে জেনিকে বলল জ্যাকেটি সেখান থেকে বের করে দরজার হুকে ঝুলিয়ে রাখতে।

জেনি জ্যাকেটটি বের করতেই চিকন কালো কী যেন একটা মাটিতে পড়ে এঁকেবেঁকে গড়িয়ে ঘরের কোণায় গিয়ে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে রইল।

মিসেস ক্যামেরন চিৎকার করে উঠলেন, 'সাপ!'

বিগ বিলি সাথে সাথে তাঁকে এক ধমকে থামিয়ে দিল, 'বোকার মত কথা বোলো না! আয়ারল্যাণ্ডে যে কোনও সাপ নেই, সেটাও জানো না?' সে তার চোদ্দ বছরের ছেলে ববিকে প্রশ্ন করল, 'এটি কী, ববি?' তার এই ছেলেটি স্কুলে গিয়ে কী সব যেন লেখাপড়া করে। তাই তার জ্ঞানের প্রতি বিগ বিলির অগাধ আস্থা।

'বাবা, এটি কেঁচো জাতীয় কিছু হতে পারে। আমরা বায়োলজি ক্লাসে এ ধরনের স্লো-ওয়ার্ম ড্রিসেক্ট করেছি।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে না কেঁচো,' বিগ বিলি সন্দেহ প্রকাশ করল।

'না, এটি ঠিক কেঁচো নয়। এটি আসলে পা-ছাড়া গিরগিটি।'

'তা হলে এর নামের মধ্যে কেঁচো (ওয়ার্ম) আছে কেন?'

'জানি না, বাবা।'

'তা হলে স্কুলে কী সব লেখাপড়া হয়, হ্যাঁ!'

'কামড়াবে না তো?' জানতে চাইলেন মিসেস ক্যামেরন।

'না, না, একেবারে নিরীহ,' ববি উত্তর দিল।

বিগ বিলি বলল, 'তা হলে মেরে ডাস্টবিনে ফেলে দাও।'

ববি এক পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল সাপটির দিকে।

এ সময় হঠাৎ কী মনে করে বিগ বিলি তাকে মাঝ পথে থামিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে ঢাকনা সহ একটি খালি জ্যামের কৌটো চেয়ে নিল। ববি জানতে চাইল, 'কী করবে, বাবা?'

বিগ বিলি বলল, 'আমাদের সাথে এক কাল্লু কাজ করে, সাপ-খোপ ভরা এক দেশ থেকে এসেছে। ওর সাথে একটু মজা করা যাবে।'

বাঁ হাতে কৌটো ধরে বিগ বিলি তার ডান হাতটি নামিয়ে

আনল সাপটির দিকে। বিগ বিলির হাতের মুঠোয় আসার আগেই সাপটি তড়িৎ গতিতে ছোবল হানল হাতের তালুতে। নিজের হাতের আড়ালের কারণে ব্যাপারটি কিছু জানতে পারল না বিগ বিলি।

সাপটিকে সে কৌটোয় বন্ধ করে সেটি ব্যাগে ভরে কাজে রওনা দিল। স্টেশন চত্বরে পৌঁছে রামলালকে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করল বিগ বিলি। ওভাবে তাকিয়ে থাকার মানে কী? সবকিছু বুঝে ফেলেছে নাকি ছেলেটা?

যাইহোক, কাজে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিগ বিলি দলের কয়েকজনের কাছে কাল্লুটাকে জব্দ করার ফন্দিটি খুলে বলল, আর বারবার নিশ্চয়তা দিল যে 'কেঁচো'টি কোনও ক্ষতি করবে না। একজন দু'জন করে রামলাল বাদে অন্য সকলকেই ফন্দিটি জানিয়ে দেয়া হলো। সকলেই ব্যাপারটিকে একটি মজা হিসেবে ধরে নিল।

লাঞ্চের সময় সবাই একসাথে বসল। রামলালের মাথায় তখন রাজ্যের দুশ্চিন্তা, সঙ্গীদের চাপা হাসি আর গুঞ্জন খেয়াল করার মত মনের অবস্থা তার নেই। আনমনে সে তার লাঞ্চ বক্সটি হাতে নিয়ে ঢাকনা সরিয়ে খাবারের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল, স্যাণ্ডউইচ আর আপেলের মাঝখানে ওটা কী কিলবিল করছে?

ব্যাপারটি মাথায় ঢুকতেই আকাশ কাঁপানো এক চিৎকার দিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তিতে বাক্সটি উপরে ছুঁড়ে মারল রামলাল। বাক্সের একেকটি জিনিস একেকদিকে ছিটকে পড়ে বড়বড় ঘাসের মাঝে হারিয়ে গেল। কর্মীদের মধ্যে ততক্ষণে হাসির ঝড় শুরু হয়ে গেছে।

এদিকে রামলাল তখন ভূতে পাওয়া মানুষের মত চিৎকার করে বলছে, 'সরে যাও, সরে যাও সবাই! সাপ! বিষাক্ত সাপ!' এতে হাসির মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে গেল।

হাসতে হাসতে বিগ বিলির চোখে পানি এসে গেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে সে এত হাসি হাসেনি। চোখের পানি মুছে সে রামলালের কাছে গিয়ে বলল, 'আরে হাঁদারাম, আয়ারল্যাণ্ডে কোনও সাপ নেই, বুঝতে পেরেছ? একটিও সাপ নেই।' অন্যরাও মাথা নেড়ে বিগ বিলিকে সমর্থন করল। রামলাল বাধ্য হয়েই ঘাসগুলো থেকে একটু দূরে সরে বসল আর ভয়ে ভয়ে আশপাশে তাকাতে থাকল।

লাঞ্চ শেষে সকলে আবার কাজ শুরু করল। দুপুরের দিকে এক সময় বিগ বিলি কাজ থামিয়ে নীচে নেমে গাছের ছায়ায় বসে তীব্র যন্ত্রণায় দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। মিনিট কয়েক পরেই একটি খিঁচুনি দিয়ে নিথর হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল তার দেহ।

বিগ বিলির মৃত্যুর পর যথারীতি অটোপসি করা হলো প্যাথোলজিস্ট-এর রিপোর্ট অনুসারে, মধ্য দুপুরের প্রচণ্ড তাপে ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার কারণেই মৃতের সেরেব্রোর হেমোরেজ হয়েছিল এবং সেটাই তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

এই রিপোর্টের পর সাধারণত তদন্তের কোনও প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু রামলালের জানা ছিল না যে বিগ বিলি ক্যামেরন ছিল ব্যাঙ্গর কাউন্সিল অভ আলস্টার ভল্যান্টিয়ার ফোর্স—একটি চরমপন্থী প্যারামিলিটারি অর্গানাইজেশন-এর প্রথম সারির একজন সদস্য। এই সংস্থার প্রচেষ্টায় একটি ফর্মার তদন্তের ব্যবস্থা করা হলো।

ব্যাঙ্গর টাউন হলে কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে তদন্তের আয়োজন

করা হলো। দলের কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে নতুন কিছুই জানা গেল না। বরং বিগ বিলির ছেলেমানুষীর কথাই সকলে জেনে ফেলল। এই তদন্তে অবশ্য ম্যাক কুইনের ক্ষতি হয়ে গেল—এর পর থেকে তিনি আর ট্যাক্স ডিডাকশন এড়াতে পারবেন না।

পরবর্তী শুক্রবার ব্যাঙ্গর সেমিট্যারিতে বিগ বিলির শেষকৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। দলের সকলেই সেখানে উপস্থিত, রামলাল বাদে। রামলাল তখন ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা চলে আসল ভেঙে ফেলা ভবনটির নীচের বড় বড় ঘাসে ছাওয়া জনহীন সেই স্থানটিতে। এখানেই কোনও এক স্থানে আশ্রয় নিয়েছে সেই বিষধর সাপটি।

একা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় রামলাল বলল, 'হে বিষসর্প, তোমাকে যে কাজের জন্যে এনেছিলাম তুমি তা করেছ। সবকিছু ঠিকমত এগোলে এতক্ষণে তোমার মরে যাবার কথা ছিল, আমি নিজেই তোমাকে মেরে ফেলতাম।

'বিষধর সাপ, তুমি কী শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? যদি পাও তবে শুনে রাখো যে তুমি হয়তো আরও কিছুদিন বাঁচবে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই একদিন তোমাকে মরতে হবে, এবং মরতে হবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়। কারণ সর্পহীন এই আয়ারল্যাণ্ডে মিলনের জন্যে কোন স্ত্রী সাপ তুমি খুঁজে পাবে না যার মাধ্যমে তুমি বংশধর রেখে যাবে।'

এদিকে সাপটি কিন্তু রামলালের কোনও কথাই শুনছিল না, অথবা শুনে থাকলেও তা বোঝার কোনও রক্ষণ প্রকাশ করল না। কারণ সে তখন খানিকটা দূরে তার গর্তের উষ্ণতায় প্রকৃতির এক বিশেষ আজ্ঞা পালনে ব্যস্ত।

সাপটির লেজের নীচের অংশে রয়েছে দুটো পর্দা যা ঢেকে

রেখেছে অবসারণীর ছিদ্র পথটিকে। ধীরে ধীরে সরে গেল পর্দা দুটো, আদিম ছন্দে নেচে উঠল সর্পটির সমস্ত দেহ। সর্পমাতা তার অবসারণীর ছিদ্রপথে সর্পহীন আয়ারল্যাণ্ডের সেই ছোট্ট গর্তে একে একে মুক্ত করে দিল স্বচ্ছ থলিতে মোড়া এক ইঞ্চি লম্বা প্রায় ডজন খানেক বিষাক্ত সন্তান।

মূল: ফ্রেডারিক ফোরসাইথ
রূপান্তর: সামিউল আমীন

ওলির হাত

জুলাই মাসের উষ্ণ রাত। ওলির হাতের তালু স্বভাবতই ঘামছে একটু একটু। সব সময় ঘামে। এমনকী বছরের সবচেয়ে শীতার্ত দিনটিতেও তার হাত থাকে নরম, ভেজা ভেজা, উষ্ণ—এবং স্পর্শকাতর। সরু সরু দীর্ঘ আঙুল তার, যখন কিছু ধরে, মনে হয় ওটার সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

আবহাওয়া যেমনই হোক, মাসের ত্রিশ দিনই গভীর রাতে পেশাগত কাজে বের হয় ওলি, স্ট্যাযনিক রেস্টুরেন্টের পিছনের অন্ধকার এক গলিতে আসে। বড় বড় উপচে পড়া গারবেজ বিন থেকে ওদের রোজকার ফেলে দেয়া সিলভারওয়্যারগুলো তুলে নিয়ে যায়। স্ট্যাযনিক খুবই নামকরা, অভিজাত ও ব্যয়বহুল রেস্টুরেন্ট। প্লেট, চামচ, ছুরি একরাতের বেশি ব্যবহার করে না, ফেলে দেয়। ওসব বিক্রি করেই কোনওরকমে দিন চলে ওলির। ওয়াইনের খরচ আর পেটপুজো, দুটোই হয়ে যায় ওই টাকায়।

জুলাইয়ের মঙ্গলবার সেই বিশেষ রাতটায় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। ছুরি, কাঁটা চামচের বদলে সেখানে জলজ্যান্ত এক যুবতীকে পেল ওলি। অজ্ঞান। বিনের সাথে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে। হাত দুটো ভাঁজ করা বুকের ওপর। মাথা হেলে আছে একদিকে। ভঙ্গিটা শিশুদের। কিন্তু সে যা তা নয়, এক পলক দেখলেই বুঝবে যে কেউ।

তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ডাকল ওলি, 'মিস?'

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

একটু ইতস্তত করে তার কাঁধ ধরল সে, ঝাঁকি দিল। তাতেও কাজ হলো না। তবে ঝাঁকির ফলে মেয়েটার মুঠো থেকে মৃদু শব্দ করে কী সব যেন পড়ল রাস্তায়। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সেগুলো দেখল ওলি—সিরিঞ্জ, পোড়া চামচ; ধাতব কাপ, একটা আধপোড়া মোমবাতি এবং সাদা পাউডার ভর্তি কয়েকটা ছোট প্যাকেট।

ড্রাগ অ্যাডিক্ট! ভাবল ওলি।

তাকে ছেড়ে নিজের কাজে লেগে পড়তে পারত সে, কিন্তু মেয়েটা বেশ সুন্দরী বলেই হয়তো তা করল না। এত সুন্দরী জীবনে এই প্রথম দেখছে ওলি। আরও কয়েকবার ওকে ধরে ঝাঁকাল, ডাকল, কাজ হলো না। মনস্থির করে উঠল সে, নোংরা প্যান্টের পেছনে ভেজা হাতের তালু মুছে করুণ চোখে বিনগুলোর দিকে তাকাল। তারপর দু'হাতে কাঁধে তুলে নিল অজ্ঞান যুবতীকে।

ওজন বেশি নয় তার, হাঁটতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না ওলির। গলির মাথায় এসে এদিক-ওদিক তাকাল সে, সুড়ুৎ করে নির্জন এভিনিউ পেরিয়ে আরেক গলিতে ঢুকে পড়ল। এটাও অন্ধকার। দশ মিনিট পর নির্জের বেজমেণ্ট রুমে ঢুকল ওলি।

যুবতীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কাছে একটা পিঠখাড়া চেয়ারে বসে জিরিয়ে নিল কিছুক্ষণ। তারপর এক এক করে মেয়েটার নেশার সরঞ্জাম ধ্বংস করল। পাউডার বাথরুমে ফেলে ফ্ল্যাশ করে দিল। কাজ শেষ হতে হাত-মুখ ধুয়ে হোটেলের ব্যবহৃত এক তোয়ালেতে মুছল। হ্যাঁ, এখন ভাল লাগছে তার। পরিচ্ছন্ন লাগছে।

যুবতীর শ্বাস-প্রশ্বাস অগভীর, অনিয়মিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে দেখে থমকে গেল ওলি। ফরসা, সুন্দর মুখটা ধূসর

দেখাচ্ছে এখন, কপালে জমে থাকা ঘামের ফোঁটাগুলো উজ্জ্বল পুঁতির মত লাগছে। মেয়েটা মারা যাচ্ছে, বুঝল ওলি। ভয় পেল। ভেজা ভেজা দীর্ঘ আঙুলগুলো দুই বগলের মাংসের মধ্যে গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকল সে। গারবেজ বিন থেকে পরিত্যক্ত সিলভারওয়্যার খুঁজে বের করাই শুধু নয়; আরও অনেক, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ক্ষমতা আছে ওগুলোর। কিন্তু তাতে বিপদ আছে। সেসব করতে গেলে সমস্যায় পড়বে সে।

কিন্তু মেয়েটা যে মরে যাচ্ছে!

দ্বিধায় পড়ে গেল ওলি। কাবার্ড থেকে ওয়াইনের জগটা বের করে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিল খানিকটা। বিস্বাদ। একদম পানির মত লাগল। হাত দুটো দিয়ে কোনওমতে জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা রোজগার করা ছাড়া অন্য কিছু করাকে ঘৃণা করে ওলি, কিন্তু এখন না করেও উপায় নেই। মেয়েটার রূপের সম্মোহনী জালে আটকা পড়ে গেছে সে।

দু'হাত সামনে বাড়িয়ে বিছানার দিকে এগোল ওলি, যেন কোনও অন্ধ অচেনা ঘরে কিছুর সাথে ধাক্কা খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে চলার চেষ্টা করছে।

মেয়েটাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলল। দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বুক দুটো ছোট তার, উদ্ধত, দৃঢ়। সরু কোমর। নিতম্বের হাড় উঁচু হয়ে আছে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে, কিন্তু তারপরও পা দুটো ভারি সুন্দর। তলপেট আর উরুসন্ধি তো আরও।

কিন্তু ওলির চোখে তার সৌন্দর্য ধরা পড়ল না, বিন্দুমাত্র উত্তেজিতও হলো না সে। কারণ মেয়েদেরকে কখনও জৈবিক চাহিদা মেটানোর বস্তু মনে করার মত সুযোগ তার জীবনে আসেনি। মেয়েদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ওলি। জীবনের

এতগুলো বছর কেটে গেল, অথচ যৌবন কী, যৌনক্ষুধা কী, সে জানে না। সুযোগ হয়নি জানার। সে জন্যে দায়ী তার হাত দুটো।

মেয়েটাকে ছুঁয়ে দেখল ওলি, দেহের এখানে-সেখানে হাত বুলিয়ে বুঝে নিল তার অবস্থা। অতিরিক্ত মাদক নিয়ে ফেলেছে যুবতী, কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেল সে। এবং ইচ্ছাকৃতভাবে।

দু'হাতের তালু যুবতীর পেটের মসৃণ ত্বকের ওপর রাখল সে, বোলাতে শুরু করল সর্বত্র। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। এক সময় ঝাপসা হয়ে পড়ল ওলির দৃষ্টি—কোথায় তার হাত, কোনটা যুবতীর ত্বক, আলাদা করে চেনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল।

এক সময় কাজ হয়েছে বুঝতে পেরে থামল ওলি, হাত তুলে নিল। ব্যস্, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে এখন যুবতী। শুধু তাই নয়, আর কোনওদিন মাদক নেয়ার নেশাও জাগবে না তার মধ্যে।

পরিতৃপ্ত, ক্লান্ত ওলি চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু একটু পরই দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে জেগে উঠল। সামলে নিয়ে যুবতীকে দেখল সে। ঘুমাচ্ছে নগ্ন সুন্দরী। নিয়মিত ছন্দে ওঠানামা করছে বুক। শীট দিয়ে দেহটা ঢেকে দিল ওলি, পরিচয় জানার জন্যে তার বহু ব্যবহারে মলিন ওয়ালেটটা খুলল।

কেবল নামটাই জানা গেল! অ্যানি গ্রেস, ২৬, অবিবাহিতা। আর কিছু নেই। মা-বাপ অথবা আত্মীয়-স্বজনের নাম-ঠিকানা, কিছুই না। তবে বিশেষ ক্ষমতাবলে তার অতীত জীবনের কয়েকটা বছরের ছবি স্পষ্ট দেখতে পেল সে। কবে প্রথম কোকেন কিনেছে, ব্যবহার করেছে, কার সাথে শেয়ার করেছে, কবে প্রথম চুরি করেছে, কবে দেহ বিক্রি করেছে, সব।

বড় উচ্ছৃঙ্খল জীবন অ্যানির, ভাবল সে। ড্যামকেয়ার জীবন। এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পর

জানে না ওলি, মেয়েটার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল, ধড়মড় করে উঠে বসল সে। দেখল বিছানায় বসে আছে অ্যানি। ভীতসন্ত্রস্ত চেহারায় তার দিকে চেয়ে আছে।

'আমি এখানে কেন?' বলল অ্যানি। 'কী করেছ তুমি আমার?'

চুপ করে থাকল ওলি। তাই থাকে সে। হয়তো বোবা অথবা কথা বলতে ভয় পায়। এই মুহূর্তে অ্যানির রুদ্রমূর্তি দেখে সত্যি ভয় পেল সে, ও চেঁচামেচি শুরু করলে সর্বনাশ। অনেক কষ্টে মাথা নাড়ল ওলি, বোঝাতে চাইল কিছু করেনি। বুঝল মেয়েটা, ভয় একটু একটু করে মুছে যেতে লাগল চেহারা থেকে। শীট তুলে দেহ ঢেকে বলল, 'ওভারডোজ নিয়েও মরিনি আমি! কেন?'

দ্রুত কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করল ওলি, ঘুম পাড়িয়ে দিল সেকেণ্ডের ব্যবধানে। নিজেও ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে উঠল। রুম তার দুটো, নোংরা হয়ে আছে। আগে ও দুটো ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করল সে, বেড কভার পাল্টে দিয়ে পুরো চেহারাই বদলে দিল পরিবেশের। কাজ শেষ হতে বেরিয়ে পড়ল ওলি। খুব খিদে পেয়েছে, খাবার-দাবার কিনে আনতে হবে।

দুই ব্লক দূরের এক মুদি দোকান থেকে অনেক কিছু কিনল সে। এতকিছু একসঙ্গে আগে কখনও কেনেনি। 'আটত্রিশ ডলার বারো সেন্ট,' চেহারায় তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বলল দোকানি। তার ধারণা এত টাকা দেয়ার সাধ্য নেই ওলির মত নোংরা ড্রেস পরা কারও পক্ষে।

এক হাত তুলল ওলি, কপাল স্পর্শ করল, একইসঙ্গে কড়া চোখে তাকাল লোকটার দিকে।. চোখ পিট্‌পিট্ করে উঠল দোকানি, হাসল, হাত বাড়িয়ে এক মুঠো বাতাস ধরে তাকাল সেদিকে। 'ওহ্, চল্লিশ ডলার!'

অস্তিত্বহীন ডলারগুলো রেখে বাকি পয়সা ওলিকে ফেরত দিল

সে। সবকিছু প্যাকেট করে দিল। ওগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল ওলি। অস্বস্তি লাগছে, কারণ আগে কখনও এভাবে কাউকে ঠকায়নি সে। মেয়েটার দায়িত্ব ঘাড়ে না চাপলে আজও করত না। গারবেজ ক্যান থেকে এটা-সেটা কুড়িয়ে, বা সাবওয়ে স্টেশনগুলোতে মানুষের পড়ে যাওয়া কয়েন কুড়িয়েই দিন কাটাত।

বাসায় ফিরে স্ট্যু, সালাদ, তাজা ফল ইত্যাদি দিয়ে রীতিমত রাজকীয় ডিনার সাজিয়ে অ্যানির ঘুম ভাঙাল সে, হাতের ইশারায় টেবিল ভর্তি খাবার দেখাল। কিন্তু আগেরবার ঘুম ভাঙতে যে আচরণ করেছিল অ্যানি, এবারও সেই আচরণ শুরু করল। চিৎকার করতে লাগল ভয়ে। ওলির সাথে তার প্রথম আলাপের কথা মনে নেই।

বাধ্য হয়ে আবার ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিল সে, এত দামী খাবার সব ছুঁড়ে ফেলে দিল। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। নিজের বাকি সময়ও পুরোটা রাত বসেই কাটাল ওলি, এরমধ্যে অবশ্য দু'বার পানি খাইয়েছে ঘুমন্ত অ্যানিকে। নইলে পানিশূন্য হয়ে পড়বে ও। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত ওলি। জাগল বারো ঘণ্টা পর। গোসল সেভ সেরে ধোয়া এক সেট ড্রেস পরে খাবার কিনে আনল, ঘুম ভাঙাল মেয়েটার।

'আমি কোথায়?' চোখ মেলেই প্রশ্ন করল সে। 'এখানে এলাম কী করে?'

জবাবে শুধু হাসল ওলি।

'তুমি কথা বলতে পারো না? বোবা?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

'আমি দুঃখিত,' বলল অ্যানি। টেবিলে সাজানো লোভনীয় সমস্ত খাবার দেখে খুশি হয়ে উঠল। একসঙ্গে বসে পেট ভরে

খেল দু'জন। তার ফাঁকে ওলিকে নানান প্রশ্ন করল মেয়েটা, ইঙ্গিতে কোনওমতে জবাব দিল সে। খেয়ে উঠেই ঘরের তিনটে আলোর দুটো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল অ্যানি। ওলিকে ডাকল, 'এসো!'

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল সে। হাসল এবার অ্যানি, পরনের ড্রেস খুলে ফেলে দিল। 'এবার হয়েছে?' তবু ওলির মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই দেখে বিস্ময় চেপে রেখে বলল, 'দেখো, আমি জানি তুমি কেবল সেবা করার জন্যেই আমাকে এখানে নিয়ে আসোনি। এ পর্যন্ত আমার জন্যে যা করেছ, তাতে অন্তত এটুকু পুরস্কার তোমার পাওনা হয়েছে। এসো।'

বুঝল না ওলি, পাশের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বোবার মত তাকিয়ে থাকল অ্যানি।

পরদিন সকালে গোগ্রাসে নাস্তা খেল অ্যানি, কিছুই পড়ে থাকল না প্লেটে। এরপর গোসল করতে বাথরুমে ঢুকল। ভাল করে সাবান মেখে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল অ্যানি, গুনগুন করে গানও গাইল। ভাল লাগল ওলির।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল উদোম হয়ে। চোখাচোখি হতে মিষ্টি হেসে আবার আমন্ত্রণ জানাল তাকে। 'এবার এসো। এখন আর কাল রাতের মত নোংরা নই আমি। গায়ে সাবানের মিষ্টি গন্ধ, ভাল লাগবে তোমার।'

ওলি আরেক দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তোমার ব্যাপারটা কী, বলো তো? আমাকে পেতে ইচ্ছে করে না তোমার?'

মাথা নেড়ে 'না' বোঝাল সে।

'কেন? তুমি পুরুষত্বহীন?'

'না,' বোঝাল ওলি।

'তা হলে আপত্তি কীসের?' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল মেয়েটা। 'আমি তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে চাইছি, নেবে না কেন? দেহ ছাড়া তো কিছু দেয়ার নেই আমার। এই দিয়েই উপকারীকে পুরস্কৃত করি আমি সব সময়।'

মূকাভিনয়ের মাধ্যমে ওলি তাকে বোঝাল, ও যে তার সঙ্গে এক রূমে বাস করেছে, এতেই সে খুশি। আর কিছু তার চাই না।

দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েটার জন্যে কিছু ড্রেস কিনে আনল ওলি—নীল জিনস, সোয়েটার ইত্যাদি। ওগুলো পরে পরদিন সকালে ওলির সাথে খাবার কিনতে সেই মুদি দোকানে এল অ্যানি। আজও সেদিনের মত অস্তিত্বহীন বিশ ডলার 'খরচ' করল ওলি, বাড়তি পয়সা পকেটে রাখল।

'কীভাবে করলে কাজটা?' দোকান থেকে বেরিয়েই তাকে প্রশ্ন করল মেয়েটা।

অবাক হওয়ার ভঙ্গি করল সে, বোঝাতে চাইল, 'কী করলাম?'

'আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবে না। আমি সব দেখেছি। কীভাবে, হিপনোটিজম?'

আশ্বস্ত হয়ে মাথা দোলাল ওলি—হ্যাঁ।

'আমাকে শেখাতে হবে।'

সাড়া দিল না সে, কিন্তু অ্যানি নাছোড়বান্দা। বলে চলল, 'শেখাতেই হবে। এই বিদ্যা জানা থাকলে আমাকে আর কখনও দেহ বিক্রি করতে হবে না, বুঝলে? বলো। শিখিয়ে দাও আমাকে।'

বাসায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে তার চাপাচাপি এমন পর্যায় পৌঁছুল যে বিরক্ত হয়ে উঠল ওলি, ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিল অ্যানিকে। হঠাৎ ওকে রেগে উঠতে দেখে খুব অবাক হলো সে, এ

বিষয়ে আর কিছু বলল না। তবে সন্ধ্যার পর অন্য প্রসঙ্গ তুলল। 'আমার নেশার জিনিসপত্র কই? ওগুলো কী করেছ তুমি? আশ্চর্য, পাঁচদিন হলো নেশা করিনি আমি। নেশা করার ইচ্ছেও জাগছে না। এর অর্থ কী?'

ওলি নিরুত্তর।

'ফেলে দিয়েছ ওগুলো?'

মাথা দোলাল সে।

'কিন্তু ইচ্ছে জাগছে না কেন? কী করেছ তুমি? আমাকেও হিপনোটাইজ করেছ? কীভাবে?'

কিছুই জানানোর ইচ্ছে ছিল না ওলির, কিন্তু অ্যানি আরও চেপে ধরল। গভীর রাতের কোনও এক সময় তার আগ্রহের কাছে আত্মসমর্পণ করল সে। কেন, তা সে নিজেও জানে না। কোনওদিন জানবেও না। জাদুকরী ক্ষমতার হাত দুটো শার্টে ডলে মুছল ওলি, নিজের ক্ষমতা দেখাতে শুরু করল ওকে—অথচ জানে এর ফল ভাল হবে না।

প্রথমে একটা অস্তিত্বহীন বিশ ডলার ওকে দেখাল সে, ওকে ধরতে দিল, তারপর গায়েব করে দিল। এরপর হাতের ইশারায় একে একে কয়েকটা কফি কাপ শূন্যে তুলে ভাসিয়ে রাখল। তার খাড়া পিঠের চেয়ার, একটা ল্যাম্প এবং অ্যানিকে সহ তার খাটটাও শূন্যে ভাসাল, নিজেও ভেসে থাকল কিছু সময়। বেসিনের ট্যাপে হাত না দিয়ে ওটা থেকে পানির ধারা ছোটাল ওলি, ওটাকে মাঝখান থেকে দু ভাগ করে দুই ধারায় পরিণত করল।

চোখের সামনে এতসব অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকল মেয়েটা, তারপর হুঁশ হতে ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিল। আত্মহারা হয়ে বারবার জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে লাগল

ওলিকে। অবশেষে উচ্ছ্বাস কমে আসতে আবগেমাখা গলায় বলল, 'তুমি একটা অমূল্য সম্পদ! কিন্তু তোমার এমন প্রতিভা তুমি লুকিয়ে রেখেছ কেন?'

মূকাভিনয় করে নিজের জীবন কাহিনি বলে চলল ওলি। অ্যানি বুঝল তার সারমর্ম। বলল, 'ওরা তোমাকে কষ্ট দিয়েছে!'

জোরে জোরে মাথা দোলাল সে—হ্যাঁ। অনেক কষ্ট দিয়েছে।

বারো বছর বয়সে হঠাৎ করে এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হয় তার হাত দুটো। প্রথমে ভয় পেয়ে যায় সে, কাউকে জানতে দেয়নি ব্যাপারটা। কিন্তু আস্তে আস্তে সবাই জেনে গেল একসময়। প্রথম প্রথম বন্ধুরা খুব একটা মাথা ঘামায়নি তা নিয়ে, বরং ওলির 'খেলা' দেখে মজা পেত।

কিন্তু পরিস্থিতি মোড় নিল একসময়, সবাই ঘৃণা করতে লাগল তাকে। বড়রা কথায় কথায় মারধর করত, নোংরা পানি খেতে বাধ্য করত। একজন দু'জন হলে ওলি নিজের ক্ষমতাবলে তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারত। কিন্তু পুরো একটা গ্যাঙের বিরুদ্ধে কী করার ছিল ওর?

বাধ্য হয়ে ক্ষমতাটাকে চেপে রাখতে চাইল ওলি, এমনকী নিজের কাছ থেকেও। অস্বীকার করতে চাইল নিজের প্রতিভা। কিন্তু তার ফলে দৈহিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো সে। ভিতর থেকে ক্ষমতাটা কাজে লাগানোর তাগিদ অনুভব করতে লাগল। তাগিদ উপেক্ষা করতে গেলেই সমস্যা—ওজন কমে যেতে থাকে, নার্ভাস হয়ে পড়ে, একের পর এক অসুখ ছেঁকে ধরে।

কাজেই এক সময় ওলি বাধ্য হলো নিয়তিকে মেনে নিতে। ক্ষমতা ব্যবহার করতে লাগল, তবে কারও সামনে নয়, নিভৃতে। ততদিনে বুঝে গেছে ইচ্ছে থাক বা না থাক, ক্ষমতাটাকে ব্যবহার

করতে বাধ্য সে। প্রকাশ্যে খাটালে বিপদ, তাই ভেবেচিন্তে এই নিভৃতবাসে আছে ওলি—একা।

'আমি বুঝতে পারছি ওরা সবাই তোমাকে হিংসা করত,' ওলির অভিনয় শেষ হতে অ্যানি মন্তব্য করল। 'ভয় করত তোমাকে। কিন্তু তবু তুমি একজন সত্যিকারের প্রতিভা। কোনও সন্দেহ নেই তাতে।'

একটু পর আবার বলল, 'অতীত নিয়ে ভেবে আর কষ্ট পেতে হবে না তোমাকে। আজ থেকে আমি তোমার সঙ্গী হব। আমরা দু'জন এক হয়ে লড়াই করব সবার বিরুদ্ধে।'

মাথা দোলাল ওলি, একই সাথে দুঃখও পেল তা কোনওদিন সম্ভব নয় বলে। সে জানে, অ্যানিকে হারাতেই হবে। কারণ সেই মুহূর্তেই 'মেশ' ঘটেছে, অনেকটা সুইচ অন-অফ করার সময় যেন খুট! করে শব্দ হয়, তেমনি। ওলি জানে, এই 'মেশই' তার জীবনের কাল, চরম শত্রু! অতীতে বহুবার তার সর্বনাশ করেছে, আজও করবে। এর কথা যখন জানবে, তখন আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। অ্যানি। উঠবেই।

অতীতে ওলি যখনই কারও ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে, তখনই ঘটেছে 'মেশ'।

'তুমি তা হলে মানুষের মন পড়তে পারো?' প্রশ্ন করল মেয়েটা।

অস্বীকার করা নিরর্থক, তাই মাথা দোলাল ওলি—হ্যাঁ।

'সব কথা পড়তে পারো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মনের কথা সব আগে থেকে জানতে পারো?'

ওলি অনড়, ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

রাতটা কোনওমতে কাটল। পরদিন নাস্তা করেই ওলিকে

একের পর এক প্রশ্নবাণে অস্থির করে তুলল মেয়েটা। একই সাথে একটু একটু রেগেও উঠতে লাগল। 'আজ আমার মনের কথা পড়েছ তুমি?'

মাথা দোলাল ওলি। 'হ্যাঁ।'

'কাজটা বন্ধ করো। করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'মিথ্যে কথা! আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এখনও আমার মধ্যে রয়েছ তুমি।'

ওলি অনড় হয়ে থাকল।

'দয়া করে বন্ধ করো এসব। বুঝতে পারছ না, নিজেকে কেমন আহাম্মক লাগছে আমার? তোমার মত প্রতিভার পাশে নির্বোধ গাধার মত লাগছে?'

ওলি বলতে পারল না যে সে ক্ষমতা তার ভিতর নেই। চাইলেই এসব বন্ধ করতে পারে না সে।

'কিছুই গোপন রাখতে না পারলে একসঙ্গে কীভাবে থাকব আমরা?' চিন্তিত গলায় বলল অ্যানি। 'গোপন কিছু থাকবে না, কোনও বিস্ময় থাকবে না, এ কোনও জীবন হলো? তোমার ইচ্ছেয় চলতে হবে আমাকে? তোমার বেঁধে দেয়া পথে চলতে হবে? নাকি এর মধ্যেই বেঁধে দিয়েছ?'

ওলি তিক্ত মনে ভাবছে, খেলা শেষ। খেলা ভাঙল বলে।

'আমি চলে যাব।' উঠে পড়ল মেয়েটা। 'তোমার সাথে থাকা অসম্ভব!'

বেদনা ভরা মনে অ্যানিকে ঘুম পাড়িয়ে দিল ওলি। তার মনের মধ্যে ঢুকে বিশেষ কিছু স্মৃতি চিরতরে মুছে দিল। তারপর খুব ভোরে যেখান থেকে এনেছিল ঠিক সেখানে রেখে এল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মেয়েটাকে। কিছুদিনের জন্যে সঙ্গ দেয়ার পুরস্কার

হিসেবে কিছু দিয়ে এসেছে ওকে ওলি।

জীবনে আর কোনওদিন নেশা করার ইচ্ছে জাগবে না অ্যানির মধ্যে। ঘুম ভাঙলে নিজের মধ্যে নতুন, আত্মবিশ্বাসী এক নারীকে খুঁজে পাবে ও, যার মধ্যে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার গুণ ষোলো আনাই আছে। এসব ওকে নতুন এক জীবন খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

বাসায় ফিরে এক জগ ওয়াইন খেয়ে মাতাল হলো ওলি। মনে পড়েল ছোটবেলায় এক 'বন্ধু' ওকে বলেছিল, 'তুমি সুপারম্যান, ওলি। বড় হয়ে পৃথিবীকে শাসন করতে পারবে তুমি।'

হা হা করে হেসে উঠল সে—পৃথিবী শাসন! যে নিজেকেই শাসন করতে পারে না, সে কিনা পৃথিবী শাসন করবে! সুপারম্যান! সাধারণ মানুষে ভরা পৃথিবীতে একজনমাত্র সুপারম্যানের কি ক্ষমতা আছে? একজনকে দিয়ে কিছু হয়, না হয়েছে কখনও?

অ্যানির কথা ভাবল ওলি। তাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখা হয়নি, তার সঙ্গে যে প্রেমের বিনিময় হয়নি, তার কথা ভাবল।

সেদিন মাঝরাতের পর আবার স্ট্যানলির রেস্টুরেন্টের গারবেজ বিন খুঁজে দেখতে এল সে। অন্তত সেরকমই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু করল অন্য কিছু। একের পর এক অন্ধকার, সরু ও আঁকাবাঁকা গলি, গলির গলি, তস্য গলিতে ঘুরে বেড়াল সে ভূতের মত। সামনে দু'হাত বাড়িয়ে রেখে, যেন কোনও অন্ধ কিছুর সাথে ধাক্কা খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে চলার চেষ্টা করছে।

অ্যানি গ্রিসের জীবনে ওলি নামে কারও অস্তিত্ব নেই। অতীতে কখনও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না।

মূলঃ ডিন আর কুনত্জ্
রূপান্তরঃ সুস্ময় আচার্য সুমন